প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক : ময়ূখ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মুদ্রক : রঞ্জনকুমার দাস, শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

# সূচীপত্র

ইতিহাসে গল্প থাকার কথা নয়। কথা নয় মিথ্যা থাকারও। তবু সবই আছে। সবই রাখা হয়েছে। যা ঘটেনি তা ঘটেছিল বলে জানাতে গিয়ে গল্প লিখতে হয়েছে। যা ছিলনা তা ছিল বলে চালাতে গিয়ে বানাতে হয়েছে মিথ্যা। সম্রাট অশোক এই সব মহান কাজ করেছিলেন—হর্ষবর্ধন দানসত্র খুলে সর্বস্ব দান করে বসেছিলেন—এসবই গল্প। আবার প্রাচীন ভারতে দুটি মহাকাব্য, চারটি বেদ, ছ'টা দর্শন, কুড়িটা স্মৃতি, ছত্রিশটা পুরাণ, ছাপ্পান্নটা ভাষা, চৌষট্টিটা লিপি আর একশ আটটা উপনিষদ যে প্রচলিত ছিল—এসবই মিথ্যার বেসাতি। কোনটাই ছিলনা। গল্প আর মিথ্যা মিলেমিশেই ইতিহাস।

গল্পগুলো প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসে ঢুকেছে। মিথ্যাগুলো পরোক্ষভাবে। প্রথমটি দিয়ে তৈরি হয়েছে ইতিহাসের কাঠামো—দ্বিতীয়টি দিয়ে তার অলংকরণের ব্যবস্থা। ভারতের অমুক সম্রাটের নিরানব্বইটা—ইউরোপের তমুক সম্রাটের উনপঞ্চাশটা ভাই ছিল—এ ধরনের উদ্ভট সব গল্প হয়েছে কাঠামো। ইলিয়াড-ওডিসির প্রাচীন একটি সংস্করণ যে স্বয়ং অ্যারিস্টটল্ সম্পাদনা করেছিলেন এবং মহান আলেকজাণ্ডার যে সবসময় গ্রন্থ দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন—এই উৎকট মিথ্যা হয়েছে অলঙ্কার। জ্ঞানরাজ্যের নানান শাখা-প্রশাখায় যে অতীতে মানুষেরা স্বচ্ছন্দে বিহার করতেন—জ্ঞানের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে বসতেন—এই প্রচণ্ড মিথ্যা দিয়েই ইতিহাসটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করা হয়েছে।

গল্পগুলোকে গল্প বলে মনে করতে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় প্রমাণ রাখার বহর দেখে। মিথ্যাগুলোকে মিথ্যা বলে মেনে নিতে সংস্কারে বাধে। বিশ্বাসের ভিতগুলো আলগা হয়ে যায়। গল্পেরও প্রমাণ রাখতে হয়—মিথ্যাগুলোকে জাতে তুলতে হয়। আসলে বেশ কিছু ভুল ধারণা যাতে মানুষের মনে গেঁথে যায়—

পাকাপোক্তভাবে ঢুকে বসে তার জন্যই গল্পগুলো ওই ইতিহাসে রাখার আয়োজন হয়েছে। আয়োজন হয়েছে এমন সব উদ্দেশ্য-মূলক মিথ্যা বানিয়ে রাখার—যা রাষ্ট্রের স্বার্থে—রাষ্ট্র-পরিচালনার স্বার্থে কাজে লাগে।

ইতিহাস লেখার বা লেখানোর নেপথ্যে রাষ্ট্রের তরফ থেকে গোপন সহযোগিতার হাত বাড়ানোর ব্যাপারটাকে কেউ সন্দেহ করেননি। আর তা করেননি বলেই গল্পগুলো জাঁকিয়ে বসে আছে। মিথ্যাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে ওই ইতিহাসে। সত্যি কথা বলতে কি গল্পচ্ছলে যত না ইতিহাস লেখা হয়েছে তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি গল্প লেখা ইতিহাসছলে। মজার কথা হল এই: গল্পগুলো ইতিহাসে ঠাঁই পাওয়ার সুবাদেই যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। উল্টোদিকে গল্পগুলো থাকার দরুন ওই ইতিহাসটাও যেন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রাণবন্ত গল্প আর মুখরোচক মিথ্যা মিলে মিশেই যেন ওই ইতিহাসেই সৃষ্টি।

প্রাচীন যুগের কথাই ধরা যাক। সে যুগের ওপরে যা কিছু লেখা হয়েছে তা দেখে মনে হয় ওই যুগে ইতিহাস আর সাহিত্য বুঝি হাত ধরাধরি করেই চলেছিল। আর চলতে চলতে উনিশ শতকে এসে দুটোই বুঝিবা একাকার হয়ে ইতিহাস হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বেদ-উপনিষদ, ইলিয়াড-ওডিসি, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ, বাইবেল-এর প্রসঙ্গ (এ-জাতীয় সব নাম জানানোর অক্ষমতাটাও প্রকাশ করছি) ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে। 'বেদের যুগ', 'উপনিষদের যুগ', 'মহাকাব্যের যুগ' (মহাকাব্য-শব্দটির অর্থ না জেনেই যুগটির যে নামকরণ হয়েছিল একথা জানিয়ে রাখা ভালো) এবং 'পুরাণের যুগ'—চিহ্নিত মিথ্যাগুচ্ছ ওই ইতিহাসে ঠাঁই পাওয়ার সূত্রেই যেন ঐতিহাসিক সেজে বসে আছে। যেন কতই-না প্রামাণ্য—কতই-না নির্ভরযোগ্য। উল্টোদিকে ভূতুড়ে ভাষায় লেখা ওই চতুর্বেদের চাতুরী—কাঁচা সংস্কৃতে লেখা উপনিষদ-গুলোর বেদান্ত (=দর্শন)—পাকা সংস্কৃতে লেখা বীররসাত্মক

গল্পসমৃদ্ধ মিথ্যাগুটি—কিংবা তিন ডজন পুরাণের নামে লিখে রাখা ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞানের ভূতুড়ে জ্ঞানকোষ-মার্কা কাণ্ডকারখানা থাকাতে নীরস ওই ইতিহাসটাও যেন একটু সরস হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। ফলে পাঠযোগ্য। মানতেই হয় পাঠযোগ্যতার বিচারে উৎরে গেছে ওই ইতিহাসটা। বলে রাখা ভালো পাঠযোগ্য হওয়াটাই ইতিহাসের বড় গুণ নয়। বড় গুণ তার বিশ্বাসযোগ্যতা। আর তা আনার স্বার্থেই রাখার দরকার হয় প্রমাণের। প্রমাণ ছাড়া ইতিহাসে ঠাঁই পাওয়ার যোগ্যতা আসে না। না কোনও গল্পের—না কোনও মিথ্যার। আর তাই অশোকের গল্পের, শিবাজীর গল্পের অসংখ্য প্রমাণ বানিয়ে রাখতে হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত, বেদ-উপনিষদ, পুরাণ-বাইবেল ইত্যাদি মিথ্যাগুলোর প্রমাণ রাখার দরকার পড়েনি। দরকার পড়েছে শুধু বইগুলোকে প্রাচীনকালে 'রচিত' বলে চালানোর। বইগুলোর বয়সের গাছ-পাথর নেই বলে প্রচার করার মধ্য দিয়েই প্রমাণের অভাবটা ঢেকে-ঢুকে রাখা হয়েছে। গল্পগুলোকে প্রমাণসিদ্ধ হতে হয়েছে। মিথ্যাগুলোকে 'ঐতিহ্যসিদ্ধ'।

ঐতিহাসিকদের কেরামতি ওই সব প্রমাণ বানিয়ে রাখার কর্মকাণ্ড আর আধুনিককালে বানিয়ে রাখা কেতাবগুলোকে প্রাচীন বলে চালানোর আঁতেলি কসরৎ-এর মধ্যেই খুঁজে নিতে হয়। আর তাইতেই ধরা পড়ে যায় তাঁদের পণ্ডিতি কারসাজি। ইতিহাস সব সয়। জাল-জালিয়াতি-জোচ্চুরি-প্রতারণা-প্রবঞ্চনা সবই ইতিহাসে মানিয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি ইতিহাস সত্য বা ঘটনার ওপর যত না নির্ভর করে তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর। অনেকটা ওই বিচার ব্যবস্থার মতোই। সাজানো প্রমাণের ওপর বিচারকের 'ন্যায়' বিচার নির্ভর করে। বানিয়ে রাখা প্রমাণের ওপর নির্ভর করে ইতিহাসের পণ্ডিতদের 'যুগান্তকারী', 'আলোড়ন-সৃষ্টিকারী' বা 'বৈপ্লবিক' সিদ্ধান্তগুলো। অশোক-আলেকজাণ্ডার থেকে শুরু করে হর্ষবর্ধন-তক স্বরব্যঞ্জন শেষ করা

চরিত্রবাহিনীর শোভাযাত্রার আর এক নাম ওই প্রাচীন যুগের ইতিহাস।

ইতিহাসের ওইসব চরিত্র সজীব হয়ে উঠেছে প্রমাণ রাখার অভিনয়ের গুণে। আসলে ওই যুগের ইতিহাসের কতটুকু সত্যি—এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে পণ্ডিতেরা সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে এই। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের প্রমাণ হিসাবে যেসব প্রত্ন-উপকরণ দেখানো হয়—তা সে শিলালিপি বা প্রত্ন-মুদ্রাই হোক—ধাতব কাণ্ডকারখানাই হোক—সে-সব কিছু স্থানবিশেষে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার দায়িত্বে থাকেন আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের লোকজনেরা। এইসব তথাকথিত প্রত্ন-উপকরণগুলোর বিচার বিশ্লেষণ—ওগুলো কত বছরের পুরনো তা জানানোর—কোনটা খাঁটি কোনটা জাল—সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ওই সার্ভের পণ্ডিতদের এক্তিয়ারেই থাকে। বাইরের পণ্ডিতেরা এসব ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন না। সার্ভের তরফের বক্তব্যটাকেই মেনে নিতে হয়। মেনে নিতে হয় নির্দ্বিধায়।

সার্ভে সরকারের একটি বিভাগীয় সংস্থা। জ্ঞানের রাজ্যে সরকারী বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। নিরপেক্ষ পণ্ডিতদের কথাই গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

ইতিহাসের ওইসব 'কাঁচা মাল'-এর ক্ষেত্রে এ নিয়ম থাকলেও ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ বলে প্রচার করা বইগুলোর ক্ষেত্রে তা থাকে না। তথাকথিত উৎসগ্রন্থগুলোকে ইতিহাসের 'পাকা মাল' বললেই ভালো হয়। এগুলোর বিচারবিশ্লেষণ দুনিয়ার পণ্ডিতদের যিনি যেমন কায়দায় পারেন করে নেন। সার্ভের মনোপলি থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের কাছে ওইসব উৎসগ্রন্থের সবই অমূল্য সম্পদ! এক একটি বইয়ের ওপরে শতাধিক গবেষণা-পত্র লেখা হয়। অবলীলায় ডক্টরেট পেয়ে কৃতার্থ হন পণ্ডিতেরা। পাকা হাতে লেখা বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, বাইবেল-পুরাণ 'অর্থশাস্ত্র', 'নাট্যশাস্ত্র' গুলোকে ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ বলে

চালানোর উদ্যোগ-আয়োজন নেওয়া হয়। বইগুলোর ওপরে গবেষণা করে কেউ মনীষি সেজে বসেন। কেউ সেজে বসেন পণ্ডিত।

মজার কথা এই: যেসব বইকে ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ বলে চালানো হয়েছে—যেগুলোকে ভিত্তি করে পণ্ডিতেরা তথ্য ও তত্ত্বের পাহাড় বানিয়েছেন তার সবই প্রকাশিত হয়েছে উনিশ শতকে। আঠারো শতকে নয়—সতেরো শতকেও নয়। অশোকের গল্প আঠারো শ' উনিশ খ্রীষ্টাব্দের আগে কেউ শোনেনইনি—জানতেনও না। সতেরো শ' চুরাশি খ্রীষ্টাব্দের আগে চাণক্য, হাফিজ, সাদি, কনফিউসিয়াসের নাম যথাক্রমে ভারত, ইরান, আরব ও চীনদেশের কেউ শোনেন নি—কেউ জানতেনও না। সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত আঠারো শতকে কেউ দেখেন নি। দেখেন নি প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা বলে প্রচার করা প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হোমারদের লেখা কোন কেতাবই। দেখেন নি তথাকথিত ল্যাটিন ভাষায় লেখা বেশির ভাগ কেতাবও। দেখেন নি কারণ সে-সব দেখার প্রশ্নই তখন ওঠেনি। প্রাচীন বলে চালালেই কিছু প্রাচীন হয়ে যায় না। আঠারো শতকের শেষ ভাগে প্রাচীন বলে প্রচার করা বিশ্ববিখ্যাত কেতাবগুলোর নামগুলোই জানা সম্ভব ছিল। মূল বইগুলোর সবই লেখা হয়েছে উনিশ শতকে। আর তা প্রমাণ করার জন্যই এই বই লেখার উদ্যোগ।

তথাকথিত মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কেও অন্য কথা বলা যায় না। এই যুগের ইতিহাসের উৎস-বা আকরগ্রন্থ বলে যেগুলোকে জানানো হয়েছে সেগুলোকে 'রত্নাকর গ্রন্থ' বললেই ভালো হয়। কত সিন্থেটিক রত্ন যে সেসব গ্রন্থে যত্ন করে রাখা হয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ফেরিস্তা-আলবীরুনিদের নামে লেখা কেতাবগুলো কিংবা বাবর নামা-আকবর নামার ক'খানা বিহারের-ভাগলপুরের, ক'খানা উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের আরবী-ফারসী-জানা পণ্ডিতদের দিয়ে লেখানো হয়েছে তা জানার উপায় আজ আর নেই। তবে ইতিহাসেই পাচ্ছি সরকারী উদ্যোগে ওই দুই জায়গায় বেশ কিছু

সুবিধাভোগী পণ্ডিতদের দিয়ে আরবী-ফারসী কেতাব লেখানোর এক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ওই ব্রিটিশ আমলেই। মোগল আমলে নয়—পাঠান আমলেও নয়। কোন পণ্ডিতকে দিয়ে কি লেখানো হয়েছিল—কেন লেখানো হয়েছিল তা অবশ্য নিয়মতান্ত্রিক ভাবে গোপনই রাখা হয়েছিল।

তবে বুঝতে কষ্ট হয়না তথাকথিত ওই মধ্যযুগের ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ বলে প্রচার করার উপযোগী কেতাবগুলোর বেশ কিছু তাঁদের দিয়েই লেখানো হয়েছিল। প্রমাণ হিসাবে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পুরো ব্যাপারটাই গোপনীয় কর্মকাণ্ড হিসাবে সারা হত। কাকপক্ষী টের পেত না। মন্ত্রগুপ্তির জালে জড়ানো পণ্ডিতেরা নিষ্ঠার সঙ্গে সে-কাজ সেরেছেন। নানান রকম বিভ্রান্তি-সৃষ্টির জন্যই বইগুলো লেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যই ওইসব পণ্ডিতদের কর্ম-উদ্দীপনার উৎস। কেতাবগুলোর প্রকাশকাল বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তই নিতে হয়। ওসবই প্রকাশিত হয়েছে উনিশ বা বিশ শতকে। আঠারো শতকে একখানাও হয়নি। মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি উৎস-গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন সুকুমার সেন মহাশয়। পরে জানা গিয়েছিল পুরো বইটাই জাল। জাল বই সম্পাদনা করার অভিনয় করেও অনেক পণ্ডিত নাম করেছেন। পণ্ডিতেরা ভাড়া খেটেছেন। পণ্ডিতদের নামও ভাড়ায় খাটানো হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে পণ্ডিতেরা কাজের দাম বুঝে নিতেন।

আজ যাঁরা বাবরী মসজিদকে ধূলিসাৎ করে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার খেলায় মেতে উঠেছেন—ঠাকুরদেবতাদের জন্মস্থান আর জন্মতারিখ আবিষ্কার করার মূঢ়তা প্রকাশ করে সারা দেশে অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করছেন—হাজার হাজার নিরীহ মানুষের রক্তে দেশটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছেন—তাঁরা শুধু রাজনীতির লোক বলেই রেহাই পেয়ে যাবেন—এমন বিচিত্র বিধান ভারতবর্ষেই সম্ভব।

এখানে রাজনীতির নামাবলী চড়িয়ে চুটিয়ে সাম্প্রদায়িকতা করা যায়—শয়তানি করা যায়—খুনরাহাজানি সবই করা যায়। খুনীর হয়ে রাজনীতির পাণ্ডারা গণসহি সংগ্রহ করেন। শয়তানকে গণরোষের হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে রাজনীতির গুণ্ডা-সর্দার। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। রাজনীতির পাণ্ডারা মামাতো পিসতুতো। উল্টো রাজনীতির নেতা মারা গেলেও এঁরা চোখের জলের বন্যা বইয়ে দেন। উল্টো রাজনীতির নেতাকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুক্তির দাবী তুলে বসেন আর এক রাজনীতির নেতা। আসলে রাজনীতির মানুষদের নিজেদের মধ্যে বেশ একটা গোপন সমঝোতা গড়ে ওঠে। বাইরে প্রচণ্ড বিরোধিতার অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আসলে শয়তানদের শেষ আশ্রয় যে ওই রাজনীতি। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সর্বধর্মসমন্বয়ের বিধান—গণতন্ত্রের নামে সর্বশয়তানসমন্বয়ের ব্যবস্থা—সমাজতন্ত্রের নামে দুর্নীতির জাতীয়করণ ভারতেই সম্ভব হয়েছে। এ-বস্তু আর কোথাও চলেনি। সে যাই হোক। মৌলবাদীরাও আর এক জাতের শয়তান আর তাই তাঁরাও ওই রাজনীতির ভেক নিয়ে বসে আছেন। এঁদের মধ্যে হিন্দুমৌল-বাদীরা অউধ, মুথরা, দ্বারিকায় গোটা কয়েক চরণামৃত তৈরির কারখানা বানানোর মতলব জানিয়ে তথাকথিত হিন্দুবিবেককে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। এঁরা রামায়ণ-মহাভারতকে নির্ভরযোগ্য ও ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর দুটি বই ভেবে নিয়ে দিকে দিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন ত' তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে আর একদল মুসলমান মৌলবাদী 'বাবর নামা'কে প্রামাণ্য গ্রন্থ ভেবেনিয়ে মসজিদটাকে বাবরের বানানো মসজিদ বলে জানানোর নিরর্থক জিদ ধরে বসে আছেন। ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ হিসাবে চালানোর তাগিদে সবই যে অর্ডার দিয়ে লেখানো কেতাব—এইটাই কেউ বোঝেননি. বই তিনটি যে বিভ্রান্তি-সৃষ্টির উপযোগী মালমসলায় ভরা এইটাই কেউ বোঝার চেষ্টা করেননি। প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণার ধারক

ও বাহক সংস্কৃত রামায়ণ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ এ-সংস্কৃত মহাভারত ১৮৫০-এ। আউধী ভাষায় লেখা বলে প্রচার করা রামচরিতমানস প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। অত্যুৎসাহী হিন্দু-ধর্মধ্বজীরা বইটাকে লুফে নেন। অউধে রামজনমভূমি বানানোর মতলবটার জন্ম হয়। মসজিদটাকে মন্দির মনে করে নিয়ে বিজাতীয় একটা উল্লাস প্রকাশ করার ছোঁয়াচে রোগ ছড়ানোর চেষ্টা হয় ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। মসজিদটা যে মসজিদই ছিল—ওটা যে কস্মিনকালেও মন্দির ছিলনা—এ-সব কথা কেউ তুললেন না। ব্যাপারটাকে উগ্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রেস্টিজ ইস্যু বানিয়ে নেওয়া হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। যেন ভারতের সবচেয়ে বড় ইস্যু ওইটাই।

তথাকথিত বাবরী মসজিদের সঙ্গে যে বাবরের কোনও সম্পর্ক ছিলনা—বাবর নামা নামের ফার্সী কেতাবটা যে তুর্কী বাবরের লেখা নয়—বাবর নামা-অমুক নামা-তমুক নামার কোনওটাই যে ওই মোগল আমলে লেখা হয়নি—সবই যে এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে ও উদ্যোগে উনিশ শতকে ভাড়াটে লেখকদের দিয়ে লেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল—এসব জানার চেষ্টা কেউই করেননি। উল্টে বইটাকে প্রামাণ্য মনে করে নিয়েছেন সব পণ্ডিতই। বাবরের আমলে কামানের প্রচলন ছিল—এই উদ্ভট তথ্যও পণ্ডিতদের কেউ কেউ দিয়ে বসেছেন। বাবর নামায় 'কমান' ব্যবহারের প্রসঙ্গ রাখা হয়েছিল একটু রসিকতা করার জন্য। ফার্সী ভাষায় 'কমান'-এর অর্থ ধনুক। আসলে ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ বলে প্রচার করার উপযোগী কেতাবগুলোতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুকৌশল চেষ্টা থাকত। পণ্ডিতেরা ওইসব বিভ্রান্তির পেছনেই দৌড়ঝাঁপ করতেন। পুরো বইটাই যে জাল তা জানার চেষ্টা না করেই। বাবর নামার 'বাবর'-নামক আধুনিক নেপথ্য শিল্পী তথাকথিত আত্মজীবনীটিতে পেরু-পাখীর মজাদার বিবরণ লিখতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। বইটা যে জাল তা প্রকাশ

করে বসেছেন। বাবরের আমলে ওই পেরু-নামক প্রাণীটির ভারতে আগমন ঘটেনি। ঘটেছিল অনেক পরে। আমেরিকা থেকে আসতে কিঞ্চিৎ দেরি হয়েছিল।

আসলে ব্রিটিশ সরকারের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' পলিসির একটি খেলা হিসাবেই নানান ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদের মানসিকতাকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তোলার আয়োজন হত। 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' অর্থে মানুষগুলোকে নানান ভাগে ভাগ করে ফেলা—দেশটাকে নয়। মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে মরে মরুক—বড় শত্রুকে যেন না চিনে ফেলে—নিজেদের মধ্যে যাতে ঐক্য না গড়ে ওঠে—এ-সব চিন্তা থেকেই ওই 'নীতি'র প্রয়োগ ঘটত। এক ধর্মের মানুষের সঙ্গে আর এক ধর্মের মানুষের ভেদবুদ্ধি বাড়ানোর জন্যই ধর্মীয় কেতাব লেখানোর এক মহোৎসব শুরু করেছিলেন সদাশয় ব্রিটিশ সরকার। বাঁশবেড়ে-কোটালিপাড়া-কালিয়া-বনারস-এর পণ্ডিতদের দিয়ে হিন্দু ঐতিহ্যের লজেঞ্চুস যেমন বানানো হত তেমনি বানানো হত ইসলাম ঐতিহ্যের লালিপপ—জৌনপুর—ভাগলপুরের মৌলবীদের সহযোগিতায়।

নানান ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীরটা যাতে মজবুত ভাবে গড়ে ওঠে তার চেষ্টাই তাঁরা করে রাখতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এটাও দেখতেন যাতে দেশটা এক থাকে। দেশটা যেন টুকরো-টুকরো না হয়ে যায়। আর তা দেখার জন্যই ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী সম্রাট হিসাবে অশোকের গল্প বানানোর আয়োজন হত। আয়োজন হত সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা প্রমাণের আদিখ্যেতা বানিয়ে রাখার। দেশ সম্পর্কে ভারতের মানুষের গর্ববোধটাকে উস্কে দেওয়ার কাজে লাগে এমন বই লেখানোর ব্যবস্থাও কিছু কম করেননি ওই ব্রিটিশ সরকার। আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী দু-ধরণের কর্মকাণ্ডেই ব্রিটিশ সরকার মেতে উঠেছিলেন। সবই তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। অতীতের কাসুন্দি ঘাঁটার ইচ্ছা ভারতের

কোনও জাতির মানুষেরই ছিলনা। কোনও জাতিই তার পূর্ব ইতিহাস জানতেন না—জানার প্রশ্নও ছিল অবান্তর। কারণ আদ্যিকালে লেখা কোনও পুঁথি তাঁদের কেউই দেখেননি। ইতিহাস ত' দূরের কথা—ধর্ম, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে লেখা কোনও পুঁথির কথা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না। ধর্ম নিয়ে মাতামাতি—দর্শন নিয়ে বাড়াবাড়ি—ভাষাতত্ত্ব নিয়ে ফাজলামি সবই শুরু হয় ভারতে ব্রিটিশ আসার পরে। আগে নয়। লণ্ডন কোম্পানীর (পরবর্তীকালে যার নাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হয়) সঙ্গে বেশ কিছু পণ্ডিতও ভারতে এসেছিলেন। এক অংশ সাম্রাজ্য গড়তে—আর এক অংশ ইতিহাস বানাতে। নাপোলিয়ঁর সঙ্গে শাঁপোলিয়ঁকে মিশরে যেতে হয়েছিল। একজনকে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে ত' অন্য জনকে ওই মিশরের ইতিহাস বানাতে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে স্থায়ী ও সুরক্ষিত রাখার জন্য উপনিবেশের মানুষকে ইতিহাস গেলানোর উদ্যোগ নেওয়া হত। নেওয়া হত ধর্ম, দর্শন আর ভূতুড়ে ভাষাতত্ত্বের পাচন গেলানোর। বর্তমান আর ভবিষ্যৎটা তাঁরা রাখতেন নিজেদের জন্য।

একদিকে জাতীয়তাবাদের জয়গান—অন্য দিকে নানান ধর্মের মহিমাকীর্তন দুই চলত পাশাপাশি। ইংলিশ-মিডিয়াম হিন্দু মৌলবাদী—উর্দু-ইংরিজি মাধ্যম মুসলমান মৌলবাদীদের দিয়ে তথাকথিত ধর্মীয় রিভাইভালিজম্-এর মোহজাল বিস্তার করার মধ্য দিয়ে ভারতের মানুষকে আর এক গাড্ডায় ফেলার প্রয়োজনও বোধ করতেন ওই ব্রিটিশ সরকার। খয়ের খাঁদের মহামহোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, রায়সাহেব, রায়বাহাদুর খেতাব বিতরণের মহোৎসব লেগেই থাকত। লেগে থাকত মহানুভব প্রাচীনপ্রেমিক (?) ওই সরকারের দাক্ষিণ্যে। আর সেই খেলাটাকেই বাঁচিয়ে রেখে চলেছে তাঁদের উত্তরাধিকারী স্বাধীন ভারত সরকার। মৌলবাদের জন্মদাতাদের জীবনী ছাপানোর বহর দেখে সে-সরকারের মতলবটা বুঝতে কষ্ট হয়না। সরকারী প্রচার মাধ্যম থেকে এঁদের মাত্রাতিরিক্ত

গুরুত্ব দেওয়ার দৃষ্টিকটু আয়োজন দেখেও যে কেউ সন্দেহ করেন না সেইটাই আশ্চর্যের। নামী অর্থনীতিবিদকে দিয়ে জনৈক মৌলবাদীর জীবনী লেখানোর ব্যবস্থাও হয়েছে।

আলবীরুনির নামে লেখা কেতাব লেখা হল আরবী ভাষায়। ভারতের পণ্ডিত আরবী ভাষায় কিছু লিখলে ভুলচুক কিছু থেকে যেতেই পারে। তাই তাঁকে আরবী-জানা ফারসী বলে জানানো হল। সাবধানের মার নেই। অনারবী লেখকের ভাষায় ভুল থাকলে কে আর সন্দেহ করতে যায়। যে যুগে আরবী-সংস্কৃত ডিক্সনারি ছিলনা ( বলে রাখা ভালো এখনও নেই ) সে-যুগে ভারত-সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া-চরিত্রের ওই ঢাউস সাইজের বইটা কোন যাদুবলে লেখা হয়েছিল—এ-প্রশ্ন কেউ তোলেননি। তোলা উচিত ছিল। রহস্যটা ধরা পড়ে যেত। বইটিতে আঠারো পুরাণের নাম ও সেসব বই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সবই রাখা হয়েছিল।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে পুরাণের প্রকাশ শুরু হলেও সর্বশেষে 'ভবিষ্যপুরাণ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস'—মহাশয়ের ছদ্মনামের আড়ালে থাকা কেশব সেন-ই ওই পুরাণটি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন বাইবেল-এর কায়দা চুরি করে। বাইবেলে আভাসে ইঙ্গিতে ভবিষ্যবাণী আকারে আলেকজাণ্ডারের প্রসঙ্গ রাখা হয়েছিল। এশিয়ার নানান দেশ জয় করে তিনি যে ভারতে এসে পৌঁছবেন এমন একটি বিচিত্র সংবাদও ওই বাইবেলে রাখা হয়েছিল। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—মিথ্যার সাক্ষী তার ডালপালা। এক মিথ্যার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আর এক মিথ্যার অবতারণা এই ভাবেই করতে হয়। প্রাচীন বলে প্রচার করা সব কেতাবেই এই কাণ্ড করা হয়েছে। রেফারেন্স আর ক্রসরেফারেন্স-এর বহর দেখে পণ্ডিতেরা ওইসব প্রাচীন (?) কেতাবগুলোকে ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ বলে ভেবে বসেছেন। সবই যে একই কারখানায় তৈরি—একই পেটেন্ট—একই পরিকল্পনার হেডকোয়ার্টার-এর নেপথ্য পরামর্শদাতাদের পরামর্শে লেখা হয়েছে—

এবং সবচেয়ে বড় কথা সবই যে আধুনিক যুগে লেখানোর উদ্যোগ-আয়োজন নেওয়া হয়েছে—এসব কথা কেউই প্রকাশ করেননি। ঘটনা হচ্ছে এই। সে যাই হোক, বাইবেল-এর কায়দা চুরি করে ওই ভবিষ্যপুরাণেও কিছু ভবিষ্যবাণী রাখা হয়েছিল। অশোক-চন্দ্র গুপ্তরা এতদিন রাজত্ব করবেন—কেশব সেনেরা সমাজ-সংস্কার করতে এগিয়ে যাবেন—এই ধরণের সব বাণী ওই পুরাণে লিখে ত্রিকালজ্ঞ ভুসুণ্ডি সেজে বসেছিলেন ওই কেশব সেন। মধ্যযুগের ওই আলবীরুনি যে কোন দিব্যদৃষ্টির মহিমায় ওই পুরাণের খবর জেনে গিয়েছিলেন সেইটাই সন্দেহের। আর ওই সন্দেহের সূত্রেই বুঝতে কষ্ট হয়না ওই রত্নাকর গ্রন্থটি একটি জাল কেতাব ছাড়া কিছুই নয়। জনৈক জার্মান পণ্ডিতকে দিয়ে বইটির জার্মান অনুবাদ করানোর ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ওই আলবীরুনি নামক মিথ্যার আন্তর্জাতিকীকরণের আয়োজন হয়েছিল। ঘটনা হচ্ছে এই। আসলে কিলো দরে বিক্রী হওয়ার যোগ্যতা ছাড়া বইটির যে কোনও উপযোগিতা নেই তা বলে রাখা ভালো। প্রসঙ্গত, প্রাচীন বলে প্রচার করা শতকরা একশ ভাগ বই-য়ের ওই যোগ্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। নেই কারণ প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন ভাষা, প্রাচীন ধর্ম—সবই একটি বড় 'মিথ'-এর নানান নাম। ইতিহাস ও-সবের যতই মহিমা-কীর্তন করুক না কেন—কোনওটারই অস্তিত্ব ওই প্রাচীন কালে ছিলনা। আর তা প্রমাণ করাটাও এ-বইয়ের উদ্দিষ্ট।

জাল বইকে ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ ভেবে অনেকেই ঠকেছেন। ফেরিস্তাকে প্রামাণ্য ইতিহাসকার ভেবে নিয়ে হিন্দুজাতীয়তাবাদী বিবেকানন্দও মারাত্মক ভুল এক তথ্য দিয়ে বসেছিলেন। মুসলমানদের ভারতে আসার সময় হিন্দুর সংখ্যা যে ষাট কোটি ছিল—এবং উনিশ শতকের শেষ ভাগে যে তা কমে গিয়ে মাত্র কুড়ি কোটিতে দাঁড়িয়েছে—এই বিভ্রান্তিকর তথ্যটি জানিয়ে তিনি আক্ষেপও করে বসেছিলেন। আক্ষেপ করার আরও একটি কারণ এই ছিল যে, হিন্দুদের মধ্য থেকে যাঁরা ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ

করে বিপথগামী হয়েছিলেন ( তাঁর এই বিশ্বাসই ছিল ) তাঁরা যে কেবল হিন্দুধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কমানোর জন্যই দায়ী ছিলেন তাই নয়—হিন্দুধর্মের শত্রুর সংখ্যাও নাকি তাঁরা বাড়িয়েছিলেন। ধর্মান্তর তাঁর কাছে conversion ছিলনা—ছিল perversion। মৌলবাদের জন্মদাতা হিসাবে হক কথাই তিনি বলেছিলেন। দুঃখের কথা ওই জাল কেতাবের লেখক ওই ফেরিস্তাকে বিশ্বাস করতে গিয়েই তিনি ভুলভাল কথাগুলো বলে ফেলেছিলেন। তথ্যগুলো যাচাই করে দেখার মানসিকতাও তাঁর ছিলনা। ভাবের আবেগে চললে এই হয়। জনগণনা সম্পর্কে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা ত' উল্টো কথাই বলেছেন। তথাকথিত ফেরিস্তা যে সময়ের কথা লিখেছেন সে সময় সারা পৃথিবীতে যে ষাট কোটি লোক ছিলনা। তাহলে? জাল বইয়ে জাল খবরই থাকে। পণ্ডিত এবং পণ্ডিতম্মন্যদের বোকা বানানোর তাগিদেই ওই ধরণের বই লেখানোর ব্যবস্থা করতেন ওই ব্রিটিশ সরকার।

আধুনিক যুগের ইতিহাসেও বেশ কিছু গল্প ঢুকে বসে আছে। কেউ সনাক্ত করেননি—এইটাই আশ্চর্যের। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ওপরে লেখা অনেক গল্পই ইতিহাস হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের গল্পটাকে ইতিহাস বলে চালানোর জন্য অফুরন্ত প্রমাণ রাখার আয়োজন হয়েছে। প্রমাণের শেষ নেই। এখনও এসেই চলেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রচারমাধ্যম থেকে সেসব নিয়মিতভাবে প্রচার করার ব্যবস্থাও পাকা। যেসব রাষ্ট্রের নাম জড়িয়ে গল্পটা বানানো হয়েছে সেসব রাষ্ট্রও গল্পটিকে ইতিহাস বলেই মনে করে। গল্পের নায়কের সহকর্মী পরিচয় দিয়ে ধন্য হয়েছেন এমন অনেকে নিয়মিতভাবেই গল্পটিকে ঐতিহাসিক বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। বইপত্র লেখা হয়েছে প্রচুর। অদ্ভুত সব নাম। 'আমি হরিপদ বলছি', 'আমি এক নম্বর ভুতকে দেখেছি', 'দু-নম্বরের ভুতটাকেও দেখলাম', 'অমুকচন্দ্র ঘরে ফিরে নাই'-মার্কা সব নাম। এক ভদ্রলোক 'কানা ছেলে

এবং পদ্মলোচন' আপাতদৃষ্টিতে ধাঁধামার্কা-আসলে যথার্থ নামেও একখানা কেতাব লিখেছিলেন। যাঁর 'কানাছেলে' অংশটা ছিল এক পদের ত' 'পদ্মলোচন' অংশটা ছিল বিপদের। ডাহা কাঁচা, মেয়েলি, অথচ লেখক নাকি একজনই। গল্পের নায়কের স্ত্রী' এখনও বেঁচে আছেন। 'কন্যা'-টিও বারদুয়েক ভারতে এসে সরকারী সমাদর কুড়িয়েছেন। 'স্ত্রী'-ভদ্রমহিলাটি যে কতবড় মিথ্যুক তা বুঝে নিন। এঁরা সবাই ওই নেতাজির জীবন্ত প্রমাণ। আর 'জীবন্ত প্রমাণ' বলে চালানোর জন্যই 'স্ত্রী' ও 'কন্যা' চরিত্রের উদ্ভাবনা ও চরিত্রাভিনেত্রী দুজনের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছিল। সবই হয়েছিল। গলদ কিছুতেই রাখা হয়নি। হয়েছে শুধু বিসমিল্লায়। ওই নেতাজি বলেই কেউ ছিলনা। ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু যাঁর কর্মকাণ্ড উনিশ শ' একচল্লিশ সালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। 'নেতাজি' হয়ে ওঠার সুযোগ তিনি পাননি। সে-সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়নি। আর সে-যোগ্যতাও তাঁর ছিলনা। একচল্লিশ সালে ভারতের বাইরেই তিনি যাননি। জাপান-জার্মানীত' দূরের কথা। আসলে রাধাও নাচেনি—সাত মণ তেলও পোড়েনি। ব্যাপারটি এই রকমই হয়েছিল। কলকাতার এলগিন রোডের রায়বাহাদুর জানকী নাথ বসুর বাহাদুর ছেলের কীর্তিকাহিনী বলে যা কিছু চালানো হয়েছে তার সবটাই ধাপ্পা। বিদ্যাসাগরী ভাষায় গল্পটাকে বিশ শতকের ভ্রান্তিবিলাস বললে ভুল হয়না। আরও আছে। রাসবিহারী বসুও জাপানে যাননি যদিও তাঁর প্রবাস জীবন সম্পর্কেও 'ইতিহাস'-এর আর এক গল্প বানানো হয়েছিল। হয়েছিল রাষ্ট্রের উদ্যোগেই। দুজনের গল্পই আজ ইতিহাস সেজে বসে আছে আর তা প্রমাণ করাটাও এ-বইয়ের উদ্দিষ্ট।

# রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে পণ্ডিতদের বিচিত্র সব ধারণা

রামায়ণ-মহাভারত কবে লেখা হয়েছে—এ-প্রশ্নে পণ্ডিতদের কেউই যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য প্রমাণ কিছু দেননি। বইদুটি লেখার পেছনে কোনও রহস্য আছে কিনা—নেপথ্যে থাকা কোনও শিল্পীর পরিকল্পনা অনুযায়ী বইদুটি লেখার বা লেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল কিনা—কিংবা একই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে অন্য কোনও বই লেখানো হয়েছিল কিনা—এ-সব প্রশ্ন নিয়েও তাঁরা কোনও কথা বলেননি। আসলে প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে গিয়েই তাঁরা এগোবার চেষ্টা করেছেন। ঘটনা হচ্ছে এই। বইদুটিকে প্রাচীন কালের দুটি প্রামাণ্য দলিল বলে তাঁরা মেনে নিয়েছেন। আর তা মেনে নিয়েছেন বলেই বই দুটির ওপরে গবেষণা করতে তাঁরা উৎসাহী হয়েছেন। মেনে না নিলে যে তত্ত্ব তৈরি করার সুযোগটাই নষ্ট হয়ে যেত। এ-সুযোগ কি ছাড়া যায়? বইদুটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাচীন ভারতের মানুষের ধর্মীয়, দার্শনিক ও আর্থ-সামাজিক চিন্তাভাবনার বৈশিষ্ট্য ও চমকপ্রদ অগ্রগতির ছবি তাঁরা এঁকে চলেছেন। আঁকার বিরাম নেই। দেশবিদেশের নামী নামী পণ্ডিত শ'খানেক বছর ধরে গবেষণার নামে বইদুটি সম্পর্কে নতুন নতুন বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টাই করেছেন। প্রতিষ্ঠিত সব পণ্ডিত বইদুটি সম্পর্কে যেসব ধারণার প্রসার ঘটিয়েছেন—যা তাঁরা মোটামুটি ভাবে একমত হয়েই প্রচার করেছেন এবং সরকারী বেসরকারী প্রচারমাধ্যমের প্রচারের কল্যাণে যা ইতিমধ্যে জনমানসে শেকড় গেড়ে বসেছে তা সংক্ষেপে এই:

এক, বইদুটি মহাকাব্য-পদবাচ্য। অর্থাৎ 'মহাকাব্য' বলতে যা বোঝায় তাই।

দুই, বইদুটি প্রাচীনকালে 'রচিত' হয়েছিল। ('রচিত'—শব্দটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।) 'প্রাচীন

কালে' মানে আজ থেকে হাজার আড়াই বছরেরও আগে—এইটাই ধরে নিতে হবে।

তিন, দুটোই প্রাচীন যুগের ইতিহাসের পুরোপুরি না হলেও অংশতঃ আকরগ্রন্থ। আর সেই জন্যই বইদুটোর প্রসঙ্গ ইতিহাসের বইয়ে যত্ন করে রাখা হয়েছে। বইদুটোয় পরিবেশিত তথ্যগুলোকে সত্যি ভেবে ইতিহাসকারেরাও বেশ কিছু তত্ত্ব বানিয়ে নিয়েছেন।

চার, বইদুটো প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে—এখনও বইদুটিকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই মেনে নেওয়া হয়।

পাঁচ, বইদুটো প্রথমে সংস্কৃত—পরে প্রথমে তামিল এবং তারও পরে ভারতের অন্য অনেক ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ছয়, বইদুটো প্রথমে 'রচিত' হয়েছিল—'লিখিত' হয়নি। 'রচিত' আর 'লিখিত'-র ধাঁধার জট খুলে পণ্ডিতেরাই জানিয়েছেন: বইদুটো প্রথমে 'রচিত' হলেও 'লিখিত' আকারে ছিলনা। ছিল মুখে মুখে। লিপির জন্ম তখন হয়নি আর তাই মুখস্থ করেই কাব্য দুটিকে বংশানুক্রমে বাঁচিয়ে রাখা হত। এইভাবে হাজার খানেক বছর চলার পর কাব্যদুটি লেখার ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্ততঃ পণ্ডিতেরা এই কথাই বলে আসছেন। তাঁরা যাই বলুননা কেন—তাঁদের প্রচার করা ছ'টি ধারণার সবই ভিত্তিহীন—সত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন। মজার কথা এই: দুনিয়ার পণ্ডিত কিন্তু ধারণাগুলোকে পরম সত্য বলেই মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন একবাক্যে। তাঁরা যাই মানুন না কেন—যত বড় পণ্ডিতই তাঁরা হোননা কেন—যত জোর দিয়েই তাঁরা কথাগুলো বলুননা কেন—তাঁদের কথার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কোনও মানে হয়না। সত্য হচ্ছে এই:

এক, অভিধানিক অর্থে বই বইদুটি মহাকাব্য নয়। দুই, বইদুটি প্রাচীন কালে লেখা হয়নি। হয়েছে আধুনিক কালেই। তিন, বইদুটিকে ইতিহাসের আকরগ্রন্থ মনে করার কোনও কারণ নেই।

চার, বইদুটোকে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলে মেনে নেওয়ার পেছনে কোনও যুক্তি নেই। কোনও বইকে ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকার সম্পন্ন কোনও সংস্থা ওই হিন্দু ধর্মের কোনও কালে ছিলনা—এখনও নেই। পাঁচ, বইদুটি প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়নি। হয়েছিল বাঙলা ভাষায়। পরে অন্য অনেক ভাষায় এবং সব শেষে না হলেও অনেক পরে ওই সংস্কৃত ভাষায় বইদুটি লেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। ছয়, ছন্দোবদ্ধ ও বিরাট আকৃতির কাব্য যে মুখে মুখে হাজার খানেক বছর বেঁচেছিল—লিপির মাধ্যম নিরপেক্ষ বায়বীয় অস্তিত্ব নিয়ে পুরুষানুক্রমে বাঁচতে পেরেছিল—একথাটা এতই আজগুবি যে দিকপাল পণ্ডিতেরা বললেও তা মানা যায় না। এই ছ-টি বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করায় জন্য বিস্তৃত আলোচনা পরে রাখছি।

বইদুটির পরিচয়-সম্পর্কিত ধারণাগুলোকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিতেরা একমত হলেও বইদুটির চরিত্রলক্ষণ বোঝানোর ব্যাপারে তাঁরা একমত হননি। সে ব্যাপারে মোটামুটি-ভাবে তিন রকম বক্তব্য তাঁরা রেখেছেন।

এক, তাঁদের একটি অংশ যা বলতে চেয়েছেন তা সংক্ষেপে এই: বইদুটি ইতিহাস-ধর্মী; রঙ চড়ানো কিছু হয়ে থাকলেও পুরো বানানো গল্প বলতে যা বোঝায় তা নয়। ইতিহাসের মাল-মসলাও বইদুটোতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। আর তা আছে বলেই ইতিহাসে বইদুটির কথা ঠাঁই পেয়েছে। ভিত্তিহীন এই ধারণাটাকে সত্য বলে বাঁচিয়ে রেখেছেন ঐতিহ্যগর্বী এক শ্রেণীর মানুষ যাঁরা নিজেদের ঐতিহাসিক ভেবে আনন্দ পান। এঁরা বইদুটোর প্রাচীনত্ব ও সত্যতা জাহির করতে উঠে পড়ে লাগেন। এঁদের পরামর্শেই অউধ, বনারস, মুথরা, বৃঁদাও, পাভোসায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের নামে খোঁড়াখুড়ির অভিনয় সারতে হয়। সারতে হয় গল্পদুটোকে ইতিহাস বলে চালানোর তাগিদে। এঁদের বক্তব্যের সমর্থনে প্রচ্ছন্নভাবে রাষ্ট্রও এগিয়ে আসে। আর আসে বলেই ওই ধরণের ব্যয়সাপেক্ষ কর্মকাণ্ড করা সম্ভব হয়। এঁদের

বক্তব্যটা লুফে নেন ভারতের হিন্দুমৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারবারীরা। অল্পশিক্ষিত মহলে এঁদের বক্তব্যটাই চলে বেশি। এমনকি প্রগতিশীল চিন্তাসম্পন্ন মানুষও এঁদের প্রচারে কিছুটা বিভ্রান্ত হন। বর্তমানে চালু স্থাননামগুলোর বাচস্পতিদের দিয়ে বানানো সংস্কৃত সাজানো ছদ্মবেশগুলোকে এঁরা প্রাচীন বলে ভেবে বসেন। অউধ, বনারস, মুথরা, পাভোসাকে অযোধ্যা, বারাণসী, মথুরা, প্রভাস বলে প্রচার করতে গিয়ে অবচেতনভাবে মৌলবাদীদেরই সহযোগিতা করে বসেন।

দুই, দ্বিতীয় যে ধারণাটা গড়ে উঠেছে তা সংক্ষেপে এই: রামায়ণটা সাহিত্যকর্ম অর্থাৎ পুরোটাই কল্পিত আর মহাভারতটা *ঐতিহ্যাশ্রয়ী* ইতিহাস—অর্থাৎ অংশতঃ কল্পিত। যেসব পণ্ডিত ধারণাটাকে প্রচার করে আসছেন তাঁদের বক্তব্যটা এই রকম: মহাভারতের এক জায়গায় বইটাকে ইতিহাস বলে জানানো হয়েছে—রামায়ণের কোথাও সে-কথা বলা হয়নি। বলা বাহুল্য তবু বলি—এটা কোন যুক্তিই নয়।

তিন, বইদুটির চরিত্রলক্ষণ সম্পর্কে তৃতীয় যে ধারণার প্রসার অন্য এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা করে আসছেন তার মূল কথা হল: বইদুটো ইতিহাস নয় ঠিকই তবে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি-সম্পর্কে কিছু জানতে গেলে বইদুটো না পড়লেই নয়। যুক্তি হিসাবে এঁরা বলেছেন: ইতিহাস না হোক—বইদুটো প্রাচীনকালে লেখা ত' বটেই আর তাই ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির তখনকার দিনের অবস্থার প্রতিফলন অংশতঃ হলেও বইদুটিতে যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? পুরনো যুগের লেখায় পুরনো দিনের ছবি ত' আসতেই পারে। ইতিহাসের মালমসলা যথেষ্ট না হলেও কিছু পরিমাণে নিশ্চয়ই আছে। বেশির ভাগ পণ্ডিত এই ধারণাটাকেই আঁকড়ে ধরেছেন। ধারণাটা যে ভুল তা জানার চেষ্টাও এঁরা করেননি। আসলে এঁরাই কিন্তু বেশি বিপদজনক। কারণ প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতদের বক্তব্যের আবেদন ধর্মভীরু অল্পশিক্ষিত মহলে

সীমাবদ্ধ থাকলেও এই তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতদের বক্তব্যে শিক্ষিত মানুষও বিভ্রান্ত হয়েছেন—হচ্ছেন। আর বিপদটা সেইখানেই। এঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন কিন্তু তার ফাঁক আর ফাঁকিটাকেই দেখাননি। প্রশ্ন হল: বইদুটো যদি প্রাচীনকালে লেখা না হয়ে থাকে—ওদুটো যদি আঠারো বা উনিশ শতকে লেখা বা লেখানো হয়—তাহলেও কি কথাগুলো মেনে নেওয়া যায়? তাহলেও কি প্রাচীন কালের প্রতিফলন বইদুটোতে আশা করা উচিত হবে? সে-কালের ফাঁপানো ফোলানো সংস্কৃতির ফানুসটা কি সেক্ষেত্রে ফেঁসে যাবেনা? বই-দুটোর ওপর প্রচণ্ড গবেষণা করে পণ্ডিতেরা আদ্যিকালের যে মুখ-রোচক বৃত্তান্ত বানিয়ে রেখেছেন তা কি কেউ বিশ্বাস করবেন? এ-সব প্রশ্ন আসছেই। পণ্ডিতেরা এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেননি কারণ এসব প্রশ্ন কেউ তোলেননি।

আসলে বইদুটো সত্যিই পুরনো—না পুরনো সাজানো—এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটাকে সব পণ্ডিতই এড়িয়ে গিয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে এই। পণ্ডিতদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় বুঝিবা প্রশ্নটির কোনও মানেই হয়না। বইদুটোর প্রাচীনত্ব বুঝিবা স্বতঃসিদ্ধ। আর সে-সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করাটা বুঝিবা ধৃষ্টতারই নামান্তর। এস্টাব্লিশ্‌মেণ্টের সেবাদাসেরা অপ্রিয় সত্যকে এইভাবেই উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। পণ্ডিতেরা যা কিছু মেনে নিয়েছেন তাই মানতে হবে—আর যা কিছু মেনে নেননি তা মানা উচিত নয়—এ-ধরণের কথা অর্থহীন। কারণ তাঁদের বেশির ভাগই যে এস্টাব্লিশ্‌মেণ্টের হয়েই কথা বলেন—তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে—তালে তাল ঠুকেই বক্তব্য রাখেন—এ-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনকি যাঁরা নিজেদের এস্টাব্লিশ্‌মেণ্ট বিরোধী ভেবে আনন্দ পেয়ে আসছেন তাঁরাও একবাক্যে বইদুটোকে প্রাচীন বলেই মনে করে বসেছেন। আর তা করতে গিয়ে এস্টাব্লিশ্‌মেণ্টের তৈরি ফাঁদেই আটকে পড়েছেন। ওঁদের তৈরি আসল মিথ্যাটাকে মেনে নিয়ে যে এগোবার চেষ্টা করা যায়না—

এইটাই তাঁরা বোঝেননি। আর তাই মিথ্যার চার দিকে এঁরাও ঘুরপাক খেয়েছেন, পাঠকদেরও ঘুরপাক খাইয়েছেন। এক কথায় এস্‌টাব্লিশ্‌মেণ্টের অনুগত ও বিরোধী দু-পক্ষই রামায়ণ মহাভারতকে প্রাচীন বলেই মেনে নিয়েছেন। মেনে নেওয়ার কারণ না থাকলেও। হাজার হাজার বছর ধরে মুখে মুখে ঘুরত—বংশপরম্পরায় বেঁচে আছে—দেবভাষা বলে কথা—রামায়ণের যুগে হনুমানেরাও সংস্কৃত বলতেন—বালক, স্ত্রীলোক আর গয়লা ছাড়া আর সবাই ওই সংস্কৃত ভাষাটা জানতেন- বুঝতেন—বইদুটোয় ব্যবহার করা ব্যক্তি-নামগুলো এখনও প্রচলিত আছে—স্থাননামগুলোর অপভ্রংশ মার্কা নামগুলো এখনও অনেক জায়গার নাম হিসাবে চালু আছে—এই ধরণের মুগ্ধবোধ কিছু কথাই পণ্ডিতেরা অনবরত বলে আসছেন। বলে আসছেন বইদুটোকে পুরনো বলে চালানোর স্বার্থে তথ্যগত প্রমাণ হিসাবে খাড়া করার তাগিদে। আর এত কিছু করেও জোরদার প্রমাণ কিছু না দেখাতে পেরে মূল প্রশ্ন থেকে দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার খেলাই তাঁরা খেলেছেন। বইদুটোতে কী অপূর্ব ছন্দসুষমার প্রকাশ ঘটেছে—চরিত্রচিত্রণে কী নিষ্ঠার পরিচয় রাখা হয়েছে—চরিত্রগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব কী সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—এই ধরণের সব সাহিত্যঘটিত ও ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রশ্নকে ঘিরেই তাঁরা ঘুরপাক খেয়েছেন। সাহিত্য হিসাবে কত উঁচুদরের কর্মকাণ্ড ওই সুদূর প্রাচীন যুগে আমাদের মুনিঋষিরা করে গিয়েছিলেন—তাই ভেবেই এঁদের গদগদভাব। তাই নিয়েই এঁদের যত গবেষণা—যত মাতামাতি। এঁরা উদ্ধৃতির ছয়লাপ করেছেন। কাব্যদুটি থেকে সুন্দর সুন্দর নীতিবাক্য কিংবা নীতিশিক্ষার উপাখ্যান উদ্ধার করে কেউ কেউ বোঝাতে চেয়েছেন সে-যুগটা ছিল নৈতিকতার যুগ—উঁচু আদর্শের যুগ। আর সেসব নাকি আজকের যুগেও প্রাসঙ্গিক—অনুকরণযোগ্য। এঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, নীতিজ্ঞানের বহর আর ভাষার বাহার দেখিয়েই বুঝিবা বইদুটির প্রাচীনত্বের প্রমাণ না থাকার অভাবটাকে

ঢেকে ঢুকে রাখা যায়। প্রাচীন বললেই কিছু প্রাচীন হয়ে যায়না, প্রমাণ দিতে হয়।

বই দুটির প্রাচীনত্বের প্রমাণ কিছু না থাকলেও পণ্ডিতেরা কিন্তু বইদুটির প্রশংসায় ডগমগ হয়ে উঠেছেন। সে প্রমাণ না থাকলে যে বইদুটি আধুনিক জালিয়াতি হয়ে দাঁড়ায়—এবং সেক্ষেত্রে বই দুটোর ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা সবই যে অর্থহীন হয়ে পড়ে—এসব বোঝার চেষ্টা তাঁরা করেন নি। বই দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসার বন্যা বইয়ে দেওয়ার খেলায় মেতে উঠেছিলেন তাঁরা। ধর্মধ্বজীরা বই দুটিকে লুফে নিয়ে তত্ত্ব তৈরী করলেন। মনীষিরা বই দুটির মহিমা প্রকাশ করতে শুরু করে দিলেন। যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আয়াস-সাধ্য পথে এগোনোর ইচ্ছা এঁদের কারুরই ছিল না। তার বদলে প্রচলিত বিশ্বাসের বায়বীয় স্রোতে অনায়াস-অবলীলায় গা এলিয়ে দিয়ে এঁদের কে যে কোথায় ভেসে যেতেন তার ঠিক-ঠিকানা থাকত না।

'বিশ্বাসে মিলয় বস্তু' বাদী এইসব ধর্মধ্বজী কিংবা মনীষিদের কেউ কেউ বই দুটিকে 'ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির বিশ্বকোষ' ভেবে আনন্দ পেয়েছেন। কেউবা ওই মহাভারতকে 'একটি জাতির স্বঃচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত' ভেবে পুলকিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ কত খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ স্বয়ং ভগবান হয়ে বসেছিলেন তার প্রমাণ খোঁজার কসরৎ-ও কেউ কেউ দেখিয়েছেন। 'শ্রীভগবান যথার্থ ই বলেছেন'—মার্কা ভূতুড়ে বাণী নিবেদন করে কেউ কেউ বোঝাতে চেয়েছেন তখনকার ভগবানেরা এন্তার কথাবার্তা বলে যেতেন আর তখনকার জ্ঞানীগুণীরা সেসব নিখুঁতভাবেই টুকে রাখতেন। টুকে রাখতেন স্মৃতির মণিকোঠায়। না রেখে উপায় থাকত না কারণ কাগজ, কলম, কালি এবং লিপি কোনোটারই আবিষ্কার তখনও পর্যন্ত হয়নি। আর তাই সব কিছুই তখন মুখস্থ করে রাখতে হত। মুখস্থ করে রাখতে হত ভাষার শব্দরূপ-ধাতুরূপও। ব্যাপারটা বেশ

মজার। নিজের নিজের ভাষার শব্দরূপ বা ধাতুরূপ কেউ মুখস্থ করে না! করার কথাটা নেহাৎ-ই আজগুবি।

কিন্তু সংস্কৃত নামক বিচিত্র ও উদ্ভট অকালপক্ক একটি ভাষার ব্যাপার-স্যাপার ছিল সবই আলাদা। শব্দরূপের কিছুটা ল্যাটিন, কিছু মরাঠী, কিছু লিথুয়ানীয়—কিছুবা পূব বাঙলা থেকে আমদানি করতে গিয়ে নানান গোলমাল বাধানো হয়েছিল। ধাতুরূপের কিছু ওড়িয়া, কিছু ছত্রিশগড়ী, কিছু মগহী ভাষা থেকে এনে হাজির করতে গিয়েও কম গণ্ডগোল হয়নি। আর সেই জন্যই নিজের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও ঘটঃ ঘটো ঘটাঃ, ঘটতি ঘটতঃ ঘটন্তি করতে করতে ঘটের মতোই দুলতে দুলতে তখনকার মহাজ্ঞানীদের ওই সংস্কৃতটা শিখে নিতে হত। আর শুধু তাঁদেরই নয়—তখনকার ভগবানদেরও পবিত্র ভাষাটা ওই কায়দায় না শিখে উপায় থাকত না। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়েছিলেন কিনা জানিনা তবে দশের চক্রান্তে তখনকার ভগবানদের যে সংস্কৃতভাষী সাজতে হয়েছিল তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়।

ভাগ্যক্রমে ভারতীয় ভগবান আর ভাগ্যবান জ্ঞানীগুণীদের ভাব প্রকাশের ভাষা বলতে ছিল ওই সংস্কৃতই। আর তাইতেই পণ্ডিত-ঠকানো কাজটা বেশ জমে উঠত। সংস্কৃত অনেক বাণী যে নেহাৎই ভগবৎ-মুখনিঃসৃত—এ সম্পর্কে কারুরই কোনও সন্দেহ থাকত না। নামেই বোঝা যায়! দেবভাষা বলে কথা!! সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভলপমেণ্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর এক জায়গায় লিখেছেন: "ভগবান আর মুনি-ঋষিরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন।" বুঝতে কষ্ট হয়না ভাষাচার্য মহাশয় ভাষাটাকে দেবভাষা বলে জানানোর আগ্রহাতিশয্যে অর্থহীন ও হাস্যরসাত্মক ওই কথাটা লিখেছিলেন। আসলে ওই দেবভাষার মহিমা কীর্তন করতে করতে ভারতের অনেকেই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

রামায়ণে বন-জঙ্গলের বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে এক মনীষি

বলে ফেলেছিলেনঃ "যে দেশের শাস্ত্র বনেজঙ্গলে লেখা হয়েছে তা ভ্রান্ত হতেই পারেনা।" আর একমনীষি মহাভারতে বদ্রিকাশ্রমের প্রসঙ্গ পড়ে আর থাকতে পারেন নি। অত্যন্ত উঁচুদরের একটি সিদ্ধান্ত তিনি বানিয়ে নিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেনঃ "যে দেশের শাস্ত্র চৌদ্দ হাজার ফুট অলটিটুড ( =উচ্চতা )-এ লেখা হয়েছে তা অভ্রান্ত না হয়ে যায়না।" মনীষি বলে কথা! মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আসলে সংস্কৃত= প্রাচীন=মহিমান্বিত=অনুকরণযোগ্য=প্রচারযোগ্য—এই সমীকরণ-টিকে জ্ঞানরাজ্যের সবচেয়ে বড় সত্য বলে যাঁরা মনে করে বসেছেন তাঁরাই এই ধরণের সব উদ্ভট কথা বলতে পেরেছেন। ঘটনা হচ্ছে এই। সে যাই হোক, রামায়ণ-মহাভারত তথা প্রাচীন (?) সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যায়নের নামে এ-ধরণের মোক্ষম সব জ্ঞানের বাণী কে কতটা দিয়েছেন তা লিখে প্রবন্ধের কলেবর বাড়ানোর ইচ্ছা নেই। এঁদের কে ঠিক বলেছেন—কে ভুল বলেছেন—সেসব বিচার করার কোনও মানে হয় না। কারণ তা পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর। তাছাড়া মনীষি বা পণ্ডিতদের নামের তালিকা পেশ করে তাঁদের এ-সম্পর্কিত কর্মকৃতিত্বে গৌরব বোধ করারও কোনও কারণ দেখছি না! কারণ তাঁদের দেওয়া তত্ত্বগুলো আলোচনার যোগ্যই নয়। গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্নও তাই ওঠেনা। ওঠেনা তার কারণ সব পণ্ডিতই জলজ্যান্ত একটা মিথ্যাকে মেনে নিয়েই এগোবার চেষ্টা করেছেন। আর এগোনো যায়না বলেই মিথ্যাটার চারদিকে ঘোরাফেরা করেছেন।

আসলে মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখার ইন্টেলেকচুয়াল খেলা ছাড়া আর কিছুই তাঁরা করে উঠতে পারেন নি। আর তাঁদের সেই খেলার কল্যাণেই মিথ্যাটা শ-খানেক বছর বেঁচে আছে। বেঁচে আছে ইতিহাসের ছদ্মবেশে। আর সে ছদ্মবেশ কেউ ধরতে পারেননি—এটাও ঘটনা।

## রামায়ণ-মহাভারত—নাম রাখার ব্যাপারে কোনও রহস্য আছে কি?

রামায়ণ নামটার সঙ্গে রাম বা শ্রীরামচন্দ্রের নামের কোনও সম্পর্ক ছিল না। সম্পর্ক ছিল না মহাভারত-নামটার সঙ্গে ভারত বা ভারতবর্ষের নামেরও। শুনতে কিছুটা আশ্চর্য লাগলেও ঘটনা হচ্ছে এই। বইয়ের নাম রাখার ব্যাপারে এ-ধরণের অসঙ্গতি ইলিয়াড-ওডিসি নামের প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা বলে প্রচার করা দুটি কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। ইলিয়াড-এর সঙ্গে ইলিয়াম স্থাননামের এবং ওডিসি-র সঙ্গে অডিসিয়ুস চরিত্রনামের সম্পর্ক থাকার কথাটাও কষ্টকল্পিত। স্বভাবতই কিছু প্রশ্ন এসে যায়। সম্পর্ক যদি নাই থাকবে তবে বই চারটির নাম রাখার আসল কারণটা কি? তবে কি বইগুলোর নাম রাখার ব্যাপারে কোনো রহস্য আছে?

উত্তরে বলতেই হয় রহস্য বলতে যা বোঝায় তা নিশ্চয়ই কিছুটা আছে। নাহলে চার-চারটি নামকরা বইয়ের (বিশ্ববিখ্যাত বলে কথা) নাম রাখতে একই ধরণের অসঙ্গতি হতে যাবে কেন? তার চেয়ে বড় কথা বিদেশী দুটি বইয়ের নামের অনুবাদ করে এদেশের দুটি বইয়ের নাম রাখারই বা দরকার পড়ল কেন? প্রশ্নটা একটু সহজ করেই রাখা যাক। কেন ইলিয়াড ও ওডিসি শব্দ দুটির তর্জমা করেই যথাক্রমে ওই রামায়ণ ও মহাভারত নাম দুটো উদ্ভাবন করে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল? প্রশ্ন আরও এসে যাচ্ছে। তবে কি সমসাময়িক একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বই চারটির নাম রাখা হয়েছিল? আর তা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়েই কি পণ্ডিতেরা ব্যাপারটা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সব কথা বলে আসছেন? আসল কারণটা কেউ জানাননি কেন? তবে কি বইগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে প্রচলিত মিথ্যা ধারণাটিকে বাঁচিয়ে রাখতেই পণ্ডিতদের তরফ

থেকে সত্যগোপনের চেষ্টা হয়েছে? বইগুলোকে প্রাচীনকালে রচিত বলে চালানোর বৌদ্ধিক কসরৎ দেখানোর ব্যাপারে পণ্ডিতেরা চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। দুনিয়ার পণ্ডিত একবাক্যে বইগুলোকে প্রাচীন বলেই মেনে নিয়েছেন। উল্টো কথা কেউই বলেন নি।

বইগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে দু-চারশ' বছর এদিক-ওদিক করার খেলা কেউ কেউ দেখালেও ওসব যে মহান যিশু খ্রীস্টের জন্মের আগে লেখা হয়েছে সে সম্পর্কে কেউই সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। সে যাই হোক, মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে পণ্ডিতদের সন্দেহজনক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাবে। আপাততঃ বইদুটির নামকরণ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য দিয়েই শুরু করা যাক।

রামায়ণ-এর নামকরণ প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করি। নায়ক চরিত্রের নাম রাম আর তাই কাব্যটির নাম রামায়ণ রাখা হয়েছে—এমন কিছু মনে করার কোনও কারণ নেই। রামের 'অয়ন' অর্থাৎ যাওয়া—এই অর্থটা চাপিয়ে রামায়ণ-শব্দের জন্মের ইতিহাস বানানোর যে খেলা পণ্ডিতেরা দেখাবার চেষ্টা করে আসছেন তা নেহাৎ-ই ভুল বোঝাবার ব্যবস্থা। রামায়ণ-এর 'অয়ন' অংশটুকু নিয়েও পণ্ডিতেরা কম জল ঘোলা করেন নি। রামায়ণ-কে 'রামস্য চরিতান্বিতং অয়নম্ শাস্ত্রম্' বলে বসেছেন কেউ কেউ—অয়ন শব্দের অর্থ শাস্ত্র কল্পনা করে নিয়েই। এইচ. এইচ. উইলসন তাঁর 'স্যান্‌স্‌ক্রিট-ইংলিশ ডিক্সনারি'তে আর এক কায়দায় নামটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন—'অয়ন'-শব্দের অর্থ 'বাসস্থান' ভেবে নিয়ে। অর্থাৎ তাঁর মতে রামায়ণ মানে 'রামের বাসস্থান'। The Makers of Civilization in Race and History'-র লেখক এল. এ. ওয়াডেল সাহেব 'অয়ন'-শব্দের অর্থ করেছেন 'দুঃসাহসিক অভিযান' বা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'। অর্থাৎ তাঁর মতে রামায়ণ মানে রামের অ্যাড্‌ভেঞ্চার। কেউ কেউ 'অয়ন' মানে কীর্তি ধরে নিয়ে রামায়ণ-এর অর্থ করেছেন 'রামের কীর্তি'।

বৈয়াকরণ-চূড়ামণি বলে প্রচার করা পাণিনীর সূত্র সন্ধানের সূত্রে কেউ কেউ আরেকটি অর্থের জোগান দিয়েছেন। বলেছেন—রামায়ণ-এর অর্থ 'রামের বংশধর' অর্থাৎ 'রামবংশ'। বিরক্তিকর বিবেচনা করে নামটির পণ্ডিতকল্পিত অন্য অর্থগুলো দিলাম না। আসলে এক এক পণ্ডিত এক এক কায়দায় রামায়ণ নামটার জন্মের ইতিহাস বানিয়েছেন। সবই ভুল বোঝানোর তাগিদে। অয়ন শব্দযোগেই যদি নামটা বানানো হয়ে থাকে তবে তিন ঘর আগে 'র' থাকার সুবাদে অয়ন-এর ন-টাই বা মূর্ধন্য 'ণ' হয়ে যায় কোন্ যুক্তিতে? যুক্তি থাকলে রসায়ন শব্দটাও যে রসায়ণ হওয়ার কথা। মূর্ধন্য পণ্ডিতেরা কি বলবেন?

নামটার ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে উল্টোপাল্টা গোলমেলে এতসব ব্যাখ্যা দেখেও তত্ত্ব তৈরি করার লোভ সামলাতে পারেননি সুকুমার সেন মহাশয়। তিনি বলেছেন, "কিন্তু শব্দটি (রামায়ণ) যে খাঁটি তাতে সন্দেহ নেই এবং শব্দটির মূলে যে রাম শব্দ আছে তাতেও সন্দেহ করা চলেনা।" খাঁটি কথাই বলেছেন তিনি। রামায়ণ শব্দটা যে খাঁটি তা বলার মধ্য দিয়ে তিনি ভেজাল শব্দের অস্তিত্বের কথাটা পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন। আর সেইটুকুই দামী কথা। কারণ সত্যি কথা বলতে কি জীবন্ত ভাষায় ভেজাল শব্দ ধোপে না টিঁকলেও তথাকথিত মৃত ভাষাগুলোতে যে ওই ভেজাল শব্দেরই রমরমা। আর সংস্কৃত ইত্যাদি আজন্ম মৃত ভাষায় ওই জাতের শব্দ থাকার তথ্যটা জানিয়ে তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। তবে 'শব্দটির মূলে যে রাম শব্দ আছে তাতে সন্দেহ করা চলেনা'—কথাটাই গোলমেলে। রাম-শব্দটা যে ওই রামায়ণ-এ আছে তা ত' দেখাই যাচ্ছে। সন্দেহ করার প্রশ্ন উঠল কি করে? প্রশ্ন ত' রাম শব্দটিকে ঘিরে আসছে না। আসছে রাম নামটাকে ঘিরে।

প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে রাম বা শ্রীরামচন্দ্রের নামের সঙ্গে ওই রামায়ণের সম্পর্ক ছিল কিনা। আসলে তা ছিল না। বাঙলা রাম-ধনু বা রামদার সঙ্গে কিংবা হিন্দী রামতরোঈ বা রামদানার সঙ্গে

কিংবা ওড়িয়া রামতালি বা রামফলের সঙ্গে অথবা গুজরাতি রামপাতর বা রামবাণের সঙ্গে কিংবা মরাঠী রামপাত্র ও রামবাণ-এর সঙ্গে রাম-নামের সম্পর্ক থাকার কথাটাই আজগুবি। সেন মহাশয়ের তৃতীয় তত্ত্বটি অনুমানভিত্তিক।

'কেন যে কালিদাস তাঁর কাব্যের নাম রঘুবংশ দিয়েছিলেন তার একটা কারণ হয়ত রামায়ণ গ্রন্থনামের অসঙ্গতি।' এত অসঙ্গতি দেখেও কেন যে তত্ত্ব তৈরির চেষ্টা কেউ কেউ করে বসেন সেইটাই আশ্চর্যের।

'মহাভারত'-নামটার ভারত অংশটুকুর মানেও ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান নয়। তা যদি হতই তবে 'মহাভারত'-এর ইংরিজি 'Great India' বলে চালানো যেত। ঐতিহ্যব্যবসায়ী ধর্মধ্বজীদের কাছে ওই অর্থটাই প্রত্যাশিত ছিল। মহান ভারতের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির মহত্ত্ব-টা বইটার নামেই প্রকাশ হয়ে পড়ত। পড়েনি এইটাই রক্ষার। রামায়ণ-নামটার ইংরিজি অনুবাদ Advent of Ram নয়। অন্ততঃ পণ্ডিতদের কেউই তা করে বসেননি। করলে ভুল করতেন।

বাল্মীকির লেখা বলে প্রচার করা বইয়ের নাম রাখার কারণ ব্যাখ্যা করে বইটাতে কিছুই লেখা হয়নি। আর তা হয়নি বলেই পণ্ডিতদের যিনি যেমন পেরেছেন তেমন মনগড়া তত্ত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস-এর লেখা বলে প্রচার করা 'মহাভারত'-এর এক জায়গায় অবশ্য বইটার নাম রাখার কারণটা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে 'ভারত'-অংশটুকুর মানে ভারি। মহত্ত্ব আর ভারবত্তা থাকার দরুণই বইটার নাম 'মহাভারত'। 'মহাত্ত্বাদ্ভারবত্তাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।' মহাভারত ১।১।২০৯ পণ্ডিতেরা তাই ওই মহাভারতের 'ইটিমলজি' বার করার কসরৎ করেননি। করলে তা খোদার ওপর খোদকারি হয়ে দাঁড়াত।

উইলসন-সাহেব তাঁর ওই ডিক্সনারিটাতে মহাভারত-নামটা রাখেননি যদিও রামায়ণ-নামটা তিনি রেখেছিলেন। মহাভারত-

নামটা তাঁর অজানা ছিলনা। ব্যাসকে তিনি 'সত্যভারত'-বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ওই ডিক্সনারিটাতে। 'মহাভারত'-এর বিচিত্র এবং উদ্ভট ব্যুৎপত্তিতত্ত্বটা তাঁর মনঃপুত হয়নি বলেই কিনা জানিনা তিনি ওই নামটা রাখেননি। খটকা অবশ্য ওই ব্যাস-এরও কিছুটা ছিল। আর তা ছিল বলেই নামটার বিকল্প একটা ব্যুৎপত্তির গল্পও তিনি বানিয়ে রেখেছিলেন। 'মহান ভরত-বংশীয়দের উপাখ্যান'—এই অর্থ চাপিয়ে। 'ভরতানাং মহজ্জন্ম তস্মাদ্ ভারতমুচ্যতে'। (১৮।৫।৮৫)। বইয়ের নামের ডজনখানেক ব্যুৎপত্তির গল্প এবং একখানা বইয়ের চার-পাঁচ রকম নাম রাখার ব্যবস্থা প্রাচীন বলে প্রচার করা অনেক বইয়ের ক্ষেত্রেই রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে বইগুলোকে প্রাচীন বলে চালানোর একটা কায়দা হিসাবেই।

আসল কথায় আসা যাক। 'ব্যাস'-মহাশয় কাব্যটির নাম রাখতে গিয়ে একটা ভুল করে বসেছিলেন। ভারি বোঝানোর জন্য সংস্কৃত ভাষায় রাখা হয়েছিল ভারবৎ শব্দটা। ভারি-অর্থে 'ভারত' শব্দটা ওই ভাষায় রাখা হয়নি। সংস্কৃত ব্যাকরণে এমন কোনও বিধান রাখা হয়নি যাতে ওই অর্থে 'ভারত'-শব্দটা বানানো যায়। সে-ভাষার নিয়ম মানতে গেলে 'ভারি'-অর্থে 'ভারবৎ' শব্দটা রাখতে হয়। অর্থাৎ সে-ক্ষেত্রে যথার্থ সংস্কৃত সাজতে গেলে বইটার নাম হওয়া উচিত ছিল 'মহাভারবান'। মহাভারত নয়। আর একটা কথা। অত সুন্দর একটি বইয়ের 'ভীষণ ভারি'—মার্কা উদ্ভট এবং উৎকট একটা নাম রাখার ইচ্ছাই ভদ্রলোকের এল কেন—এ-প্রশ্ন আসছেই।

সে-প্রশ্নের উত্তর হিসাবে একটা গল্পও বানিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় চারটি বেদ আর এক পাল্লায় 'মহাভারত' রেখে দেখা গিয়েছিল ওই মহাভারতটাই ওজনে ভারি মহাভারতের যে শ্লোকটিতে এই গল্পটা বলা হয়েছে তা এই রকম :

একতশ্চতুরো বেদা ভারতশ্চৈতদেকতঃ
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্।

চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা ।।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে

বিচিত্র সংবাদ একেই বলে! এক মিথ্যা ঢাকতে আর এক মিথ্যার অবতারণা এই ভাবেই করতে হয়। প্রশ্ন হলঃ মহাভারত ও চতুর্বেদের কোনটারই যে বস্তুসত্তা ছিলনা। ওসব যে মুখস্থ করেই বংশানুক্রমে বাঁচিয়ে রাখা হত। পণ্ডিতেরা যে এই কথাই বলে আসছেন। তাহলে? পাল্লায় উঠল কি করে? একটা মতলবের কি ওজন থাকে? মহাভারতের তবু আধুনিককালে তৈরি করে রাখা কিছু পুঁথি পাওয়া গেছে। বেদ চারটির যে তা-ও ছিলনা। তবে কি এক পাল্লায় ওই মহাভারতের পুঁথি আর এক পাল্লায় 'নেই পুঁথি' রেখে ওজন করা হয়েছিল? পুরো মহাভারতের পুঁথির যা কলেবর তা মাপতে গেলে যে একটা ওয়েব্রিজের দরকার পড়ার কথা। পাল্লায় কুলোবার কথা নয়।

সংস্কৃত মহাভারত ও বৈদিক বেদের তুলাদণ্ডে মাপার উপযোগী বস্তুসত্তা যথাক্রমে ১৮৫০ ও ১৮৭৭-র পরেই এসেছিল। বইদুটি পূর্ণতঃ প্রকাশ করার পরে। তবে কি বইগুলো ওজন করতে ব্যাস-মশাই ১৮৭৭-এও বেঁচেছিলেন? শ্লোকটি তাঁর নিজের লেখা হলে অন্য কিছু মনে করা যায় না।

আর একটা কথা। পাল্লায় ওঠার আগে ওই মহাভারতের কি অন্য কোনও নাম ছিল? তবে কি পাল্লার গল্পটাকে প্রমাণসিদ্ধ বলে জানানোর জন্যই বইটার বিকল্প (পূর্বতন?) নাম 'জয়' রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল? বইটার ওজন যে প্রথমে কম ছিল—এমন একটা গল্পও ত' বানিয়ে রাখা হয়েছে। বইটার নাম আগে শুধুই 'ভারত, ছিল কালক্রমে তার কলেবর বাড়তে বাড়তেই তা 'মহাভারত' হয়ে উঠেছিল এমন একটা উদ্ভট কথা মহাভারতে না থাকলেও কিছু পণ্ডিত বলে বসেছেন। প্রাচীন বলে প্রচার করা অনেক কেতাব-সম্পর্কেই এ ধরণের গল্প তৈরি করে রাখা হয়েছে। একই গল্প—একই বক্তব্য—একই সুর। একই কারখানায় তৈরি বলেই

এটা সম্ভব হয়েছে। ইলিয়াড ওডিসিও প্রথমে ছোট আকৃতির ছিল। পরে নানান জনে নানান অংশ লিখে বইটিকে বড় করে তুলেছিলেন। বিয়াল্লিশ লাইনের বাইবেল এর কথা ইতিহাসে আছে। প্রশ্ন আসছেই বইয়ের কলেবরের ক্রমবর্ধনের হর্ষবর্ধন এই খেলাটা কারা খেলতেন ইতিহাসে তাঁদের নাম নেই কেন? এ প্রশ্নে পরে আলোচনা করা যাবে। 'প্রক্ষিপ্ত কাণ্ড-কারখানার বিশদ্ বিবরণ' শীর্ষক অধ্যায়ে সে প্রসঙ্গ রাখা হবে।

আসলে ব্যাস-বাল্মীকিদের কেউই বইদুটোর নাম রাখার কারণ সম্পর্কে সত্যি কথাটা প্রকাশ করেননি। করার ঝুঁকিও কিছু ছিল বৈকি। তা ফাঁস হয়ে গেলে প্রাচীন বলে প্রচার করা কবিদুজন যে আসলে অর্বাচীন যুগের তা বুঝে নিতে কারুরই অসুবিধা হতনা। গুজরাতি পদবী 'ব্যাস' আর মগহী-ভোজপুরী পদবী 'বাল্মীকি'— এই দুই ছদ্মনামের আড়ালে থাকা কবি দুজন যে উনিশ শতকের লোক তা প্রকাশ হয়ে পড়ত। ব্যাপারটা কেউ বোঝেননি এইটাই আশ্চর্যের।

আসলে ইলিয়াড আর ওডিসি এই দুটি গ্রন্থনামের অনুবাদ করে নিজেদের বইদুটির নাম রাখতে গিয়েই কবি দুজন মারাত্মক ভুল করে বসেছেন। আর তাইতেই তাঁরা ধরা পড়ে গিয়েছেন। মিথ্যার মজাই এই রকম। আঁটঘাট বেঁধে মিথ্যা বানাতে গেলেও ধরা পড়তে হয়। কারণ মিথ্যার ফাঁকফোকর কিছু থেকেই যায়। আর তার মধ্য দিয়েই সত্য ঠিক আলোর মতোই ঠিকরে বেরোয়। দেখতে জানতে হয়। সবাই পারেন না।

ইলিয়াড আর ওডিসি হোমার-এর লেখা বলে প্রচার করা বই দুটিকে সবাই প্রাচীন বলেই জানেন। প্রাচীন বলেই বিশ্বাস করেন। যেমন সবাই জানেন এবং বিশ্বাস করেন রামায়ণ-মহাভারতের বয়সের বুঝিবা গাছপাথর নেই। আসলে তা নয়।

এক এক করে জট খোলা যাক। এক, হোমার নামটা গ্রিক নাম নয়। খাঁটি ইংরিজি নাম। ইংরিজি ইডিয়ামেও ঢুকে বসে

আছে নামটা। দুই, বইদুটির কল্পিত লেখক হিসাবে হোমার-নামটির গ্রিক সাজিয়ে নেওয়া রূপ Omeros বলা হয়। বলে রাখা ভালো সে-নামটি গ্রিক ভাষাভাষী অঞ্চলে ব্যক্তিনাম হিসাবে চালু নেই। চালু ছিলও না।

তিন, ইউলিসিস খাঁটি ইংরিজি ব্যক্তিনাম। নামটির গ্রিক বানিয়ে নেওয়া রূপ 'ওডিসি'। এ-নামটিও গ্রিক ভাষাভাষী অঞ্চলে ব্যক্তিনাম হিসাবে চালু নেই। ছিলও না। চার, হেক্টর নামটা খাঁটি ইংরিজি শব্দ। গ্রিক ভাষায় এই ধরণের কোনও শব্দও নেই—নামও নেই।

পাঁচ, ইলিয়াড ও ওডিসি কোনওটাই গ্রিক শব্দ নয় যদিও গ্রিক শব্দ বলেই ও-দুটোকে চালানো হয়।

ছয়, শব্দ দুটি ইংরিজি ভাষায় লোকচল শব্দ হিসাবে এখন খুব একটা চালু না থাকলেও সাহিত্যিক ইংরিজি বলতে যা বোঝায় তাতে চালু আছে। চালু ছিলও। বাচ্যার্থ কিছু না থাকলে শব্দ দুটি চালু আছে বিশিষ্টার্থে। শব্দের বিশিষ্টার্থে চালু থাকার ব্যাপারটার গুরুত্ব কম নয়। বরং বলা যায় বেশিই। কারণ চালু না থাকলে কোনও শব্দের বিশিষ্টার্থ গড়ে ওঠার সুযোগ থাকেনা। দু-একটা উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝানো যাক। ধৃতরাষ্ট্র খাঁটি মরাঠী শব্দ। শব্দটির বাচ্যার্থ কিছু নেই। বিশিষ্টার্থেই শব্দটি ওই ভাষায় চালু আছে। শব্দটির বিশিষ্টার্থ হচ্ছে: 'জন্মের পর থেকে যে অন্ধ' বা এককথায় জন্মান্ধ। অন্য কোনও অর্থ শব্দটির নেই। শব্দটিকে সংস্কৃত বলে চালানো হয়েছে। আর তা চালানোর জন্যই শব্দটির ব্যুৎপত্তির একটা গল্পও তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। ব্যুৎপত্তিতত্ত্ব ছাড়া যে কোনও শব্দ সংস্কৃতে ঠাঁই পাওয়ার অধিকারই পায়না। তাই ওই ব্যবস্থা। Hold kingdom—এই অর্থ চাপানোর মধ্য দিয়ে শব্দটিকে ব্যুৎপত্তিসমৃদ্ধ ব্যক্তিনাম হিসাবে চালানোর চেষ্টাও হয়েছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ও ওই অর্থেই শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। আসলে তা নয়। আসল সত্য হচ্ছে:

এক, শব্দ হিসাবে মরাঠী হলেও ওড়িয়া ভাষাভাষীদের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র নামটা ব্যক্তিনাম হিসাবে খুবই চালু আছে। চালু আছে নাম হিসাবেই—শব্দ হিসাবে নয়। ( তুলনীয়, মরাঠী শব্দ সংহিতা ওড়িয়া ব্যক্তিনাম হিসাবে খুবই চালু। এমন কি অশিক্ষিত মহলেও।

দুই, ওড়িয়া ভাষার প্রভাবে মেদিনীপুর জেলাতেও নামটি অল্পবিস্তর চালু আছে। চালু আছে ব্যক্তিনাম হিসাবেই।

তিন, মহাভারতের একটি জন্মান্ধ চরিত্রের নাম রাখার স্বার্থেই ওই মরাঠী শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুচক্রী মাতুল চরিত্রের নামটা মরাঠী 'শকুনী মামো' থেকেই নেওয়া হয়েছে। মরাঠী 'শূর্পনখা', 'হিড়িম্বা' সংস্কৃত সেজে রামায়ণ মহাভারতে আশ্রয় পেয়েছে।

চার, তমলুক-মেদিনিপুরের পণ্ডিতদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেয়ে শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় ঠাঁই পেয়েছে। ঠাঁই পেয়েছে ব্যক্তিনাম হিসাবে। শব্দ হিসাবে নয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো রামায়ণ-মহাভারতে ব্যবহার করা ব্যক্তিনামগুলোর বেশির ভাগই মেদিনীপুর জেলায় ব্যক্তিনাম হিসাবে ভালোই চলে। আরও বলে রাখা ভালো সেসব নাম ওই অউধ ( অযোধ্যা ) অঞ্চলে কিংবা ইন্দারপাত ( ইন্দ্রপ্রস্থ ) কিংবা হথণাপুর ( হস্তিনাপুর ) কিংবা দিল্লী ( দিলী ) মুলুকে খুব একটা চালু নেই। আর একটা কথা, নামগুলোর বেশির ভাগই কিন্তু মরাঠী বা গুজরাতিমূলক কিছু ( ওড়িয়ামূলক নামও রাখা হয়েছে যেমন—মন্থরা ) বাঙলা-মূলক নয়। ব্যাপারটা নিয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

প্রসঙ্গে ফেরা যাক, বিশিষ্টার্থে চালু থাকা আর একটি শব্দ উদাহরণ হিসাবে রাখা যাক। 'প্রজাপতি'-শব্দটা বাঙলা ভাষায় চালু আছে। বাচ্যার্থে নয়—চালু আছে বিশিষ্টার্থে। ব্যুৎপত্তি বিচার করে ব্রহ্মা-মার্কা উদ্ভট কোনও অর্থ শব্দটির ওপর আরোপ করে লাভ

নেই। রঙ-বেরঙের ডানাওলা এক জাতের পতঙ্গ অর্থেই শব্দটি বাঙলা ভাষায় চালু আছে। অন্য কোনও অর্থ তার হতেই পারেনা। পণ্ডিতেরা সমাস ভেঙ্গে যাই বোঝাবার চেষ্টা করুন না কেন তাতে কিছু যায় আসেনা। প্রজাপতি শব্দটা গুজরাতি ভাষাতেও চালু আছে। চালু আছে রাজস্থানের বাগড়ী ভাষাতেও। চালু আছে বিশিষ্টার্থেই। বাচ্যার্থে নয়। ওই দু-ভাষায় শব্দটির অর্থ 'কুমোর'। আর ওই একটি অর্থেই শব্দটি চালু আছে। অন্য কোনও অর্থ তার হয়না। তথাকথিত বৈদিক ভাষায় ওই প্রজাপতির ওপর কি বিচিত্র অর্থ আরোপ করা হয়েছে বা সংস্কৃত ভাষায় অন্য কোন অর্থ চাপানো হয়েছে তা বিচার করে লাভ নেই।

মোদ্দা কথা হচ্ছে এই: কোনও শব্দ বিশিষ্টার্থে কোনও ভাষায় চালু থাকলে শব্দটিকে সেই ভাষার শব্দ হিসাবেই ধরে নিতে হয়। ইলিয়াড ও ওডিসি কোনটাই গ্রিক শব্দ নয়। কারণ ওই ভাষায় শব্দ দুটি বাচ্যার্থ বা বিশিষ্টার্থ কোনও অর্থেই চালু নেই। ওদুটো ইংরিজি শব্দ। ইংরিজি 'ইলিয়াড'-এর বিশিষ্টার্থ হচ্ছে: a long series of woes' (C.O.D.) আর ইংরিজি ওডিসি-র বিশিষ্টার্থ হচ্ছে difficult or adventurous journey (C.O.D.) আর ওই অর্থযুক্ত শব্দদুটির তর্জমা করেই যথাক্রমে ওই রামায়ণ ও মহাভারত নাম দুটোর সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ ইলিয়াড—রামায়ণ; ওডিসি= মহাভারত। সংস্কৃত বলে চালানো হলেও রামায়ণ-মহাভারত নামদুটো খাঁটি গুজরাতি শব্দ। A long series of woes— অর্থে ওই ভাষায় এবং কেবল ওই ভাষাতেই 'রামায়ণ' লোকচল শব্দ হিসাবে চলে। Difficult or adventurous journey-র এক কথায় কোনও গুজরাতি প্রতিশব্দ না থাকলেও মোটামুটি ওই অর্থের কাছাকাছি difficult task-এর লোকচল গুজরাতি হচ্ছে মহাভারত কাম কিংবা ভগীরথ কাম।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো রামায়ণ ও মহাভারত শব্দ দুটো মূলতঃ মরাঠী হলেও অর্থবহ শব্দ হিসাবে মরাঠী ও গুজরাতি

ভাষায় চালু আছে—তবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। A long series of woes-অর্থে মরাঠী ও হিন্দীতে যথাক্রমে রামকথা ও রামকহানী লোকচল শব্দ হিসাবে চালু আছে। ঠিক ওই অর্থে আর কোনও ভাষায় চালু কোনও শব্দের সন্ধান পাইনি : মরাঠি ভাষায় 'মহাভারত' শব্দের অর্থ 'খুব ধুমধাম।' মরাঠি রামায়ণ-এর অর্থ tedious yarn বা বিরক্তিকর গল্প। আসলে মরাঠি-গুজরাতি ছাড়া আর কোনও ভাষায় নাম দুটোর কোনও ব্যঞ্জনা নেই। নেই তাৎপর্য। সোজা ভাষায় আর কোনও ভাষায় নাম দুটোর কোনও মানেই হয় না।

রামায়ণকে বাঙলায় রামের পাঁচালী বলা হত। কারণ, রামায়ণ শব্দের অর্থবহতা বাঙলায় ছিল না। এখনও নেই। এখানে একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। রামায়ণ-মহাভারত শব্দ দুটির অর্থবহতা না থাকা সত্ত্বেও ভারতের অন্য সব ভাষায় ওই দুই নামেই বইদুটি চলল কেন—এ-প্রশ্ন আসছেই। উত্তরে বলতেই হয় কর্তৃপক্ষের সেই রকমই নির্দেশ ছিল! ঐতিহ্যরোমন্থন-সর্বস্ব একটা জাতির 'চিরকালের ইতিহাস' বানানোর নেপথ্য-শিল্পীরা বই দুটির নামের তর্জমা করে নাম রাখার বিরোধী ছিলেন। বিরোধী ছিলেন ইলিয়াড ও ওডিসির অনুবাদ করা নাম রাখার ক্ষেত্রেও। আর তাই একই পরিকল্পনায় তৈরি চারটি বইয়ের নামের অনুবাদ হয়নি। অনুবাদের বিপদ ছিল বলেই ওই সতর্কতা।

রামায়ণ-মহাভারত নামদুটির জন্মরহস্যের ব্যাপারে কিছু জানতে গেলে একটু ইতিহাস ঘাঁটতে হয়। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম-এ ভারতের নানান ভাষাভাষী পণ্ডিতদের যে ডাকা হয়েছিল এ-খবর ইতিহাসেই পাচ্ছি। ডাকা হয়েছিল আঠারো শতকের সাতের ও আটের দশকে। মরাঠী পণ্ডিতদের, গুজরাতি বিদ্বানদের, ওড়িয়া বিদগ্ধ-বিদুরদের অনেকে সে-ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তমলুক মেদনিপুরের করিতকর্মা ( কৃতকর্মণঃ ) শিল্পীরা আগে থেকেই ছিলেন।

অন্যদের আমন্ত্রণ করে আনার কারণটা অবশ্য গোপন-ই রাখা হয়েছিল। রাখার কারণও ছিল বৈকি। মন্ত্রগুপ্তির জালে জড়িয়ে নিয়ে পণ্ডিতদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া হত ওই উইলিয়ামের কেল্লার উদ্যোগে। দুনিয়ার প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত কুটির শিল্পের পত্তন হয়েছিল তথাকথিত ক্লাসিক্যাল ভাষাগুলোয় ক্লাসিক্যাল কাণ্ডকারখানা বানিয়ে রাখার ক্লাসিক্যাল মতলবেই। আর তা হয়েছিল ইউরোপ ও এসিয়ার নানান দেশেই। ইউরোপে ওই পরিকল্পনায় ল্যাটিন, হিব্রু ও প্রাচীন গ্রিক ভাষায় প্রাচীন বলে প্রচার করা নানান কেতাব লেখানোর উদ্যোগ-আয়োজন নেওয়া হয়েছিল। ভারতে নেওয়া হয়েছিল সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, আরবী, ফারসী কেতাব লেখানোর ব্যবস্থা। সরকারী উদ্যোগে কলকাতা, বনারস, নদীয়া ( নবদ্বীপ ) ও মিথিলায় গড়ে উঠেছিল সংস্কৃত-মাধ্যম মিথ্যাসৃষ্টির আঁতেলি কর্মশালা। বনারস, গাজিপুরে তথাকথিত বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় নেপথ্য কর্মকাণ্ডও চলেছিল।

বাঙলা, ওড়িয়া, মরাঠী ( প্রাকৃত ), গুজরাতি ও হিন্দী প্রধানতঃ এই পাঁচটি ভাষার ( অন্য ভাষার শব্দ রাখারও ব্যবস্থা হয়েছিল ) বেশ কিছু শব্দ অবিকল একই ভাবে কিংবা কিছুটা ঘষে মেজে নিয়ে ওই সংস্কৃত-ভাষার বিশেষ ঠাটের শব্দভাণ্ডার তৈরি করে নেওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল আঠারো শতকের শেষ চতুর্থাংশে। ইংরিজি শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ কি রাখা যায় এই নিয়েও নানান কায়দায় জল্পনাকল্পনা করা হত। ভারতের নানান ভাষার কোন কোন শব্দ সংস্কৃতে ঠাঁই দেওয়া যায় এই নিয়েও ভাবনাচিন্তা কম হতনা। এই ভাবে শব্দ সংগ্রহ করতে গিয়ে ইংরিজি ইলিয়াড আর ওডিসি শব্দদুটোর সংস্কৃত প্রতিশব্দ বানানোর দরকার পড়েছিল। আর তা বানাতে গিয়েই দেখা দিয়েছিল সমস্যা। বাঙালী, ওড়িয়া ও মরাঠী পণ্ডিতেরা হিমসিম খেয়ে গেলেন। প্রতিশব্দ খাড়া করতে পারলেন না। মুশকিল আসানের ভূমিকায় নামলেন গুজরাতি পণ্ডিতেরা। তাঁরাই সরবরাহ করলেন নামদুটো। রামায়ণ

নামটার মধ্যে রাম অংশটুকু থাকাতে এবং মহাভারত নামটার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ না থাক 'ভারত' ঢুকে বসে থাকার কল্যাণে প্রাচীন ভারতের কল্পিত ঐতিহ্যের মুখরোচক কাহিনী বানানোর নেপথ্য পরামর্শদাতারা সঙ্গে সঙ্গেই নামদুটো অনুমোদন করলেন। আসলে ঠাকুরদেবতাদের মানুষ বানিয়ে তাঁদের নামে গল্প লেখার যে পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছিলেন তাতে বইদুটোর নায়ক চরিত্রদুটির নাম যে রাম এবং কৃষ্ণ রাখারই ব্যবস্থা হয়েছিল। ইলিয়াড-ওডিসি কিংবা রামায়ণ-মহাভারতের (একই পরিকল্পনার চারটে নাম) যুগের সমাজে মানুষ এবং ভগবান যে মিলেমিশেই থাকতেন। তাঁরা যে একই সমাজে ঘোরাফেরা করতেন। স্বর্গলোক থেকে নরলোকে ঠাকুরদেবতারা যে তখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতেন। গল্পটা যে সেইভাবেই বানানো হয়েছিল। দেবলোকের বাসিন্দাদের অনেকেই নরলোকের বাসিন্দাদের পিতৃদেব হয়ে বসতেন। পাণ্ডব-পরিচয়ধন্য পাঁচ ভাইয়ের কেউই পাণ্ডুর পুত্র ছিলেন না। ছিলেন দেবতাদের এঁর ওঁর।

ইতিহাস থাক। গুজরাতি ভাষা থেকে বইদুটির নামকরণ হয়েছিল বলেই কয়েকটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। এক, প্রাচীন বলে প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ বলে সমৃদ্ধ হিসাবে প্রচার করা ওই সংস্কৃত ভাষা যদি প্রাচীন কালে প্রচলিত থেকেই থাকবে তবে বই দুটোর নাম রাখতে গিয়ে নেপথ্যশিল্পীদের আধুনিক গুজরাতি ভাষার শরণাপন্ন হতে হল কেন? দুই, পণ্ডিতদের কথা মানতে গেলে যে আরও মুশকিলে পড়তে হয়। তামিল বাদে ভারতের অনাদিবাসী সব ভাষা যে যিশুখ্রীস্টের জন্মের সহস্রাব্দ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করার সময়ের ধারে কাছে জন্মেছে। পণ্ডিতেরা যে এই কথাই বলে আসছেন। তাহলে? বইদুটো যে যুগে লেখা হয়েছিল বলে প্রচার করা হয় সেযুগে যে ওই গুজরাতি ভাষার জন্মই হয়নি। আর যাঁরা বলবেন ওই সংস্কৃত ভাষা থেকেই শব্দদুটো পরবর্তীকালে মরাঠী ও গুজরাতি ভাষায় এসে গেছে তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন এই: তাই যদি

হবে তবে শব্দদুটো উত্তর ভারতের তথাকথিত আর কোনও 'আর্য'-ভাষায় চালু হয়নি কেন? কেন শুধু ওই দুই ভাষায় শব্দদুটি চালু হল?

সংস্কৃত ভাষা থেকে যদি ওইসব ভাষার শব্দ উত্তরাধিকারসূত্রে এসে থাকে তবে বেছে বেছে কেবল ওই দুই ভাষায় শব্দদুটো চালু হল কেন? তাছাড়া, সংস্কৃত ভাষাতেও নামদুটো শব্দ হিসাবে রাখা হয়নি। রাখা হয়েছে দুটি বইয়ের নাম হিসাবে। অভিধানে নাম দুটির অর্থও রাখা হয়নি। আর তাই ধরে নিতেই হয় শব্দ দুটো সংস্কৃত থেকে ভাষাদুটিতে আসেনি। ঘটনাটা উল্টোই ঘটেছে। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার বিশ্লেষণ করলে যে সহজ সিদ্ধান্ত আসার কথা এবং বিভ্রান্তিটাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে সিদ্ধান্তবাগীশ পণ্ডিতেরা যে সিদ্ধান্ত নেননি তা হল এই যে, সেসব শব্দের বেশ কিছু বাঙলা-গন্ধী—কিছু ওড়িয়া-গন্ধী—কিছুবা মরাঠী-গন্ধী—কিছু গুজরাতি-গন্ধী—কিছু আবার হিন্দী-গন্ধীও বটে। আরও আশ্চর্যের কথা হল এই যে, ইংরিজি-গন্ধী শব্দও ওই সংস্কৃত ভাষায় কম নেই। খাঁটি বাঙলা শব্দ যেমন ওই সংস্কৃতে রাখা হয়েছে তেমনি রাখা হয়েছে খাঁটি ওড়িয়া, খাঁটি মরাঠী, খাঁটি গুজরাতি, খাঁটি হিন্দী শব্দও। এমনকি খাঁটি ইংরিজি শব্দও। কোথাও পণ্ডিতি কায়দায় শব্দগুলোর অর্থ পাল্টে নিয়ে—কোথাও একই অর্থে শব্দগুলো ওই ভাষায় রাখা হয়েছে। আর সেইসব শব্দের গোঁজামিলেই তৈরি হয়েছে ওই দেবভাষার নবকলেবর।

ভাষাশাস্ত্রীরা সে-ভাষার মধ্যে প্রাচীনত্বের গন্ধ আবিষ্কার করে আনন্দ পেয়েছেন। সবটাই যে অভিনব সিন্থেটিক সেন্ট—এটাই তাঁরা ধরতে পারেননি। হাঁসজারু-মার্কা একটা সংস্কৃত শব্দের উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝানো যাক। তামিল 'তিরৈ' আর ইংরিজি 'Screen' একই অর্থের দুটি শব্দের জোড়কলমে 'দেব-ভাষা'র 'তিরস্করিণী' শব্দটি বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত 'তিরস্করিণী' শব্দের অর্থও Screen অর্থাৎ পর্দা। এটা ইঙ্গ-তামিল

জোড়কলম একটি শব্দ। প্রাচীনকালে এই ধরণের শব্দ তৈরির তথ্যটা আজগুবি নয় কি? পণ্ডিতেরা কি বলেন? পর্দার আড়ালে অর্থাৎ তিরস্করিণীর অন্তরালে থাকা বাচষ্পতি বাবুরা মরাঠি জবনী থেকে সংস্কৃত যবনিকা বানিয়ে নিয়েই একটা তত্ত্ব উপহার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যবনিকা'—বস্তুটির আইডিয়া খোদ গ্রিস দেশ থেকে এসে হাজির হয়েছিল। আর যবনদের দেশ থেকে আসার সুবাদেই নাকি ওটার নাম 'যবনিকা'। একেই বলে তত্ত্ব! 'যবন শব্দটা খাঁটি মরাঠী। শব্দটির একটিই অর্থ আর তা হচ্ছে 'মুসলমান'। 'যবন'-শব্দের সঙ্গে তথাকথিত 'Ionian' শব্দের সমীকরণের খেলাটা নেহাৎ-ই আধুনিক। গ্রিক-জাতিবাচক 'যবন' শব্দটা ভারতের কোনও ভাষায় কস্মিনকালেও চালু ছিল না। এখনও নেই। পণ্ডিতেরা তা বোঝাবার চেষ্টা যতই করুন না কেন তাতে কোনও লাভ হয়নি। হবে না।

আসলে ইংরিজি, ফরাসী, জার্মান, পর্তুগিজ, বুলগেরীয় ইত্যাদি ইউরোপীয় নানান ভাষার শব্দই ওই সংস্কৃত ভাষায় রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে ল্যাটিন, গ্রিক শব্দও। রাখা হয়েছে আরবী, ফারসী শব্দের আদলে তৈরি করে নেওয়া শব্দও। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো গোঁজামিল মার্কা শব্দের শোভাযাত্রা ওই ল্যাটিন ভাষাতেও লক্ষ্য করার মতো। সে ভাষার বেশ কিছু শব্দ ফরাসী গন্ধী—কিছু পর্তুগিজ গন্ধী—কিছু স্পেনীয় গন্ধী—বেশ কিছু ইটালীয় গন্ধী—কিছু আবার রোমানীয় গন্ধীও বটে।

মজার ব্যাপার আরও আছে। প্রায় সাড়ে চারশ'র মতো ইংরিজি শব্দও ওই ল্যাটিনে জাঁকিয়ে বসে আছে। ব্যাপারটাকে কেউই সন্দেহ করেননি এটাই আশ্চর্যের। জার্মান এবং রুশীয়মূলক শব্দও ওই ল্যাটিনে কম নেই। ব্যাকরণসর্বস্ব ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির পেছনে যেসব নেপথ্যশিল্পী ছিলেন তাঁদের কেউই প্রাচীন যুগের ছিলেন না। ছিলেন অর্বাচীন যুগের। ল্যাটিন এবং সংস্কৃত দু' ভাষায় লেখা কেতাবগুলোর প্রায় সবই উনিশ শতকে

প্রকাশিত হয়েছে কেন? কেন আঠারো শতকে সংস্কৃত একখানা কেতাবও ছাপা হয় নি। কেন আঠারো শতকে ছাপা ল্যাটিন গ্রন্থের সংখ্যা এত কম—এ প্রশ্নও কেউ তোলেন নি। তোলা উচিত ছিল। আসলে সে-প্রশ্ন তোলার বিপদ ছিল। রহস্যটা ধরা পড়ে যেত।

সে যাই হোক, প্রসঙ্গে ফেরা যাক। রামায়ণ-মহাভারতের নামকরণ সম্পর্কে তৃতীয় যে প্রশ্নটা আসছে তা এইরকম: বই দুটোর নাম রাখতে গিয়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের দুটো বইয়ের নাম চুরি করারই-বা দরকার পড়ল কেন? চার, চুরি যখন তাঁরা করেই বসলেন তখন আরও পুরনো কোনও বইয়ের নামই-বা তাঁরা চুরি করেন নি কেন? তবে কি সে রকম বইয়ের নামের হদিশ তাঁরা করে উঠতে পারেন নি? তবে কি সেরকম কোনও বই ছিলই না? এসব প্রশ্ন আসছেই। কোনওটারই উত্তর পাচ্ছি না। প্রশ্ন ওই ইলিয়াড-ওডিসি সম্পর্কেও এসে যাচ্ছে। এক, প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা বলে প্রচার করা বই দুটির নাম ও লেখকের নাম বানাতে গিয়ে ইংরিজি ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার হাতড়াবারই-বা দরকার পড়ল কেন? দুই, কিছু চরিত্রের নাম জোগাড় করতে ইংল্যাণ্ডে হানা দিতে হল কেন? তিন, যেযুগে বইদুটো লেখা হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছেন সে যুগে ওই ইংরিজি ভাষাটারও যে জন্ম হয়নি। তাহলে?

মজার কথা আরও আছে। বিদেশী দুটি বইয়ের নাম চুরি করতে গিয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামের আড়ালে নেপথ্যে থাকা ব্যাসদেব বা বাল্মীকি কিংবা তাঁদের শ্বেত দ্বৈপায়ন পরামর্শদাতারা আর এক গোলমাল করে বসেছিলেন। এমনই দুটো বইয়ের নাম আনার ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন যে দুটোর নাম সতেরো শ' একাত্তর খ্রীস্টাব্দের কিছু আগে জানা সম্ভব হলেও বইদুটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কেউই কিছু জানতেন না। আসলে ওই সতেরো শ' একাত্তর খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তথাকথিত প্রাচীন গ্রিক ভাষায় ইলিয়াড ও ওডিসি নামের দুটো

'এপিক' লেখার বা লেখানোর মতলবটারই জন্ম হয়েছিল। লেখা হয়ে ওঠেনি। আর তা যে হয়ে ওঠেনি তারই একটা প্রমাণ দেওয়া যাক। 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় সতেরো শ' একাত্তর খ্রীস্টাব্দে। দুইখণ্ডের সেই বইটিতে ইলিয়াড ও ওডিসির প্রত্যেকটি সম্পর্কে আধ লাইনের বক্তব্য রাখা হয়েছিল। 'ট্রয়ের যুদ্ধ' মার্কা দুতিনটি শব্দ দিয়েই বইদুটির পরিচিতিপর্ব শেষ করা হয়েছিল। ব্যাপারটা বেশ মজার। কিছু প্রশ্ন এসেই যায়। এক, অতি প্রাচীন বলে প্রচার করা দুটি নামকরা (বিশ্ববিখ্যাত বলে কথা) এপিক-এর পরিচয় দিতে গিয়ে গল্পদুটির সারাংশ দেওয়া হয়নি কেন? দুই, বইদুটো যদি লেখা হয়েই থাকবে তবে তা জানানোর কি কোনও অসুবিধা দেখা দিয়েছিল? তিন, তবে কি বইদুটো তখনও পর্যন্ত বানানো হয়েই ওঠেনি? চার, তবে কি ডিমিট্রিয়াস্-সম্পাদিত ১৪৮৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ইলিয়াড-ওডিসি কিংবা অল্ডাইন্স-সম্পাদিত ইলিয়াড এবং ওডিসির যথাক্রমে ১৫০৪ ও ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়ার খবরগুলো বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য বানিয়ে রাখা হয়েছে? তাইত আসছে—পনেরো বা ষোলো শতকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে প্রচার করা কেতাবগুলো কেউই দেখেননি। অনেক মিথ্যা কথা যেমন কবিপ্রসিদ্ধি বলে চালানো হয়—ওসব গল্পও ঐতিহাসিকপ্রসিদ্ধি। অন্য কিছু নয়।

# রামায়ণ ও মহাভারতের কোনওটাই মহাকাব্য নয়

রামায়ণ ও মহাভারতকে লোকে মহাকাব্য বলেই জানে। পণ্ডিতদের মধ্যেও অনেকে বইদুটোকে মহাকাব্য বলেই মানেন। ইতিহাসের পণ্ডিতেরা বইদুটোকে একটি যুগের দর্পণ ভেবে নিয়ে কল্পিত সেই যুগটির নাম দিয়েছেন 'মহাকাব্যের যুগ'। পণ্ডিতেরা যাই ভাবুন আর যাই মানুন আসলে বইদুটো অভিধানিক অর্থে মহাকাব্য নয়।

'মহাকাব্য'-শব্দটার একটু ইতিহাস আছে। আঠারো শ' উনিশ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এইচ. এইচ. উইলসনের 'স্যান্স্ক্রিট-ইংলিশ ডিক্সনারি'-তে 'মহাকাব্য' বলতে বোঝানো হয়েছে মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয় ও নৈষধচরিত—এই ছ'টা কাব্যগ্রন্থকেই—রামায়ণ-মহাভারতকে নয়। 'মহাকাব্যের ভাষা'-র বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে পণ্ডিতেরা রামায়ণ-মহাভারত নয়—শুধু ওই ছটি কাব্যগ্রন্থে ব্যবহার করা ভাষার প্রসঙ্গেই আলোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে ওই ছ'টির সঙ্গে ভট্টিকাব্য, রাঘবপাণ্ডবীয় ও গীতগোবিন্দ—এই তিনটি ধরে নিয়ে মোট ন'টা কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করেছেন। রামায়ণ-মহাভারতের কথা তাঁর মনে আসেনি। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে মহাকাব্যের সংখ্যা পাঁচ বা সাত বলেও জানিয়েছেন। আসলে ব্যাপারটা কি?

আসলে 'মহাকাব্য'-শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থবহ কোনও মৌলিক শব্দ নয়। ওটা অভিধানিক শব্দ। এবং অভিধানে শব্দটির নির্দিষ্ট কোনও অর্থ না রেখে সুনির্দিষ্ট ছ'-টা কাব্যগ্রন্থকেই মহাকাব্য বলে জানানো হয়েছিল। অন্য কোনও কাব্যগ্রন্থকে মহাকাব্য বলার সুযোগও রাখা হয়নি। আর তাই অভিধানকারদের রসিকতায় আট থেকে

বাইশ সর্গের ছোট ছোট কাব্যগুলো মহাকাব্য বনে গেল। আকৃতিতে এবং মহত্ত্বে বড় রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য হয়নি। প্রশ্ন কিন্তু এসেই যাচ্ছে। মাত্র ছ-খানা কাব্যগ্রন্থকে 'মহাকাব্য' বলার দরকার পড়ল কেন? মহাকাব্য-পদবাচ্য গ্রন্থ আর কেউ লিখতে পারবেন না এমন একটা অবাস্তব কথাই-বা অভিধানকার ভেবে বসলেন কি করে? ষড়্দর্শনের নামে দর্শনের সংখ্যাকে ছ-য়ে বেঁধে রাখার যেমন কোনও মানে হয়না—দর্শনের অর্থ জানলে যে তা কারুরই করার কথা নয় তেমনি মহাকাব্যের সংখ্যাকেও পাঁচ, সাত, নয় বা এগারোতে আটকে রাখাটাও অর্থহীন। এই সোজা কথাটা অভিধানকার ভাবেননি কেন? এ-সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ওই ডিক্সনারিটার প্রসঙ্গেই আবার আসতে হয়। আঠারো শ' উনিশ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগে থেকে সংস্কৃত ভাষার অভিধান লেখার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। শুরু হয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দাক্ষিণ্যনির্ভর বেশ কিছু দেশীবিদেশী পণ্ডিতদের সহযোগিতায়। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও তখন নতুন নতুন সংস্কৃত শব্দ বানিয়ে নেওয়ার খেলাও চলছিল। খেলাটা যে চলছিল তার প্রমাণ হিসাবে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, উইলসনের ওই অভিধানের ভূমিকায় খেলাটার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। নানান জায়গার পণ্ডিতদের কাছ থেকে ইংরিজি শব্দের প্রতিশব্দ জানতে চেয়ে রাজ্যের কাঁচা সংস্কৃত শব্দ জোগাড় করে চলেছেন ওই উইলসন সাহেব। (খেলাটার বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাবে।) কাঁচা বলার কারণটা বলে নিই। অভিধানের কলেবর বাড়ানোর স্বার্থে উইলসন সাহেব এমন অনেক শব্দই জোগাড় করেছেন যা পরবর্তীকালের অভিধানে ঠাঁই পায়নি। কারণ পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার পরিকল্পিত গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে ওই জাতের শব্দগুলোকে মানানসই নয় বলেই মনে করেছিলেন। সে যাই হোক, ভারতের নানান ভাষা থেকে এই কায়দায় শব্দ সংগ্রহ করে অভিধানটিতে রাখার ব্যবস্থার

সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধরনের খেলাও শুরু হয়েছিল। ভাষার দিক দিয়ে ইংরেজেরা যে আমাদের জ্ঞাতি—এই তত্ত্বটা বোঝানোর দায়িত্বও সংস্কৃত-অভিধানকারদের ওপরে চাপানো হয়েছিল। আর তা হয়েছিল বলেই সংস্কৃত ভাষায় ইংরিজি ঠাটের শব্দের ছড়াছড়ি। ইংরিজি শব্দের আদলে কিংবা বলা যায় উচ্চারণ নকল করে বেশ কিছু সংস্কৃত শব্দ বানিয়ে নেওয়ার খেলাও শুরু হয়েছিল। শুরু হয়েছিল তত্ত্বটির তথ্যগত প্রমাণ রাখার তাগিদেই। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

Abode→আবর্ত ; ale→অলি ; to approach→আ-ব্রজ ধাতু / অভিপ্রযস্তি ; appropriated→অভিপরীত ; ascending→ আস্কন্দনং।

to bathe→বাদ্ ধাতু ; boat→বারুট / বহিত্থ ; broken→ অবরুগ্ন / বৃক্ণ ; breadth→ব্রততী।

clipped→ক্লিপ্ত ; to clot→ক্লথ্ ধাতু ; clotting↓ক্লথন ; coal→কোকিল ; to convey→সংবহ ধাতু ; to cut→কুট্ ধাতু ; cutting→কুট্টন।

descending→অবস্কন্দনং ; dread→দরদ ; dripping→দ্রবণ ; dropping→দ্রবণ ; dust→তুস্ত।

earth→অর্থ ( অভিধানে না থাকলেও 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থনামের মধ্যে earth→বাচক 'অর্থ' শব্দ রাখা হয়েছে। ). to eat→অদ্ ধাতু ; eating→অদন।

flashing→ভ্রাজস ; fire→পারু ; to flow→প্রু ধাতু ; flood →প্লুতি ; foolish→বালিশ ; floated→প্লুত।

to go→গা ধাতু ( মহাভারতে-এর প্রয়োগ হয়েছে )। to grab→গ্রভ্ ধাতু ; grabbed→গৃভীত ; to bc greedy→গৃধ ধাতু ; greedy→গর্ধন / গর্ধিন ; grazed→ঘৃষ্ট।

ho→হো ; hope→অপি ; humming→ঊর্মি ; hunter→ অন্ধ্র।

immortal→অমর্ত ; to injure→জুর ধাতু ; Ionian→যবন

juice→জূষ / যুষ / যুষণ / জুষ্কক।

keel→কীল

to lessen / to become less→লিশ্ ধাতু ; to loll→লল্ ধাতু। lustre→লস্ত্র / লোস্ত্র।

to be mad→মেদ / মেড ধাতু ; magic→মায়িক। moist / moistened→মিষ্ট।

nose→নসা ; no→নু ; nipple→পিপ্পল।

oar→অরিত্র ; observing ( like a spy )→অপসর্পণ।

opposite→অপষ্ঠু/অপষ্ঠুর ; oxen→উক্ষণ ; overpowering →অভিপূরণ , overpowered→অভিপ্লুত ; overflowed→অভি-পরিপ্লুত ; owl→আলু।

panther→পুণ্ডরীক ; pimple→পিপ্লু ; to pound→পুণ্ড্ ধাতু ; purified→পরিপূত।

rape→রভস ; right→ঋত ; to rush→ঋষ্ ধাতু ; rust→ লোষ্ট ; ( তামিল তিরৈ=Screem )+( Eng screen→পর্দা )। তিরস্করিণী ( জোড়কলম শব্দ )। এটা ইঙ্গ-তামিল শব্দ।

scale of fish→শকল ; to sew→ষিব্ ধাতু / স্যু ধাতু ; shovel→শর্বলা ; skull—শকল ; son→সুনু ; to steam→ ষ্টীম্ / স্তিম্ / স্তেম ধাতু ; steamed→স্তিমিত ; to stop→ষ্টুভ / স্তভি ধাতু ; steer→স্থূরিন্ ; stopped→স্তব্ধ ; to strew→স্তৃ ধাতু ; stupid→স্তব্ধ ; to sweeten→স্বদ / স্বাদ ধাতু ; sun→ সুনু / স্যূন / স্যোন।

term→ তুর্মন্ ; thirst→তর্ষিত ; torrent→তরন্ত ; to toss→ তস্ ধাতু ; trot→ধোরিতম্ ; try→ত্রদি ধাতু।

udder→উধর ; utterance→উদ্দীরণ ; of 'us'+আমাগো ( পুব বাঙলার উপভাষার শব্দ )→অস্মাকম্ ( জোড়কলম শব্দ )।

vulva→উল্ব।

waist→উপস্থ ; wall→অবহালিক ; water→ব্রাদর ; wedding→ব্রেদন ; wet→উত্ত ; wetted→ব্রুত্ত।

'yellow' arsenic→আল ; yoke→যোগ / যুগ ; of 'you' all+তোমাগো ( পুব বাঙলার উপভাষার শব্দ )→যুষ্মাকম্ ( জোড়কলম শব্দ )।

ইংরিজি শব্দের ক্যারিকেচার মার্কা এই ধরণের যেসব শব্দ তৈরি করা হল তা নেহাৎই অভিধানের কলেবর বাড়ানোর স্বার্থেই ব্যবহার করা হল। এসব শব্দ কিন্তু ভারতের কোনও ভাষায় চালু হয়নি। সংস্কৃত ভাষার উত্তরাধিকারী ( ভাষাতাত্ত্বিকদের পরিভাষায় নাতিপুতি ) বলে প্রচার করা ভারতের তথাকথিত আর্য ভাষাগুলোতে ওই ইংরিজি ঠাটের শব্দগুলো কেন এসে হাজির হয়নি— এ প্রশ্নে পণ্ডিতদের কেউ-ই কোনও কথা বলেননি। বলার বিপদ ছিল। রহস্যটা ধরা পড়ে যেত। সে যাই হোক, এই ধরনের ভূতুড়ে 'শব্দ'-গুলো শুধু যে অভিধানে ঠাঁই পেল তাই নয়। ঠাঁই পেল 'শব্দ'-গুলোর জন্মের বানানো 'ইতিহাস'-গুলোও। 'শব্দ'-গুলোর কুলজি ( শব্দটা আরবী। এ থেকে সংস্কৃত 'কুলপঞ্জী' শব্দটা বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল ) বানানো হল। কল্পিত ধাতু প্রত্যয়গত ব্যুৎপত্তিতত্ত্ব বানিয়ে না রাখলে 'শব্দ'-গুলোকে আদি এবং অকৃত্রিম সংস্কৃত শব্দ বলে যে কেউ মানবেনই না। শব্দের খাঁটিত্বের সার্টিফিকেটের কাজ করে ওই তত্ত্ব। আর তাই ওই ব্যবস্থা। বিলিতি শব্দের হাড়মাস আলাদা করার খেলায় ভারতের বাচস্পতি পণ্ডিতেরা হিমসিম খেয়ে গেলেন। আর তা বোঝা যায় বিজাতীয় শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তির নামে মাথামুণ্ডু নেই এমন সব গল্প বানানোর বহর দেখে। বিলিতি শব্দের জন্ম বিলিতি কায়দায় না হয়ে

কেন যে অভারতীয় বিচিত্র এক কায়দায় হল—এ প্রশ্নটাও কেউ তোলেন নি।

ভারতীয় কায়দাও ওটাকে বলা যায় না। কারণ ভারতের কোনও ভাষার শব্দই ওইভাবে তৈরি হয়নি। বিচিত্র বলার কারণ তথাকথিত সংস্কৃত প্রত্যয়গুলোর আকৃতি-প্রকৃতি দেখলে সন্দেহ না করে থাকা যায় না। ওগুলোর কত অংশ খোদ ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি করা—আর ক'ভাগ চিন-মুলুক থেকে এনে হাজির করা হয়েছে তা বুঝতেও খুব একটা গবেষণা করার দরকার পড়ে না। ইঙ্গচৈনিক প্রত্যয়গুলো বাচষ্পতিদের ভালোই কাজে লেগেছে। সে যাই হোক। শব্দের ব্যুৎপত্তির নামে বানানো একটি গল্প দিয়েই প্রসঙ্গটা শেষ করা যাক।

Pimple শব্দটা খাঁটি ইংরিজি—জডুল শব্দটা খাঁটি বাঙলা। বাচষ্পতিবাবু জডুল থেকে জটুল / জডুল-নামক 'বাঙলা-সংস্কৃত' বানিয়ে নিলেন। Pimple-থেকে 'ইংরিজি-সংস্কৃত' 'পিপ্লু' তৈরি করে নিয়েই তার ব্যুৎপত্তির তত্ত্ব বানানো হলঃ অপি—√প্লু+উ (ডু) ক। মজার কথা হল তথাপি, কুত্রাপি ইত্যাদি শব্দের 'অপি'-অংপটুকু ভারতের কোনও কোনও ভাষায় চালু থাকলেও উপসর্গ পরিচয় দেওয়া 'অপি'-শব্দের চল ভারতের কোনও ভাষাতেই নেই। 'অপি' উপসর্গযোগে যে ক'টি শব্দ পণ্ডিতেরা বানিয়ে নিয়েছেন তার সবই কৃত্রিম পরিভাষা। একটিও লোকচল শব্দ হিসাবে চালু হয়নি। সংস্কৃত কুড়িটি উপসর্গের মধ্যে 'অপি' একটি হলেও ওটা ভারতীয় উপসর্গ নয়। তথাকথিত পিপ্লু শব্দের decomposition-এর ফলে অন্য কোনও শব্দও তৈরি হয়নি। প্রত্যয় বলে পরিচয় দেওয়া 'ডু' যে ইংরিজি তা বলার দরকারই পড়ে না।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে তথাকথিত বৈদিক সাহিত্য রচনার নেপথ্য কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল উত্তর প্রদেশের বনারস আর গাজীপুরে। জায়গাদুটোকে সংস্কৃত সাজানো ছদ্মবেশে বারাণসী ও গর্জতিপুর বলে চালানো হল। যশোর জেলার কালিয়া ও

ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া থেকে বাছাই করা বেশ কিছু সংস্কৃত পণ্ডিতকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওই বনারস আর গাজীপুরে। নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওঁদের দিয়ে বেদ লেখানোর কাজটা করিয়ে নিতে। এঁদের সঙ্গে বেশ কিছু মরাঠী, গুজরাতী, ভোজপুরী ও মৈথিলী সাকরেদও ছিলেন। সাকরেদ ছিলেন বাঙলাভাষী নানান জেলা থেকে পাঠানো কিছু পণ্ডিতও। এঁদের যৌথ প্রয়াসে গোপনীয়তার পরিমণ্ডল রচনা করেই বৈদিক বুজরুকি লেখা শুরু হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক একটা কথা বলে রাখার দরকার আছে। কালিয়া-কোটালিপাড়া থেকে যেসব পণ্ডিতকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁদের কেউই যশোর বা ফরিদপুর জেলার আদি বাসিন্দা ছিলেন না। এঁদের সকলেরই আদি বাসস্থান ছিল মেদনিপুর (সংস্কৃত ছদ্মবেশে মেদিনীপুর) জেলার তমলুকে। সংস্কৃত নামক 'দেবভাষা'-সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নেপথ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনায় করিতকর্মার (—কৃতকর্মণঃ) পরিচয় দিয়ে তমলুক-মেদনিপুরের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৌজন্যে যশোর-ফরিদপুরসহ নানান জেলায় প্রচুর জমির মালিক হয়ে বসেছিলেন। কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব ব্রিটিশ জাতির ছিলনা।

তথাকথিত বৈদিক ভাষায় বেদ লেখানোর যে পরিকল্পনা কোম্পানীর কর্মকর্তারা নিয়েছিলেন তার জন্যও আর এক প্রস্থ 'বৈদিক সংস্কৃত' শব্দ তৈরি করে নেওয়ার দরকার পড়েছিল। বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহার করার উপযোগী শব্দগুলোর বেশিরভাগই ভারতের নানান ভাষার শব্দ থেকেই বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কোথাও বিচিত্র অর্থ আরোপ করে—কোথাও বা একই অর্থে শব্দগুলোর প্রয়োগ ঘটেছিল। খাঁটি ইংরিজি শব্দের আদলেও বেশ কিছু বৈদিক শব্দ তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক:—

to absorb→ √অভিস্বর / √অবস্বর ; advocacy→অধিবাক ; to advocate→অধি-বচ ধাতু, advocate→অধিবক্তৃ ; 'alley' of Tritsu→অলিনঃ ; ambergris=অম্বর ; arm→ঈর্ম ; 'ash' dust →'অসঃ' পাংশম ; ( অসঃ পাংশম্ শব্দটা ইঙ্গ-ওড়িয়া। নেপথ্যে থাকা বাঙালী পণ্ডিত 'ছাইপাঁশ' এর বৈদিক প্রতিশব্দ বানাতে গিয়েই ওই ভূভুড়ে শব্দ বানিয়েছিলেন ; to ascend→অভিস্কন্দ্ ধাতু ; at home—অস্তম্।

beam→বম।

court (=রাজসভা)=গর্ত ; to crash→ক্রক্ষ্-ধাতু ; crow —কারর।

director→তরুতারম্ ; drop→দ্রপ্স / দ্রপ্সী ; dwelling→ দুরোণ।

eater→অত্র / অত্তর ; eaten→অদানম্ ; ewe→অবি।

flame→ভ্রমা , floating→প্লুতি ; food=পিতু ; to form→ প্রমে।

to grip→গৃভ্ ধাতু ; gripped→গৃভীত।

home→অমা ; ruddy 'horse'→অরুষ ; hymn→আম্নায়।

intestine→অন্তস্ত্য।

juice→যূষণ।

to mix→মিক্ষ্-ধাতু।

nard→নলদ, nave→নভ্য।

offer→আভর ; Oxus→বক্ষু।

priest→পরীষ্ট ; praised→পরিস্তুত : presure/pressing →প্রেষ।

quite→কুরিৎ।

rite→ঋত ; roaring→রোরবণ ; roars→রোরবীতি ; roads →রোদসী ; in the 'right' way→ঋতয়া।

Seat→সদম্ / সদস্ ; to sit→সীদ্ ধাতু ; somehow→সমহ ;

son→সূনু ; 'sour' gruel→সৌবীর ; 'strong' horse→স্থৌরিণ ; summer→সমা ; 'swift' runner→সপ্তি।

thrice→ত্রিস্ ; through→তিরস্ ; twice→দ্বিস্।

upper most→উপমা ; of 'us' all+পূব বাঙলার উপভাষার আমাগো→অস্মাক। ইঙ্গবঙ্গীয় শব্দের উদাহরণ এই 'অস্মাক' শব্দটা।

Vigorous→বিগ্র।

war→ভর ; to wax→বক্ষ্ ধাতু ; to wash→বশ্ ধাতু, to win→বন ধাতু ; wish→উশী ; wit→বেদ।

yoke→যুগ ; yoked→যুক্ত ; of 'you' all+পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার তোমাগো→যুষ্মাক। এটি ইঙ্গবঙ্গীয় শব্দের আরেকটি উদাহরণ।

শব্দ সৃষ্টির এই বৈদিক ম্যাজিক দেখেও যে দিকপাল পণ্ডিতেরা কিছুই বোঝেননি—এইটাই আশ্চর্যের।

ইংরিজি শব্দের নকল করে 'বৈদিক' শব্দ বানিয়ে রাখার কারণটা বলে রাখা ভালো। শুধু যে প্রাচীনকালের সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইংরিজি ভাষার আত্মীয়তা ছিল এইটুকু জানিয়েই মিথ্যার কারবারীরা সন্তুষ্ট হননি। সুদূর বৈদিক যুগেও যে ইংরিজি ভাষার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ভাষার প্রচলন এদেশে ছিল—এটা বোঝানোর দরকারও তাঁরা বোধ করেছিলেন। আর তা করেছিলেন বলেই তথাকথিত বৈদিক সংস্কৃতে খাঁটি ইংরিজি শব্দের ছড়াছড়ি।

ইংরিজি ঠাটের যেসব বৈদিক সংস্কৃত শব্দ বানানো হল সেসব শব্দের বেশির ভাগ ওই বৈদিক ভাষার উত্তরাধিকারী বলে প্রচার করা সংস্কৃত ভাষায় ঠাঁই পায়নি। পণ্ডিতেরা বৈদিক শব্দের ক্রম-পরিবর্তনের যেসব গল্পকথা বানিয়েছেন তার মধ্যে ওই 'ইংরিজি সংস্কৃত'-নামক সোনার পাথরবাটির তথ্যটি রাখেন নি। রাখার বিপদ ছিল। পাণ্ডিত্য ফলানোর ওই সব শিল্পী যে পণ্ডশ্রম করেছেন তা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

প্রাসঙ্গিক একটা কথা বলে রাখা যাক। খাঁটি ইংরিজি শব্দের

সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের এ-হেন মিল দেখেও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা কোনও কথা বলেননি কেন? আর্য-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যাঁরা নানান শব্দের কষ্টকল্পিত সাদৃশ্যের কথা নিরলসভাবে বলে গেছেন তাঁরা সহজবোধ্য এইসব মিলের কথা চেপে গেলেন কি করে? তবে কি কর্তৃপক্ষের সেই রকমই নির্দেশ ছিল? তবে কি পণ্ডিতেরা নেপথ্যে থাকা কারুর আজ্ঞাবহ হিসাবেই কাজ করে গেছেন। তাইত আসছে।

সে যাই হোক, বৈদিক-অবৈদিক ত্ু'ভাষায় এই কায়দায় শব্দ তৈরি করতে গিয়ে ইংরিজি make up শব্দবন্ধের একটা জুৎসই সংস্কৃত প্রতিশব্দ বানানোর দরকার পড়েছিল। দরকার পড়েছিল মেঘদূত, কুমারসম্ভব ইত্যাদি make up-গুলোর পরিচয় বোঝানোর তাগিদে। উপনিবেশের মানুষকে অতীতের রোমন্থন-প্রিয় করে তুলতে ঐতিহ্যানুরাগ নামক ছোঁয়াচে রোগের এপিডেমিক ছড়ানোর কাজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আঁতেলি পরামর্শদাতারা নানান খেলাই খেলেছিলেন। যা ছিলনা তা ছিল বলে চালাতে—যা হয়নি তা হয়েছিল বলে জানাতে নেপথ্য পণ্ডিতদের দিয়ে বেশ কিছু make up বানিয়ে রাখার ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন। make up মানে concocted stories or poems in order to befool. আর ওই make up-এর উচ্চারণ চুরি করে চট্‌জলদি মহাকাব্য শব্দটি বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। রামায়ণ-মহাভারতও 'মেক আপ' ছাড়া কিছু নয় তবে ওই ধরনের বিপুলাকার 'মেক আপ' গুলোর লেখা কবে শেষ হবে তার ঠিক ছিল না। এই অবস্থায় আগে ভাগে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় ছোট সাইজের কিছু কাব্য বানিয়ে রাখার মতলবটারই জন্ম হয়েছিল।

রামায়ণ-মহাভারত বইদুটো ছিল দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার epic যে দুটো বই শেষ করতে উনিশ শতকের প্রায় বারো আনি অংশ পার করে দিতে হয়েছিল। যেমন পার করে দিতে হয়েছিল— ইলিয়াড ও ওডিসি নামের প্রাচীন বলে প্রচার করা দুটি epic

শেষ করতে। আসলে সমসাময়িক একটি মতলবেরই চারটি নাম। বলা বাহুল্য মতলবটির নেপথ্য জন্মদাতা ইংল্যাণ্ডেরই কেউ হবেন। epic শব্দটি দিয়ে বই চারটিকে বোঝানো হয়েছে। মহাকাব্য হিসাবে নয়। কোনও কোনও পণ্ডিত ওই epic শব্দের অনুবাদ করে নাম রেখেছেন 'মহাকাব্য'। আর 'মহাকাব্য'-শব্দের অর্থ-সম্পর্কে গোলমালের সূত্রপাত তখন থেকেই।

## মূল গ্রন্থ প্রকাশের আগেই অনুবাদ লেখার ম্যাজিক

ইলিয়াড সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে। না, গ্রিক ভাষায় নয়—প্রাচীন গ্রিক ভাষাতেও নয়। লেখা হয়েছিল খাঁটি ইংরিজি ভাষায়। কায়দা করতে গিয়ে ইংরিজি কেতাবটার যে নাম রাখা হয়েছিল তার মানেটা দাঁড়িয়েছিল 'অমুক ইংরেজ সাহেবের দুঃখের প্যানপেনে গল্পের ঝুড়ি।' 'অরিজিনাল' বলে প্রচার করা প্রাচীন গ্রিক এপিকদুটো লেখা হয়েছে তার অনেক পরে।

প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা ইলিয়াড-এর প্রথম দিককার সংস্করণগুলো ১৮৭৩, ১৮৭৬, ১৮৭৮, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই ভাষায় লেখা ওডিসির প্রথম দিককার সংস্করণগুলোর প্রকাশ-কাল ১৮৭১, ১৮৭৫, ১৮৭৭ ও ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ। বই দুটোর ancient edition নাকি অনেকবার প্রকাশিত হয়েছিল। একটির সম্পাদনা করেছিলেন স্বয়ং অ্যারিস্টট্ল্। 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট' যেখানেই যেতেন সেখানেই নিয়ে যেতেন অ্যারিস্টট্ল্-সম্পাদিত মহাকাব্য দুটি। স্বয়ং আলেকজাণ্ডার যখন বইদুটির প্রাচীন সংস্করণ প্রকাশ করার কথা স্বীকার করেছেন এবং আলেকজাণ্ডারের বিশ্বজয়ের বৃত্তান্ত যখন তাঁর জন্মের অনেক পূর্বে প্রকাশিত বাইবেলে লেখা হয়েছে তখন যে ওই সব মহাপণ্ডিত, মহাদিগ্বিজয়ীদের ঐতিহাসি-

কত্বটাই সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। সন্দেহজনক হয়ে ওঠে বাইবেলের প্রাচীন প্রচলনের গল্পটাও। মিথ্যার প্রমাণ রাখতে গিয়ে মিথ্যার জট কম বানানো হয়নি।

ব্যাপারটা বেশ মজার। অনুবাদগুলো আগেই প্রকাশিত হয়েছে—পরে কিংবা অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছে 'অরিজিনাল' বই—এমন ঘটনা প্রাচীন বলে প্রচারিত অনেক কেতাবের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। ঘটেছে রামায়ণ-মহাভারত প্রকাশের ক্ষেত্রে—ঘটেছে চতুর্বেদ পেকাশের ক্ষেত্রেও। ঘটেছে পাণিনীর 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রকাশের ক্ষেত্রেও। ঘটেছে ছুনিয়ার তাবৎ প্রাচীন বলে প্রচার করা পবিত্র সব বইয়ের ক্ষেত্রেই।

রামায়ণ-মহাভারত প্রকাশ করার ব্যাপারেও এই ধরণের কাণ্ড ঘটেছিল। কিত্তিবাস-এর লেখা বাংলা রামায়ণ ( তখনও ওঝা হননি ) এবং কাশিদাস-এর লেখা বাংলা মহাভারত ( ছন্দের খাতিরে 'কাশিরাম দাস' লিখতে গিয়ে ভদ্রলোকের নামটাই পাল্‌টে যায় ) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে। তখনও 'অরিজিনাল' বলে প্রচারিত সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত লেখা শুরু হলেও শেষ হয়নি। শুরু যে হয়েছিল তার প্রমাণ হিসাবে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ওই বাংলা রামায়ণের প্রথমেই কয়েক পংক্তি সংস্কৃত শ্লোক রাখা হয়েছিল। রাখা হয়েছিল উদ্দেশ্যমূলকভাবেই। লোকে বুঝে নিক আদি বইটি আগেই লেখা হয়েছে। আসলে সংস্কৃত কেতাব ছুটোর লেখার ব্যাপারটা নেপথ্য কর্মকাণ্ড হিসাবে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গেই সারা হচ্ছিল। শেষ হয়েছিল অনেক পরে। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত মহাভারতের ভীষ্ম-পর্বের শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌গীতা অংশটুকুই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম থেকে শুরু না করে খাপছাড়াভাবে ওই অংশটুকুর প্রকাশ কেন প্রথমে ঘটেছিল তা-ও বোধগম্য নয়।

সে যাই হোক, ওই 'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ কি কায়দায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কিংবা কোন শুভ মুহূর্ত থেকে স্বয়ং ভগবান হয়ে

বসেছিলেন তা আমার বিচার্য নয়। তবে বইটি লিখতে গিয়ে ব্যাস-এর ছদ্মনামের আড়ালে থাকা আধুনিক যুগের এক বাঙালী কিংবা ওড়িয়া ভদ্রলোক যে তাঁর বাঙালীয়ানা কিংবা ওড়িয়ানা এবং আধুনিকত্ব জাহির করে বসেছেন সেইটাই বিচার্য। সঞ্জয়ের জবানীতে 'অপর্যাপ্ত সৈন্য সমাবেশ'-এর খবর দিতে গিয়েই বইটির প্রথম দিকে (প্রথম পরিচ্ছেদ) ভদ্রলোক গোলমাল করে ফেলেছেন। বাঙলা ভাষায় পর্যাপ্ত শব্দটা ততটা চালু না হলেও 'অপর্যাপ্ত' শব্দের চল আছে। এমন কি তার দুমড়ে মুচড়ে নেওয়া রূপ 'উপুজ্জাপ্তি', 'উবুজ্জাপ্তি'-ও চব্বিশ-পরগণার গ্রামাঞ্চলে শোনা যায়। 'প্রয়োজনের চেয়ে বেশি' বা more than sufficient-অর্থেই শব্দটা বাঙলায় চালু আছে। সংস্কৃতেও ওই অপর্যাপ্ত শব্দটা রাখা হয়েছিল তবে তার ওপর অর্থ চাপানো হয়েছিল 'যা পর্যাপ্ত নয়' বা 'not sufficient' বা 'less than sufficient'। বাঙলা ও ওড়িয়া ভাষায় চালু অপর্যাপ্ত শব্দের অ-অংশটুকু নিরর্থক। সংস্কৃত অপর্যাপ্ত শব্দের 'অ'-অংশটুকু না-অর্থক। সঞ্জয়কে দিয়ে বলতে চাওয়া হয়েছে এক কথা—বলানো হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো কথা! নেপথ্যশিল্পী বাঙলা ও ওড়িয়া অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, আর তাইতেই ঘটেছে গোলমাল। বাঙলা ও ওড়িয়া ছাড়া যেসব ভাষায় অপর্যাপ্ত শব্দটির চল আছে—সাহিত্যিক বা লৌকিক যে রূপেই থাক না কেন—সে সব ভাষায় সংস্কৃত অর্থেই শব্দটি চালু আছে। উল্টো অর্থে চলে একমাত্র বাঙলা ও ওড়িয়া ভাষায়।

সংস্কৃত মহাভারত ১৮৩৬ থেকে প্রকাশ করা শুরু হয়। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা বইটার শেষ খণ্ডটা প্রকাশ করা হয় ১৮৫০-এ। সংস্কৃত রামায়ণ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হয়েছিল ১৮৪৯-এ। ক্রমশঃ অন্য খণ্ডগুলোর প্রকাশ হতে হতে শেষ খণ্ডটির প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৭৫-এ। এককথায় সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত পূর্ণ কলেবরে প্রকাশিত হয়েছিল—যথাক্রমে ১৮৫০ ও ৮৭৫-এ। তার আগে নয়।

তার আগে কেন হয়নি—এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটাই কেউ তোলেন নি। তোলেন নি কোনও পণ্ডিতই। যদিও তোলা উচিত ছিল কারণ প্রশ্নটির সঠিক উত্তর বইদুটি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এত দেরি হওয়ার রহস্যটির স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করত। বাঙলা রামায়ণ-মহাভারত সেই কবে ১৮০৩-এ প্রকাশিত হয়েছিল। কেন তার ছেচল্লিশ বছর পরে ওই সংস্কৃত মহাভারত আর বাহাত্তর বছর পরে ওই সংস্কৃত রামায়ণ প্রকাশিত হল—এ প্রশ্নও কেউ তোলেননি। কেন আসল বই দুটো বেরুনোর আগেই নানান ভাষায় বই দুটোর ভাবানুবাদ বেরিয়ে গেল—সম্ভবই-বা হল কি করে—এসব প্রশ্নও কেউ তোলেননি। কেউ সন্দেহও করেন নি। প্রাচীনকালেই যদি বইদুটো সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়ে থাকে তবে বই দুটোর যথার্থ অনুবাদ একখানাও ওই প্রাচীনকালে করা হয়নি কেন? কেন নানান ভাষায় বই দুটোর ভাবানুবাদ করার হিড়িক শুরু হল? তবে কি যথার্থ অনুবাদ করার জন্য যা একান্তই দরকার ছিল সেই 'অরিজিনাল' সংস্কৃত কেতাব দুটোর অস্তিত্বই ছিল না? আর তা ছিলনা বলেই কি ভাবানুবাদ বানিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল? এ-প্রশ্ন উঠছে তার কারণ সাহিত্যগত গুণমানের দিক দিয়ে বিচার করলে উঁচু দরের বই দুটোর হুবহু অনুবাদই যে করার কথা। তা হয়নি কেন? অন্য ভাষায় বই দুটোর যেসব হুবহু অনুবাদ পাচ্ছি তা সবই ওই সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত প্রকাশের পরে কেন প্রকাশ করা হয়েছিল—এ প্রশ্নও কেউ তোলেন নি।

আসলে মূল সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত প্রকাশ করতে যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছিল ঘটনা হচ্ছে এই। দেরি হওয়ার কারণও ছিল অনেক।

এক, সিলেবল মেপে মেপে ছন্দোবদ্ধ ওই সাতকাণ্ড আর আঠারো পর্বের কাণ্ডকারখানা সারতে পণ্ডিতেরা সময় একটু বেশিই নিয়েছিলেন। নিতে হয়েছিল।

দুই, জীবন্ত ভাষায় কাব্য লেখা এক ব্যাপার আর কৃত্রিম

কোনও ভাষায় তা বানানো আর এক কাণ্ড। তমলুক-মেদনিপুরের বা কালিয়া কিংবা কোটালিপাড়ার কাশীচন্দ্র বাচস্পতি বাবুদের কাছে ওই সংস্কৃত ভাষাটা ঠিক জলভাত হয়ে ওঠেনি। সময় একটু বেশি লাগবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া পণ্ডিতদের সকলেই যে সমান ওস্তাদ ছিলেন তা-ও বলা যায় না।

তিন, বই দুটোকে ধর্মগ্রন্থ বলে চালানো হলেও কিংবা বলা যায় চালানোর সঙ্গে সঙ্গেই ও-দুটোকে ইতিহাসের দুটি আকরগ্রন্থ বলে চালানোর একটা ইচ্ছাও নেপথ্য শিল্পীদের ছিল। আর তা ছিল বলেই কল্পিত উদ্ভট সব তথ্যও বই দুটোতে রাখার দরকার পড়ত। আর সেসব তথ্য আকাশ থেকে পড়ত না। বানিয়ে নিতে হত। উত্তরকালের পণ্ডিতেরা যাতে বইদুটো থেকে সেইসব তথ্য দেখার সূত্রে বিচিত্র এবং উদ্ভট সব তত্ত্ব তৈরি করে নিতে পারেন তার ব্যবস্থাও রাখতে হত। আর তা রাখতে গিয়েও ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চার, প্রাচীন বলে চালানোর জন্য রামায়ণের তিন প্রস্থ আর মহাভারতে দু-প্রস্থ পুঁথি বানিয়ে রাখার ব্যবস্থাও রাখতে হয়েছিল। কোনোটা উত্তর ভারতীয়—কোনোটা দক্ষিণ ভারতীয়—কোনোটা পশ্চিম ভারতীয় 'রিসেন্‌সন বা পুনর্সংশোধিত পাঠ বলে চালানোর তাগিদ ছিল। পুঁথির সংখ্যাবৃদ্ধিতে প্রাচীন কেতাবের প্রামাণ্যতা পোক্ত হত। তাছাড়া পুঁথির টুকরো-টাকরা অংশ এখানে সেখানে সযত্নে রাখার ব্যবস্থাও করতে হত।

পরবর্তীকালের রায়বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায়েরা সেসব পরিকল্পিতভাবে উদ্ধার করে কৃতিত্বের দাবীদার হয়ে বসতেন। সে যাই হোক, এত সব পুঁথির নকল তৃতীয় শ্রেণীর কিছু পণ্ডিতদের দিয়েই করানো হত। নকলনবিশ এই জাতের পণ্ডিতদের পারিশ্রমিক কিছু কমই ছিল। আর তাই তাঁরাও সময় একটু বেশি নিয়ে পুষিয়ে নিতেন। পুঁথির নকলগুলোর মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে

বেশ কিছু পাঠভেদের ব্যবস্থাও রাখতে হত। পাঠভেদের ব্যবস্থাটা আধুনিক কেতাবকে প্রাচীন বলে চালানোর কাজে সাহায্য করত। পুঁথিগুলোতে পাঠভেদ থাকত বলেই ত' সেগুলোর collation-এর প্রশ্ন উঠত। না থাকলে যে ওই collation-নামক সন্দেহজনক কাজকর্মের প্রয়োজনই হত না। ওই মহান কাজেই যে তাঁদের নিয়োগ করা হত। অন্ততঃ প্রচারটা সেই রকমই থাকত।

এখানে একটি প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত যে প্রাচীনকাল থেকে সারা ভারতে (এমন কি বহির্ভারতেও কিছু জায়গায়) ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল—এই কথাই পণ্ডিতেরা জানিয়ে আসছেন। তাই যদি হবে তবে বই দুটির পুঁথি মাত্র দু-তিনটি পাওয়া গেল কেন? পণ্ডিতদের ধারণাটা সত্যি হলে যে অনেক বেশি পুঁথি পাওয়ার কথা। যে দু-তিনটি পাওয়া গেছে বলে প্রচার করা হয়েছে তা-ও দেখছি সবই ইউরোপে পাচার করা হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা কি? রামায়ণ মহাভারতের পূর্ণ-কলেবর পুঁথি কি সত্যিই কেউ দেখেছেন? নাকি সেও এক মায়া? গৃহস্থ বাড়িতে যে ওই পুঁথি থাকার প্রশ্ন ওঠে না তা ওই পুঁথির আনুমানিক আয়তন কল্পনা করে নিলেই বোঝা যায়। রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতেও দু-একটা পুঁথি মেলেনি কেন? তবে কি টুকরো-টাকরা ছাড়া পুরো পুঁথি কোথাও ছিলই না? তবে কি নানান পুঁথি থেকে সূক্ষ্ম বিচার সেরে বই দুটির সম্পাদনা করার কথাটা নেহাৎই একটা ভাঁওতা? তাইত মনে হচ্ছে। আর তা যদি সত্যিই ভাঁওতা হয় তাহলে আগের দুটি পরিচ্ছেদের বক্তব্যটাকেও কিছুটা পরিবর্তন করে নিতে হয়। সে যাই হোক, এত সব লুকো-ছাপা কারবার সারতে গিয়ে কাব্য দুটির রচনা শেষ করতে পণ্ডিতদের একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল।

পাঁচ, সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লেখার ক্ষমতা হাজার হাজার লোকের ছিল না। তাছাড়া অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার ভয়ও ছিল। একই কাব্য এঁকে দিয়ে ওঁকে দিয়ে লেখানোর বিপদ যে

ছিল না তা নয়। সকলের লেখার স্টাইল এক রকমের হয় না। সে যাইহোক, মুষ্টিমেয় কিছু পণ্ডিতদের দিয়েই তথাকথিত প্রাচীন সংস্কৃতির—বিশেষ করে ধর্মীয়, দার্শনিক এবং গুরুপাক ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যে ভরপুর নানান কাব্য লেখানো হত। প্রাচীন বলে প্রচার করা নানান সব ধর্মের মহিমা কীর্তন করাটা ওই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কে যে ওই বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদটা পড়বেন—আর কেউ-বা ওই কোরানের সংস্কৃত তর্জমা পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছেন—তা জানার কিছুমাত্র ইচ্ছা ওঁদের ছিলনা। পরম কারুণিক ব্রিটিশ সরকার ওই দুই ধর্মগ্রন্থের ব্যয়সাপেক্ষ অনুবাদের দায়িত্বটাও ভাড়াটে পণ্ডিতদের ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন। পণ্ডিতেরা কিঞ্চিৎ মুদ্রার বিনিময়ে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই সেই অনুবাদ কর্মটি করেছিলেন। আর সেসব অনুবাদ সংস্কৃত রামায়ণ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হওয়ার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

কোরান বা বাইবেল-এর তর্জমা করার ব্যাপারে একটা সুবিধা ছিল। সেসব অনুবাদের দু-চার প্রস্থ পুঁথি বানিয়ে রাখার দরকার পড়েনি। প্রাচীন সাজতে হয়নি। আর একটা কথা। কোরান ও বাইবেল-এর সংস্কৃত কাব্যানুবাদ যাঁরা করেছিলেন তাঁরা স্বনামেই তা করেছিলেন। প্রাচীনকালের তথাকথিত কোনো মুনি বা ঋষির ছদ্মনাম ব্যবহার করার দরকার পড়েনি। ভূতের নামে খাটার চেয়ে নিজের নামে লেখার আনন্দ কিছু বেশিই ছিল। কোরান বা বাইবেল-এর অনুবাদকেরা সানন্দেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং সে-অনুবাদের ভাষার মান উঁচুই ছিল। সে যাই হোক, আসল কথা হল কম পণ্ডিতকে দিয়ে বেশি লেখানোর জন্যও ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সংস্কৃত কাব্যদুটির সৃষ্টির পেছনে নেপথ্যে থাকা সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে যে দক্ষিণা পেতেন—যে জমিজমা আদায় করে নিতেন—তা বই

দুটির লেখক হিসাবে পেতেন না। পেতেন বই দুটির নানান পুঁথি থেকে তুলনামূলক সূক্ষ্ম বিচার সেরে সম্পাদনা করার অভিনয়ের সুবাদে। অর্থাৎ সোজা ভাষায় তাঁরা নানান পুঁথি collate করতেন। অন্ততঃ প্রচারটা সেই রকমই রাখা হত। এই 'কোলেশন'-এর কাজটা বেশ মজার। এক বাঙালী সংস্কৃত পণ্ডিত 'অমুকস্য আত্মজঃ' জয়পুরের মহারাজার রাজকীয় আতিথ্য গ্রহণ করে প্রাচীন বলে প্রচারিত 'ভরতের নাট্যশাস্ত্র'-নামক গ্রন্থের নানান পুঁথি থেকে 'কোলেশন'-নামক মহান কর্মটি করেছিলেন। আমরা পেয়েছিলাম একটি মূল্যবান (!) গ্রন্থ। কানাড়ী-ভাষী সংস্কৃত পণ্ডিত সামা শাস্ত্রী কোলেশন-ব্যাপদেশে মহীশূরের রাজার অতিথি হয়ে তথাকথিত 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' সম্পাদনা করে মহামহোপাধ্যায় হয়ে বসেছিলেন। আমরা পেয়েছিলাম অমূল্য (!) একটি কেতাব যার ছত্রে ছত্রে বিভ্রান্তিকর মিথ্যার উচ্ছ্বাস—যা আধুনিক পণ্ডিতেরা তন্ময়ভাবে বিশ্লেষণের কাজে মেতে উঠেছেন। ক্লান্তি নেই।

তথাকথিত 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' বইয়ের নামেই গোলমাল। 'অর্থশাস্ত্রে'র 'অর্থ'-অংশের মানে টাকা-পয়সাও নয়—মানে ( =meaning )-ও নয়। এমনকি অভিধানে শব্দটির যেসব অর্থ দেওয়া হয়েছে তার কোনওটাই নয়। ওই 'অর্থ'-শব্দের মানে 'পৃথিবী' বুঝতে কষ্ট হয়না খাঁটি ও আধুনিক ইংরিজি 'earth'-এর উচ্চারণ চুরি করেই ওই 'অর্থ'-শব্দটি বানানো হয়েছিল। বানানো হয়েছিল আধুনিক কালেই। 'অর্থশাস্ত্র' মানে economics নয়—ওর মানে 'পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান'। এবং শব্দটির যে ওই একটাই অর্থ তা ওই বইয়েই বলা হয়েছে। আধুনিক একটি ইংরিজি শব্দের অনুকরণে প্রাচীনকালের ওই কৌটিল্যঃ ( পুং ) ওই শব্দ বানানোর সুন্দর ম্যাজিকটা কি করে দেখালেন—দেখানো সম্ভব হল-ই-বা কি কি করে—এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে পণ্ডিতেরা কোনও কথাই বলেননি। এমন কি বইটির নাম হিসাবে প্রচার করা 'শব্দ'-টিকে 'প্রক্ষিপ্ত' বলে উড়িয়ে দিতেও ভরসা পাননি। তাঁরা ব্যাপারটি চেপে গেছেন।

চেপে গেছেন—হয় নেপথ্যে থাকা তাঁদের নিয়োগকর্তাদের পরামর্শে আর না হয় কিছুই তারা বুঝতে পারেননি। অভিধানে 'অর্থ' শব্দের আর একটি বিচিত্র অর্থ চাপানো হয়েছে। সে অর্থ হচ্ছে price বা মূল্য। মনিয়ের উইলিয়াম্‌স্‌-এর Sanskrit English Dictionary-তে এই অর্থটিও রাখা হয়েছে। বুঝতে কষ্ট হয় না খাঁটি ও আধুনিক ইংরিজির 'worth'-শব্দের আদলেই ওই অর্থবহ 'অর্থ'-শব্দটির উদ্ভাবনা ঘটেছিল। ঘটেছিল আধুনিক যুগেই। আধুনিক যুগেই কারণ worth-শব্দটা প্রাচীনকালে চালু ছিলনা। থাকলেও সে-শব্দের প্রভাবে বা সে-শব্দের অনুকরণে সংস্কৃত শব্দ সৃষ্টির কথাটকে বিশ্বাস করা যায় না। আজগুবি কথা পণ্ডিতেরা বললেও আজগুবিই থেকে যায়।

## বই দুটিকে আদ্যিকালের লেখা বলে চালাতে পণ্ডিতদের উৎকট আগ্রহ

রামায়ণ-মহাভারতকে আদ্যিকালের লেখা বলে চালানোর একটা উৎকট ইচ্ছাই পণ্ডিতদের লেখার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। 'উৎকট' বলতে হয় কারণ তাঁরা যেসব ধোঁয়াটে যুক্তি আর ভিত্তিহীন তথ্য বানিয়ে বইদুটির প্রাচীনত্বের প্রমাণ হিসাবে খাড়া করেছেন তা দেখে ওই কথাই বলতে হয়। তাঁরা বলেছেন: বইদুটি প্রথমে 'রচিত' হযেছিল কারণ যখন ওসব রচনা করা হয় তখন কোনও লিপিরই জন্ম হয়নি। লিখে রাখার প্রশ্নই তাই ওঠেনি। আর তা ওঠেনি বলেই তখনকার মানুষ 'রচিত'-কাণ্ডকারখানাটাকে (পুঁথি, বই বা গ্রন্থ কিছুই বলা যাচ্ছেনা) মুখস্থ করেই বাঁচিয়ে রাখতেন। আর তা বাঁচিয়ে রাখার বিদ্যাটা বংশধরদেরও শিখিয়ে রাখতেন। দরকারী কথা লিখে রেখে এবং সে লেখা নষ্ট হওয়ার আগেই তার নকল বানিয়ে রেখে বংশানুক্রমে বাঁচিয়ে রাখার বুদ্ধি তাঁদের ছিলনা। কাগজ, কলম, কালি এবং লিপি আবিষ্কারের আগে তা থাকার কথাও নয়। আর তাই সব কিছু তাঁরা মুখস্থ করেই বাঁচিয়ে রাখতেন। অন্তত: পণ্ডিতদের এই রকমই ধারণা। পরে যখন পুঁথিতে লেখার উপযোগী লিপির আবিষ্কার হল—পুঁথি বানানোর উপকরণগুলোর উদ্ভাবনা ও সংগ্রহ করে রাখার সুযোগ ঘটল—তখনই স্মৃতিশক্তির ওপর অহেতুক অত্যাচার না করে বানিয়ে রাখা 'রচনা'-গুলোকে পুঁথিপত্রে লিখে রাখার ব্যবস্থা হল। বেদ-উপনিষদ জাতীয় তথাকথিত 'শ্রুতি' গুলো লিখে রাখার ব্যবস্থা যে লিপি আবিষ্কারের পরেও হয়নি—একথা সব পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন। ওগুলোর পুঁথি পাওয়া যায়নি।

পণ্ডিতদের দেওয়া এইসব তথ্য যে ভিত্তিহীন এবং যুক্তি-পরম্পরাটা যে অসার তা একটু আলোচনা করলেই বোঝা যায়।

এক, রামায়ণ-মহাভারতের মতো ছন্দোবদ্ধ ও বিশাল আকৃতির কাব্য রচনা কোনও ভাষায় লিপি প্রবর্তনের আগে হতেই পারেনা। হওয়াটা আজগুবি। ভারতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা তিনশ' পঁচিশটি। এ-সব ভাষার মধ্যে লিপির প্রবর্তন হয়েছে এবং অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে— এমন ভাষার সংখ্যা মাত্র একান্নটি। অর্থাৎ সংখ্যার দিক দিয়ে ভারতে প্রচলিত বেশিরভাগ ভাষায়—যদিও এ-সব ভাষাভাষীর সংখ্যা খুবই কম—উর্ধে কয়েক লাখ—এখনও লিপির প্রবর্তন হয়নি। লিপির চল নেই এমন সব ভাষা স্বচ্ছন্দেই বেঁচে আছে। বেঁচে আছে মুখে মুখে। আসলে মুখে মুখে চালু থাকতে কিংবা বংশ-পরম্পরায় বেঁচে থাকতে কোনও ভাষারই অসুবিধা হয়না। ভাষার মরা-বাঁচাটা লিপি থাকা-না থাকার ওপর নির্ভর করেনা। নির্ভর করে সেই ভাষাভাষী শেষ মানুষটির বেঁচে থাকার ওপর। সে যাই হোক, প্রাসঙ্গিক কথাটাই বলা যাক। লিপির চল নেই এমনসব ভাষার কোনওটাতেই না হয়েছে কোনও কাব্য রচনা—না হয়েছে সাহিত্যসৃষ্টি। বিরাট আকৃতির তথাকথিত মহাকাব্য ত' দূরের কথা। বংশানুক্রমে চলে আসা কিছু গল্প এসব ভাষায় বেঁচে থাকতে পারে ঠিকই তবে তাও সুনির্দিষ্ট আকারে বাঁচতে পারেনা। পুরুষানুক্রমে মুখস্থ করে বাঁচিয়ে রাখা সুনির্দিষ্ট ফর্ম-বিশিষ্ট কাব্যমহাকাব্যের সন্ধান এ-সব ভাষার ক্ষেত্রে কেউই দেননি। আসলে লিপির মাধ্যম ছাড়া বংশানুক্রমে ভাষা বাঁচতে পারলেও—সাহিত্য বাঁচতে পারে না পারাটা বিশ্বাস-যোগ্য নয়। দিকপাল সব পণ্ডিত কিন্তু এই কথাটাই বলে আসছেন। তাঁরা যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন—এ কথা মেনে নেওয়া যায়না। বুঝতে কষ্ট হয়না এ-ধরনের কথা যাঁরা বলে আসছেন তাঁরা এস্‌টাব্লিশ্‌মেণ্টের বক্তব্যটাই তুলে ধরেছেন। বক্তব্যের ঐকতান পাণ্ডিত্যের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও ভিসাপ্রাপ্তির সুযোগ এনে দেয়। যাঁরা সুর মেলাতে—বা তাল ঠুকতে পারেন না তাঁরা পাণ্ডিত্যের আসরে সুবিধা করে উঠতে

পারেন না। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় তাঁরা হেরে যান। ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের মুখরোচক গল্প লিখে যাঁরা দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছেন তাঁরাই পেয়েছেন এস্টাব্লিশ্‌মেন্টের আনুকূল্য—অকৃপণ বদান্যতা। নানান রাষ্ট্রের মনোনীত পণ্ডিতদের উদ্যোগে গঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখার সুযোগ এঁরাই পান।

দুই, বইদুটি যখন রচনা করা হয় তখন যে কোনও লিপির প্রচলন হয়নি—এ-কথা বেশির ভাগ পণ্ডিতই স্বীকার করে নিয়েছেন। যাঁরা তা করেননি তাঁরাও বেশি দূর এগোতে পারেননি। বইদুটি প্রাচীন কালে লিখিত আকারে প্রচলিত ছিল বলে জানালেও কোন লিপিতে ও-দুটি লেখা হয়েছিল তার হদিশ তাঁরা দিতে পারেননি। প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতদের প্রয়াসটা যে উদ্দেশ্যমূলক ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয়না। প্রাগৈতিহাসিক যুগেই যে বইদুটি রচিত হয়েছিল এমন একটি বক্তব্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রাচীন কালে সংস্কৃত ভাষায় লিপির প্রবর্তন হয়নি—এই ডবল মিথ্যা কথাটা বলার দরকার বোধ করেছিলেন এস্টাব্লিশ্‌মেন্টের নেপথ্য পরামর্শদাতারা। ডবল মিথ্যা কারণ এক, প্রাচীন কালে সংস্কৃত ভাষারই প্রচলন ছিলনা। দুই, অস্তিত্বহীন ভাষায় লিপি প্রবর্তনের প্রশ্নও ছিল অবান্তর। লিপিহীন যুগে কিছু 'রচিত' হওয়ার গল্পটা বানিয়ে রাখার কারণ ছিল। ইতিহাসের শুরু লেখাজোখার মধ্য দিয়ে। লেখাজোখা নেই ত' ইতিহাসও নেই। লিপিহীন যুগে কিছু 'রচিত' হয়ে থাকলে তা যে ঐতিহাসিক যুগেরও আগেকার রচনা বা ব্যাপার লোকে এইটাই মেনে নেবে—নেপথ্যে থাকা পণ্ডিতদের এই বিশ্বাস ছিল বলেই গল্পটা বানানো হয়েছিল। বইদুটির রচনাকালকে সুদূর প্রাচীন যুগে পাঠানোর এও এক কায়দা!

তিন, বইদুটি যখন রচনা করা হয় তখন লিপির প্রবর্তন হয়নি—এ-কথা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই তাহলেও ত আর এক প্রশ্ন

এসে যাচ্ছে। বইদুটির রচনাকাল বলে পণ্ডিতেরা প্রাকৃখিশু আনুমানিক যে কালপর্বের কথা জানিয়েছেন তার কয়েক শ' বছর পরে যে লিপির প্রবর্তন হয়েছিল—একথা পণ্ডিতেরাই জানিয়েছেন। আর শুধু হয়েছিল বললে ভুল হবে। লিপির বন্যা বয়ে গিয়েছিল ভারত নামক ভুখণ্ডে। একটি নয়—দুটি নয় ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ইত্যাদি সাকুল্যে মাত্র (!) চৌষট্টি রকমের লিপি ভারতে চালু হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। এতগুলো লিপি চালু হওয়া সত্ত্বেও রামায়ণ-মহাভারত কিংবা পালি-প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল বলে প্রচার করা সাহিত্যের অফুরন্ত নিদর্শন লিখে রাখার ব্যবস্থা হয়নি কেন? লিপির অভাবটাই যদি প্রাচীন 'বাঙ্‌ময়'গুলোকে বাঙ্‌ময় অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার—সোজা ভাষায় মুখস্থ করে মুখে মুখে বাঁচিয়ে রাখার ম্যাজিক দেখানোর কারণ হয় তাহলে ওই ষোলগণ্ডা লিপির কোনোটার সাহায্য নেওয়া হয়নি কেন? তবে কি সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত সব ধ্বনি প্রকাশ করার উপযোগী অক্ষর ওইসব লিপির কোনোটারই ছিল না? অক্ষরের ঘাটতিটাই কি ওইসব লিপি ব্যবহার না করার কারণ? পণ্ডিতেরা যে তথ্য দিয়েছেন তা থেকে জানা যাচ্ছে ওই ব্রাহ্মী লিপিতে ছেচল্লিশটি ধ্বনি প্রকাশ করার উপযোগী অক্ষর ছিল। সংস্কৃত ও বৈদিক সংস্কৃত ভাষা ঠিকমতো প্রকাশ করতে ঊর্ধে তেষট্টিটি অক্ষরের প্রয়োজন হত। পণ্ডিতদের দেওয়া তথ্যকে মেনে নিলেও কিছু প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে।

এক, ব্রাহ্মী লিপিতে সংস্কৃত ভাষার সব ধ্বনি প্রকাশ করার ক্ষমতা যদি নাই থাকবে তবে বেশ কিছু শিলালিপিতে ওই ব্রাহ্মী অক্ষরে সংস্কৃত বাণী খোদাই করে রাখা সম্ভব হল কি করে?

দুই, পালি কিংবা প্রাকৃত ভাষার সব ধ্বনি প্রকাশ করার উপযোগী অক্ষর ওই ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠীতে থাকা সত্ত্বেও ওই দুই ভাষায় ওই দুই লিপি ব্যবহার করে একটিও পুঁথি লেখা হয়নি কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিতেরা দেননি। উল্টে এক অদ্ভুত কথা তাঁরা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন: ওই চৌষট্টি রকমের

লিপির সবই স্রেফ পাথরে খোদাই করে রাখার কাজেই ব্যবহার করা হত। পুঁথিতে লেখার কাজে কোনোটারই ব্যবহার হতনা। কেউ ভুলেও তা করতেন না। ওসব লিপি ব্যবহার করার 'পেটেন্ট' বুঝিবা ছেনি-হাতুড়ি ব্যবহারকারীরা নিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের কুক্ষিগত ছিল বিদ্যাটা। আজগুবি কথা আর কাকে বলে! প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে: এক. 'পেটেন্ট' নেওয়ার বুদ্ধি কি প্রাচীনকালের মানুষের ছিল? দুই. ছেনি-হাতুড়িই-বা তাঁরা পেলেন কি করে। লোহার আবিষ্কার কি সে-যুগে হয়েছিল? আর তা হয়েছিল বললেই কি তা মেনে নেওয়া যায়? তিন, তবে কি শুধু পাথরে খোদাই করার উপযোগী বলে প্রচার করা ওই চৌষট্টি রকমের লিপির প্রাচীনকালে প্রচলিত থাকার কথাটা একটা বানানো গল্প? তবে কি পণ্ডিতদের ঠকানোর জন্যই গল্পটা বানানো হয়েছিল? তাইত আসছে। মিথ্যার মজাই এই রকম। কখনও ছত্রিশ গণ্ডা—কখনো-বা ষোল গণ্ডা মিথ্যা বানাতে হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পোষ্য পণ্ডিতেরা চৌষট্টি কিসিমের লিপির চৌষট্টি কায়দার নাম বানাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে এমন সব কাণ্ড করেছেন—এমন সব ভূতুড়ে নাম লিপিগুলোর ওপর চাপিয়েছেন—যা দেখে বলতেই হয় পুরো ব্যাপারটাই পণ্ডিতদের ফাজলামি। লিপিগুলোর কিম্ভূতকিমাকার নাম জানিয়েই তাঁরা আমাদের কৃতার্থ করেছেন—ওগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি কি রকম ছিল—সোজা ভাষায় ওগুলো দেখতে কেমন ছিল—তা জানানোর দরকার তাঁরা বোধ করেন নি। করেননি কারণ, কল্পিত লিপিগুলোর ইয়াকি-মার্কা ভূতুড়ে নাম বিস্তরমিথ্যাসমৃদ্ধ 'ললিতবিস্তর'-এ রাখাটা যতটা সহজ ছিল—অত রকমের লিপি উদ্ভাবন করে নেওয়াটা ঠিক ততটা সহজ ছিল না।

চৌষট্টি রকমের লিপি ভারতে কস্মিনকালেও চালু ছিল না; সংস্কৃত একটি শ্লোকে তথ্যটি জানানো হয়েছে অতএব তা প্রামাণ্য এমন কিছু মনে করার কোনও কারণ নেই। দিকপাল সব পণ্ডিত

তথ্যটি সম্পর্কে যাই বলুন না কেন—যত বড় পণ্ডিতই তাঁরা হোন না কেন—তথ্যটিকে গুরুত্ব দেওয়ার কোন মানেই হয় না। অসংখ্য আজগুবি সংস্কৃত শ্লোক আজগুবি তথ্যের আড়ৎ সেজে বসে আছে। পালিপ্রাকৃত অপভ্রংশ ভাষায় লেখা গাথাগুলোও কিছু কম যায় না। জলজ্যান্ত মিথ্যায় বোঝাই ওইসব শ্লোক / গাথা পড়ে পুণ্যশ্লোক পণ্ডিতেরা অনেক তত্ত্বই বানিয়ে নিয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে এই। আসলে জ্ঞানের রাজ্যে নানান রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ওই ধরনের শ্লোক বা গাথা লেখানো হত। লেখানো হত পণ্ডিতম্মন্য ( শব্দটা মরাঠী 'পণ্ডিতমানী' শব্দের সংস্কৃত সাজানো রূপ ) কিছু ব্যক্তিকে বোকা বানানোর জন্যই।

চৌষট্টি লিপির একটিও বাঁচেনি। যা কোনও দিন জন্মায় নি তার বাঁচার প্রশ্ন ওঠেই বা কি করে? রাষ্ট্রপোষ্য পণ্ডিতদের কপোলকল্পিত কোনও ভাষাই বাঁচেনি—বাঁচেনি তাঁদের বানানো কোনও লিপিই। বাঁচেনি ল্যাটিন—বাঁচেনি প্রাচীন গ্রিক—বাঁচেনি হিব্রু-সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ—বাঁচেনি তথাকথিত ফিনিশীয় লিপি—মোহেনজোদাড়ো লিপি—অ্যারেমীয় লিপি—ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী কোনও লিপিই। বেঁচেছিল—বেঁচে আছে—বেঁচে থাকবে মানুষের ভাষা—মানুষের উদ্ভাবিত লিপি। পণ্ডিতদের বানানো ভাষা-গুলোয় দু-নম্বরী কারবার—লিপিগুলোতেও তাই। প্রচলিত ভাষা-গুলোর পিতৃপিতামহ পরিচয়ে যেসব ভাষা প্রাচীন সেজে অভিনয় করে যাচ্ছে তারা কেউই ওই প্রাচীনকালে ছিলনা। ওসব ভাষার সবই আধুনিক পণ্ডিতদের তৈরি করে নেওয়া। প্রচলিত লিপিগুলোর প্রপিতামহ সেজে যেসব লিপি পাথরে আশ্রয় নিয়ে মূর্তিমান ইতিহাস সেজে মিউজিয়ামগুলোতে ঠাঁই পেয়েছে সে সবই আধুনিক উদ্ভাবন। সোজা ভাষায় জালিয়াতি।

চৌষট্টি সংখ্যাটির মহিমা কম নয়। হিন্দুদের পবিত্রতম গ্রন্থ বলে প্রচার করা ঋগ্বেদের আর এক নাম 'চতুঃষষ্টি'। বইয়ের নাম বা বিকল্পনাম রাখার কি সুন্দর ব্যবস্থাই না প্রাচীনকালে ছিল!

অধ্যায়ের সংখ্যা চৌষট্টি আর তাই বইটির ওই নাম। অধ্যায়ের সংখ্যা দিয়ে বইয়ের নামকরণের রেওয়াজ প্রাচীন বলে প্রচার করা অনেক কেতাবের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। খ্রীস্টপূর্ব আমলের লেখা বলে প্রচার করা পাণিনির ব্যাকরণের নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। চৌষট্টি কলার কথাও প্রাচীন বলে প্রচার করা কেতাবে বেশ যত্ন করেই রাখা হয়েছে। কলাপ্রেমিকদের চৌষট্টি সংখ্যা-প্রীতির ফলে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব কলাই ঠাঁই পেয়েছে সেই চৌষট্টির লিষ্টিতে। ঠাঁই পেয়েছে এমন বেশ কিছু ভূতুড়ে কলা যার চর্চা কোনোদিন হয়নি। হবেও না। তত্ত্বের সঙ্গে সংখ্যা না জুড়ে সংখ্যার সঙ্গে তত্ত্বকে জুড়তে গিয়েই ওই ভূতুড়ে ভুলটা করে বসেছিলেন নেপথ্যে থাকা পণ্ডিতেরা। আর সেইজন্যই চৌষট্টি লিপি, একশ আটটি উপনিষদের গল্প ফাঁদতে হয়েছিল।

সে যাই হোক, চৌষট্টি রকমের লিপির প্রচলন ভারতে না থাকলেও তত্ত্ব তৈরি করে নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। পরবর্তীকালের গবেষকেরা যাতে তথাকথিত ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী বাদে বাকি বাষট্টি রকমের লিপি আবিষ্কার করে আনন্দ পান এবং আন্তর্জাতিক পাণ্ডিত্যের আসরে স্বীকৃতি পেয়ে পুলকিত বোধ করেন তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে এখানে সেখানে সুপরিকল্পিতভাবে কিছু পাথুরে লিপি খোদাই করে রাখার মধ্য দিয়ে। এই রকমই একটি লিপির আবিষ্কার করেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

# শঙ্খলিপি—একটি প্রতারণার নাম

প্রাচীন কালে ভারতের নানান জায়গায় বেশ কয়েকটি অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। এই রকমই একটি যজ্ঞের স্মারক হিসাবে পাথর কেটে বানিয়ে রাখা একটি ঘোড়ার মূর্তি লখ্‌নৌ-এর এক মিউজিয়ামে রাখা আছে। পাথুরে ওই ঘোড়াটির পরিচয়পত্রেও ওই যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। সে যাই হোক, ঘোড়াটির মূর্তির পেছনে খোদাই করা লিপির মর্মোদ্ধার করে বসেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। লিপি বিশ্লেষণ করে তিনি আবিষ্কার করেছেন 'শঙ্খলিপি' যা নাকি তথাকথিত ব্রাহ্মী-লিপিরই প্রকারভেদ। মতান্তরে সে-যুগে প্রচলিত চৌষট্টি রকমের লিপির একটি। আবিষ্কারের বার্তা দেশে দেশে পৌঁছে গেল। আর যায় কোথায় ? জার্মানী থেকে নেমন্তন্ন হল—নেমন্তন্ন হল আমেরিকা থেকেও। আজ ইনি ডাকছেন ত' কাল উনি। পণ্ডিতদের কায়েমী স্বার্থ কি সুন্দর গড়ে ওঠে! রাষ্ট্রের সীমানা বলে কিছু থাকেনা। সব পণ্ডিতই সীমানাহীন এক পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে যান। হয়ে যান অবলীলায়। উইল্‌কির One world-এর কথাটা মায়াও নয়—মতিভ্রমও নয়। অন্ততঃ পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে ত' নয়ই। তাঁদের ক্ষেত্রে ওটা বাস্তব সত্য।

কোথায় ছিল অশ্ব—কোথায় হত অশ্বমেধ! অশ্বমেধের গল্প-গুলো বেশ ভালোই বানানো হয়েছিল। যৌন আদিখ্যেতার একটা উপাখ্যানও গল্পটিতে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বাসযোগ্য না হলেও গল্পটা ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছে। কারণ বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকাটাই প্রাচীন যুগের ইতিহাসে ঢুকে বসে থাকার বড় যোগ্যতা বলে পণ্ডিতেরা ধরে নিয়েছেন।

অতীতে যতগুলো অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়েছিল ঠিক ততগুলো পাথুরে ঘোড়াও বানিয়ে রাখতে হয়েছিল। এক একটা যজ্ঞ হত আর তার

প্রমাণ রাখার জন্যই এক একটা পাথুরে ঘোড়াও তৈরি করে রাখতে হত। অন্ততঃ পণ্ডিতদের এই রকমই ধারণা। জ্যান্ত ঘোড়ার চেয়ে পাথুরে ঘোড়ার দাম অনেক বেশি। রাজরাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে দামের কথা কে আর ভাবে? তবে ওই প্রমাণ রাখতে গিয়েই নেপথ্যশিল্পীরা যে একটু গোলমাল করে বসেছিলেন সেইটাই আসল কথা। আড়াই হাজার বছর আগে যে অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়েছিল বলে প্রচার করা হয় তার প্রমাণ হিসাবে খাড়া করা পাথুরে কাণ্ডকারখানাটার বয়স শ'খানেক বছরের বেশি নয়। মিউজিয়ামে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যে অশ্বলিপি দেখে পণ্ডিত তত্ত্ব তৈরি করে বসেছিলেন তা নেহাৎ-ই একটি ত্রিমাত্রিক জালিয়াতি। প্রাচীনত্বের ছিটেফোঁটাও ওটাতে নেই। আর তা যে নেই তা ওই পাথুরে ঘোড়াটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখে নিলেই বোঝা যায়। পাঁচ ছ' শ' বছরের পুরনো মন্দিরে পাথুরে ঘোড়া কম নেই। তবে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের দাপটে এবং পরিবেশ থেকে এসে যাওয়া জলে গুলে থাকা জৈব-অজৈব রাসায়নিকের ক্রিয়াবিক্রিয়ায় সময়ের ছাপ পড়ে গেছে সেসব মূর্তিতে। ছাপ পড়েনি শুধু ওই অশ্বমেধের 'বীরভদ্র'-দের নিটোল অঙ্গে। পড়েনি তার কারণ অর্ডার দিয়ে বানিয়ে রাখা উনিশ শতকের নিটোল একটা রসিকতা ছাড়া ওটা আর কিছুই নয়। নীরস পাথর কেটে বানিয়ে রাখা মূর্তিমতী রসিকতাটাকে মুখুজ্জে মশাই ধরতে পারেননি। আর পারেননি বলেই তত্ত্ব তৈরির পণ্ডশ্রম তাঁকে করতে হয়েছিল। শঙ্খলিপি কোনও লিপির নাম নয়—নিছক একটি প্রতারণার নাম।

# রামায়ণ-মহাভারত কোনোটাই ধর্মগ্রন্থ নয়

রামায়ণ ও মহাভারতের কোনওটিকেই হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মনে করার কোনও কারণ নেই। কারণ প্রথমত হিন্দু সংগঠিত কোনও ধর্মই নয়। এ-ধর্মের নিয়মকানুন ( =সংহিতা, এটি খাঁটি মরাঠী শব্দ ) বেঁধে দেওয়ার কর্তৃত্ব বা অধিকার কেন্দ্রীভূত কোনও প্রতিষ্ঠানের হাতে কোনকালে ছিলনা—এখনও নেই। উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে তদানীন্তন ভারত সরকারের শুভেচ্ছায় যেসব তথাকথিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তার প্রথম দিককার সংগঠনগুলো ছিল বেদান্তআশ্রয়ী। বেদান্তকেই হিন্দুধর্মের মূল বক্তব্য বলে মনে করে বসতেন ওই বৈদান্তিকদের দল। যে বেদান্তটা ছিল ওই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পোষ্য পণ্ডিতদের দিয়ে তৈরি করে নেওয়া কাঁচা সংস্কৃতে লেখা ধর্মীয় জালিয়াতি—কাঁচা কারণ সংস্কৃত ভাষার তখনও পর্যন্ত পরিকল্পিত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি, ঘটেছিল বছর চল্লিশ পরে। বলে রাখা ভালো 'বেদান্ত'-শব্দটা খাটি মরাঠী। শব্দটির অর্থ দর্শন। শব্দটি বেশ কিছু উপনিষদের সমার্থক শব্দ হিসাবে সংস্কৃতে ঠাঁই পেয়েছে। যেন কতই না প্রাচীন ওই শব্দটি! কাঁচা সংস্কৃতে লেখা কঠোপনিষদ রামমোহন রায়ের বাঙলা, হিন্দী ও ইংরিজি তর্জমাসহ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে। সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ ওই কঠোপনিষদ।

ইংলিশমিডিয়াম ব্রহ্মবাদী বা বেদান্তবাদীর পত্তন ব্রিটিশ সরকারের এক মহান কীর্তি। এ-বিপদ আগে ছিল না। 'ব্রহ্ম'-শব্দটির অর্থ আমরা কেউই জানতাম না। এখনও জানিনা। বাঙলা, ওড়িয়া ও হিন্দী কোনও ভাষাতেই অর্থবহ লোকচল শব্দ হিসাবে ওই শব্দের প্রচলন নেই। অর্থহীন একটি শব্দকে নিয়ে সমাজের একটি অংশ মাতামাতি শুরু করে দিলেন—এমনটা হওয়ার কথা নয়। ভারতে ব্রিটিশদের আসার আগেও সমাজ

থেকে ছিটকে গিয়ে মানসিক দুর্বলতার কারণে কিংবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে কেউ কেউ বিবাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়তেন। সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ভিক্ষাবৃত্তিটাকে জীবন-জীবিকার অন্যতম বিকল্প একটি উপায় হিসাবেই তাঁরা বেরিয়ে পড়তেন। ব্রহ্মের সন্ধানে নয়—জীবিকার সন্ধানে। তথাকথিত ব্রহ্মতত্ত্ব নামক বুজরুকির সবই যে চালাকির আর এক নাম এই সোজা কথাটাই পণ্ডিতেরা চেপে গেছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেদাশ্রয়ী কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। বেদ-কেই তাঁরা সর্বরোগহর সমাজহিতৈষণার মহামন্ত্র-সমৃদ্ধ কেতাব বলে প্রচার করতে শুরু করে দিলেন। বেদের প্রশংসায় এঁরা ডগমগ ছিলেন। বেদে সব আছে। নেই বলে কিছু নেই। বেদের বিধানটাকেই তাঁরা বেদবাক্য বলে মনে করে বসতেন। বেদের ধর্মটাকেই খাঁটি হিন্দু ধর্ম বলে ভেবে নিয়ে এক অপার্থিব আনন্দ পেতেন। দয়ানন্দ অমুকানন্দ তমুকানন্দরা বেদপ্রচারটাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। ওই বেদ চারটিও যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দাক্ষিণ্যনির্ভর কিছু সংস্কৃত পণ্ডিতদের ভাষাতাত্ত্বিক জালিয়াতির মাধ্যমে লেখা হয়েছিল—এই সোজা কথাটাকেই পণ্ডিতেরা বুঝতে দেননি। জালিয়াতি যদি নাই হবে তবে কালিয়া কোটালিপাড়া থেকে বেছে বেছে কেবল সংস্কৃত-জানা পণ্ডিতকে ওই বনারস-গাজীপুরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছিল? যাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁরা ত তথাকথিত বৈদিক ভাষার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানতেন না। জানতেন বাঙলা আর শিখে নেওয়া সংস্কৃত ভাষা। তাহলে? তথাকথিত বৈদিক ভাষায় লেখা অস্তিত্বহীন কেতাবগুলোর (শ্রুতির আবার কেতাব হয় নাকি?) সম্পাদনা নাকি কোলেশন-ব্যাপদেশে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাজে লাগানোর চিন্তাই-বা ওই কোম্পানীর মাতব্বরদের মাথায় এল কেন? 'বৈদিক সংস্কৃত' ভাষায় লেখা কিছুর সম্পাদনা করতে বৈদিক ভাষা-অভিজ্ঞদেরই যে পাঠানোর কথা। তা হয়নি কেন?

আর তা হয়নি বলেই কি সংস্কৃত শব্দের ওপর ভূতুড়ে অর্থ আরোপ করে ভূতুড়ে বেদের ভূতুড়ে ভাষা বানানোর জালিয়াতি করতে হয়েছিল? তাইত আসছে।

প্রথম তিনটি বেদের নাম খাঁটি মরাঠী। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ সবই মরাঠী। অর্থর্ববেদ-এর 'অথর্ব' অংশটির যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরুক্ত নামক শব্দব্যুৎপত্তিতত্ত্বের বইয়ে দেওয়া হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় ওই 'অথর্ব' অংশটি খাঁটি বাঙলা। মরাঠী 'সামবেদ'-এর অর্থ 'একটি মরাঠী উপভাষা।' বুঝতে কষ্ট হয়না বৈদিক 'সামবেদ' শব্দটা মরাঠী থেকে নেওয়া হয়নি। এটা ইংরিজি psalm এবং ইংরিজি wit-এর জোড়কলম শব্দ। 'উপনিষদ' শব্দটিও খাঁটি মরাঠী। এতসব মরাঠী শব্দ পঞ্চনদের দেশে প্রাচীনকালে পৌঁছল কি করে—এ-প্রশ্ন কেউ তোলেননি। 'পর্জন্য'-শব্দটাও খাঁটি মরাঠী। মরাঠী 'ফোদরী' শব্দ থেকে বৈদিক 'আপোদর' শব্দটা বানানো হয়েছিল। প্রাচীনকালে পঞ্জাবমুলুকে নাকি বেদ লেখা হয়েছিল। তাই যদি হবে তবে ওই বেদে মরাঠী শব্দের বন্যা বয়ে গেল কেন? পঞ্জাবী শব্দের এত আকালই-বা হল কেন বেদে? আসলে বেদ রচনার কর্মকাণ্ডে বেশ কিছু মরাঠী সাকরেদও ছিলেন। বনারস গাজীপুরের বেদ তৈরির কারখানায় তাঁরাই সরবরাহ করেছিলেন মরাঠী-মূলক 'বৈদিক' শব্দগুলো।

বেদ-বেদান্ত-নির্ভর যেসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভারতে গড়ে উঠেছিল তার কোনোটাই হিন্দুধর্মের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেনি। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল টাইপের ওইসব প্রতিষ্ঠান গুরুবাদী কয়েকটি গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে। ওই পর্যন্তই। আসলে এঁরা উনিশ শতকের আঁতেলি ইণ্টেলিজেন্সের অপজাতক। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের একটি গোপন খেলায় এঁরা সহযোগিতা করেছিলেন। দেশের মানুষের মধ্যে যাতে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব না গড়ে ওঠে—তাঁদের মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে যাতে অন্য দিকে সরিয়ে রাখা যায় তার জন্যই ওই খেলা খেলা হত। খেলাটা এই বিশ শতকেও চলেছে।

ভিয়েৎনামের সায়গনের রামকৃষ্ণ মিশন থেকে হঠাৎ নেতাজির হাতের ছাপ এসে হাজির। ব্যাপারটা কি? আসলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশে ওই মিশন ভারত সরকারের ইণ্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের একটা আউটপোস্টের কাজই করেছে ওই ছাপ পাঠানোর মধ্য দিয়ে। কে যে কখন কার হয়ে কাজ করে সেইটাই আশ্চর্যের। কখনও রাষ্ট্র ধর্মের ঠিকাদারী নেয়—কখনও ধর্ম রাষ্ট্রের গোপন কর্মকাণ্ডের কণ্ট্র্যাক্ট নিয়ে বসে।

হিন্দু ধর্মের বেশিরভাগ মানুষ ওই বেদও পড়েননি। পড়েননি ওই বেদান্তও। তাঁরা বেদও মানেন না—বেদান্তও নয়। বাপ-ঠাকুরদার কাছথেকে পাওয়া কিছু সংস্কার পুষে রাখার মধ্য দিয়েই তাঁদের ধর্ম-কর্ম সব ঠিক হয়। কোনও কেতাবকে সালিশি মানার প্রশ্নই ওঠে না। যাঁরা মনে করেন হিন্দুধর্মের বিধান বাৎলানোর ক্ষমতা ওই মনু-সংহিতা বা ভৃগুসংহিতার আছে তাঁরা ওই সংহিতাও পড়েননি আর ওই সংহিতা কবে লেখা হয়েছে তাও জানেন না। হিন্দুরা জানেন শুধু কিছু ঠাকুর-দেবতার নাম। কেউ শিবের পুজো করেন ত' কেউ দুর্গার। কেউ গণেশের ত' কেউ রাম বা হনুমানের। কেউ কেষ্টঠাকুরের। বেদের দেবদেবীর নাম ভারতের মানুষ শোনেননি। সেসব নাম নিয়ে গবেষকেরা যত গবেষণার ছয়লাপই করুন না কেন—তাতে কিছু এসে যায় না। ব্রহ্মটাই বা কি বস্তু তাও তাঁরা জানেন না। জানার দরকারই পড়ে না। ব্রহ্মের বিজ্ঞাপন লিখে বৈদান্তিকেরা যত আনন্দই পান না কেন ওই ব্রহ্ম নামক ক্লীবলিঙ্গটির যে কি অর্থ তাও কেউ বোঝাতে পারেন নি।

হিন্দু-শব্দটাও গোলমেলে। শব্দটা ভারতের কোনো ভাষার শব্দ নয়। এমনকি শব্দটির ব্যুৎপত্তির একটি গল্প বানিয়ে রাখলেও ওটি সংস্কৃত শব্দ নয়। ভারত সরকারের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে উদ্দীপিত হয়ে যেসব তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী সারা ভারতে ধার্মিক নৃত্য করে বেড়াচ্ছেন অহিন্দু, অমরাঠী, অগুজরাতিদের রক্ত হিম করার মহান দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা নব্যদয়ানন্দ নব্যবিবেকানন্দ সেজে বসেছেন তাঁরা জেনে

রাখুন বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে উনিশ শতককে ফেরানো যায় না। ফেরানোর কোনও অর্থই হয় না। উনিশ শতকের লেখাকে আড়াই হাজার বছরের পুরনো বলে মনে করে উনিশ শতকের যেসব মনীষি এবং পণ্ডিতের দল ওইসব লেখার ভুলভাল মার্জিনাল নোট লিখে আমাদের কৃতার্থ করেছিলেন তাঁরা সকলেই এ-যুগে অচল। ভার থাকলেও গতি নেই।

ইতিহাসের পণ্ডিতেরা 'হিন্দু' শব্দটি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী দু-রকম বক্তব্য রেখেছেন। প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতদের যা অভিমত তা যেকোনও ইতিহাসের বইয়েই পাওয়া যায়। তত্ত্বটা এইরকম: ফার্সী ভাষাভাষীরা 'সিন্ধু'-নদের 'সিন্ধু' অংশের স-ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারতেন না। তাঁরা স-এর বদলে 'হ' উচ্চারণ করে বসতেন। আর তাই সিন্ধুনদের নাম তাঁদের উচ্চারণের দোষে 'হিন্দু' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সেইজন্যই ওই সিন্ধু-নদের পূবের বাসিন্দাদের তাঁরা হিন্দু বলেই জানতেন। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর এক উদ্ভট তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ফার্সী ভাষাভাষীরা নাকি প্রাচীনকালে 'স'-ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারতেন না। আজগুবি কথা আর কাকে বলে! প্রতিষ্ঠিত বেশিরভাগ পণ্ডিত এ-'তত্ত্বে' বিশ্বাসী হলেও সত্য হচ্ছে এই: ফার্সী ভাষাভাষীরা 'স'-ধ্বনির উচ্চারণ করতে পারতেন না—বা পারেন না এ-কথাটাই মিথ্যা। স-আরব্ধ, স-মধ্য বা স-অন্ত শব্দ, স্থাননাম, ব্যক্তিনাম সবই ফার্সী ভাষায় প্রচুর আছে আর সেসব শব্দের 'স'-উচ্চারণ করতে তাঁদের কোনো অসুবিধাই হয়না। হতও না। সিরাজ-কে তাঁরা কেউই হিরাজ বলেন না। সিরহিন্দ-কে কেউ হিরহিন্দ বলার কথা ভাবতেও পারেন না। দ্বিতীয়তঃ সিন্ধু-নদকে তাঁরা হিন্দু বলতেন একথা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই তাহলে ওই নদীর পূবের বাসিন্দাদের তাঁরা হিন্দু বলতেই বা যাবেন কেন? আমরা কি পদ্মাপারের লোককে পদ্মা বলে ডাকি? নাকি পদ্মা উচ্চারণ করতে পারিনা বলে তাঁদের পদ্দা বলে ডেকে বসি?

আগডুম-বাগডুম মার্কা এই ধরনের যুক্তি ইতিহাসের বইয়েই চলে!

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের বক্তব্যটা এই রকম: সিন্ধু নদের নামের সঙ্গে ওই হিন্দু শব্দের কোনও সম্পর্ক নেই—সম্পর্ক কোনও কালে ছিলও না। 'হিন্দু' শব্দটা ফার্সী ভাষায় আগে থেকেই চালু ছিল। এখনও চালু আছে। ফার্সী ভাষায় শব্দটির দুটি অর্থ। এক, কালো আর দুই, ভারতীয়। আমরা যেমন আফ্রিকার নিগ্রোদের কালা আদমী বা ইউরোপের লোককে 'সাদা চামড়া' মনে করে বসি তেমনি ফার্সী ভাষাভাষীরা সিন্ধুনদের পূব দিকের বাসিন্দাদের প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু হিসাবে জেনে এসেছেন। জেনে এসেছেন তাঁদের গায়ের রঙের সুবাদে। এবং সবচেয়ে বড় কথা 'হিন্দু'-শব্দটা ধর্মবাচক ছিলনা। ছিল জাতিবাচক। অর্থাৎ সিন্ধুনদের পূব দিকের সব জাতের মানুষেরই নাম ছিল হিন্দু। তাঁদের তথাকথিত ধর্ম যাই থাক না কেন—ভাষা যাই হোক না কেন। তথাকথিত শব্দটির একটু ব্যাখ্যা দরকার। ধর্মপুস্তক বলে যেগুলোকে চালানো হয় তার সবই আধুনিককালে বানিয়ে নেওয়া কাণ্ডকারখানা। সবই the book অর্থাৎ 'সেরা বই'। প্রাচীনত্বের ছিটেফোঁটা কোনোটারই নেই। শিখদের 'গ্রন্থসাহিব' মানেও সেরা বই—বাইবেল মানেও তাই—কোরান মানেও তাই।

দ্বিতীয় এই বক্তব্যটির মধ্যেও ভুলভ্রান্তি কম নেই। এক, হিন্দু-শব্দটি জাতিবাচক হলেও তা খুব প্রাচীনকালেই যে ভারতের মানুষ বোঝাতে ব্যবহার করা হত—এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। সহজ কথায়, জাতিবাচক 'হিন্দু'-শব্দটা খুব একটা প্রাচীন নয়। দুই, আধুনিক ফার্সী ভাষায় 'কালো'-শব্দের দুটি প্রতিশব্দের চল থাকলেও 'হিন্দু'-শব্দের চল নেই। তবে 'ভারতীয়' অর্থে 'হিন্দবী' শব্দের চল আধুনিক ফার্সীতে আছে। আসলে হিন্দু-শব্দের কালো অর্থে ব্যবহার এখনও আছে আফগানিস্তানের পশ্‌তু ভাষায়। যেমন পর্বত শব্দের ফার্সী কোহ্‌—পশ্‌তু ভাষায় কুশ-অর্থে পর্বত। আমরা যাকে হিন্দুকুশ (পর্বত) বলি ফার্সীরা তাকে সিয়াকোহ্‌

বলেন—পশ্‌তু ভাষাভাষীরা কিন্তু ওই পর্বতকে হিন্দুকুশ বলেই জানেন। তিন, জাতিবাচক 'হিন্দু'-শব্দটা ধর্মবাচক অর্থে কেন ব্যবহার করা হল এবং কবে থেকেই-বা তা শুরু হল—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-সম্পর্কে ওই তত্ত্বটিতে কোনও কথাই বলা হয়নি।

আসলে এ-সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার বিপদ আছে। কারণ সত্যি কথা বলতে কি এ-সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে শুধু যে ওই 'হিন্দু-শব্দের ধর্মবাচক অর্থে প্রয়োগের অর্বাচীনত্বই প্রকাশ পাবে তাই নয়—প্রকাশ হয়ে পড়বে ওই India বা Indica নামের প্রাচীন প্রচলনের পুরো গল্পটাই। আর তা প্রকাশ হয়ে পড়লে গ্রিক এবং তথাকথিত রোমক ইতিহাসের প্রাচীন বলে প্রচার করা উৎসগ্রন্থগুলো যে অর্বাচীন তাও প্রকাশ হয়ে পড়বে। প্রাচীন ইতিহাসের কারবারীরা কি তখন মুশকিলে পড়বেননা? এত গেল একটা দিক। 'হিন্দু'-'হিন্দু' করে যাঁরা তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়াচ্ছেন—শ্রীরামচন্দ্রের নাম প্রচার করার নাম করে যাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের আত্মারাম খাঁচাছাড়া করার উদ্যোগ-আয়োজন নিচ্ছেন—তাঁদেরও উল্লাসের কোনও কারণ নেই। কারণ প্রথমতঃ হিন্দু ধর্ম-পুস্তক বলে প্রচার করা কেতাবগুলোর সবই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুৎসুদ্দী পণ্ডিতদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁদেরই অনুগ্রহপুষ্ট দেশী পণ্ডিতদের দিয়ে লেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল ওই ব্রিটিশদের ভারতে আসার পরে। প্রাচীন যুগেও নয়—মধ্য যুগেও নয়। বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চলের জেলায় জেলায় সংস্কৃত পণ্ডিতদের যে কতগুলো পকেট তৈরি হয়েছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। পণ্ডিতপ্রধান গ্রামের পত্তন ব্রিটিশ সরকারের এক মহান কীর্তি। এ-বিপদ আগে ছিল না। অশিক্ষা-কুশিক্ষার মহাসমুদ্রের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তমলুক, মেদিনীপুর, বসিরহাট, কালিয়া, কোটালিপাড়া, বিক্রমপুর, লাভপুর, পাত্রসায়র ইত্যাদি কত যে পণ্ডিতপ্রধান দ্বীপ গড়ে উঠেছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আর সেসব দ্বীপে এক শ্রেণীর পণ্ডিত সব কাজ ভুলে গিয়ে কেন

জানিনা মরে ভূত হয়ে যাওয়া ভাষায় ছাইভস্ম লিখে রায়-বাহাদুর, বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় হয়ে বসতেন। এঁদের দিয়ে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ট ভাষায় কেতাব লেখানোর এক মোচ্ছব শুরু হয়েছিল। রেলপথ চালু হওয়ার পরে নানান জায়গা থেকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের ডেকে এনে ভাটপাড়া-নৈহাটীতে বসানো হয়েছিল। কাজ কর্মের সুবিধার জন্য। ভাটফুলের নামে যে ভাটপাড়া নামের জন্ম হয়েছিল সেই ভাটপাড়া নানান জায়গার পণ্ডিত সমাগমে হয়ে উঠল ভট্টপল্লী! ভট্ট মানে দার্শনিক! বলে রাখা ভালো ওই ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের কেউই ওখানকার আদি বাসিন্দা ছিলেন না—সবাই ছিলেন বহিরাগত। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পরে যেমন জেলায় জেলায় ইণ্টেলিজেন্স-এর কাজ করে এক শ্রেণীর মানুষ আখের গুছিয়ে নিতেন—১৮২০-র পরে ঠিক তেমনি স্বনামে বেনামে সংস্কৃত কাব্যকাহিনী লিখে আর এক জাতের শিল্পী আখের গুছিয়ে নিতেন। টাকা পয়সার অভাব কোনও খেলাতেই হয়নি। বাজেট-বহির্ভূত অর্থসংস্থানের ব্যবস্থাও থাকত আঁতেলি এবং রাজনৈতিক ইণ্টেলিজেন্সের কাজকর্মে। কাকপক্ষী টের পেতনা এমনই ছিল সে-গোপনীয়তা।

## ইলিয়াড ও ওডিসিকে প্রাচীন বলে চালানোর কসরৎ কম হয়নি

ইলিয়াড ও ওডিসি নামের বইদুটো প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। তথ্যটি সম্পর্কে কেউই সন্দেহ প্রকাশ করেননি। প্রশ্ন কিন্তু এসেই যাচ্ছে। এক, বইদুটো কি সত্যিই প্রথমে প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছিল? দুই, তা যদি লেখা হয়েই থাকে তবে কি তা প্রাচীন কালে লেখা হয়েছিল? আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হলেও প্রশ্ন দুটি আসছেই কারণ সত্যি কথা বলতে কি ওই ভাষায় লেখা প্রাচীন কালের কোনও কেতাব বা পুঁথি কেউ দেখেননি। 'প্রাচীন গ্রিক' 'প্রাচীন গ্রিক' বলে চীৎকার করলেই কিছু সত্যিই ওই প্রাচীন গ্রিক বনে যায়না। প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেখানোর দরকার পড়ে। পণ্ডিতেরা প্রমাণ দেখাননি। উল্টে তাঁরা মিথ্যাটাকে ঢাকতে একখানা গল্প বানিয়ে নিয়েছেন। আর সেই গল্পটাকেই প্রমাণ হিসাবে খাড়া করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন: প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা কোনও পুঁথি আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি। পৌঁছনোর প্রশ্নটাই অবান্তর কারণ পুঁথি লেখার এমন কোনও উপকরণ হয়না যা দু-তিন হাজার বছর অবিকৃত অবস্থায় থাকতে পারে। এই যখন অবস্থা তখন প্রাচীন বলে প্রচার করা কেতাব বা পুঁথিগুলোর বক্তব্য কোন কায়দায় হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকল—এ-প্রশ্ন স্বভাবতই এসে যায়। পণ্ডিতেরা প্রশ্নটির উত্তর দেননি। তবে কি পুঁথি-পরম্পরায় এবং বংশপরম্পরায় বক্তব্যগুলো আজকের যুগে এসে হাজির হয়েছে? হাজার আড়াই বছর ধরে কেতাবগুলোর খবর কেউ জানতেন না কেন? কেন দীর্ঘকাল বইগুলোকে শীতঘুম-গ্রীষ্মঘুম দিয়ে কাটাতে হল? কেনই বা উনিশ শতকে কেতাবগুলো পণ্ডিতদের নজর কেড়ে নিল—কেনই বা ওই শতকের নানান দশকে

আড়মোড়া ভেঙ্গে পুঁথিগুলো আত্মপ্রকাশ করা শুরু করল—কেনইবা ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে ওই শতকের শেষভাগে গ্রন্থাকারে ওসব প্রকাশিত হতে শুরু করল—সেও আর এক রহস্য। পণ্ডিতেরা সে-রহস্যের কুলকিনারা করার চেষ্টা করেননি। ব্যাপারটা কি? আসলে দেবভাষায় লেখা বলে প্রচার করা অস্তিত্বহীন সংস্কৃত এবং পালি-প্রাকৃত কেতাবগুলোকে মুখস্থ করে পুরুষানুক্রমে বাঁচিয়ে রাখার ভূতুড়ে গল্পটা ভারতের জন্যই বানানো হয়েছিল। আর ভারতের মাতব্বর পণ্ডিতেরা অম্লানবদনে গল্পটাকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে এই। ইউরোপের প্রাচীন বলে প্রচার করা কেতাবগুলো সম্পর্কে পুঁথি-পরম্পরা বা বংশ পরম্পরায় বেঁচে থাকার আজগুবি গল্পটা চালানো হয়নি। চালানো যায়নি। প্রাচীন গ্রিক বা ল্যাটিন ভাষাকে দেবভাষা বলে সার্টিফিকেট দেওয়ারও চেষ্টা হয়নি। মুখস্থ করার গল্পটা অবশ্য চালু করা হয়েছিল। তবে ওই পর্যন্তই। আর বিশেষ কিছু মিল ছিল না।

ওখানে বানানো হয়েছিল আর এক কায়দার গল্প। বলা হয়েছিল প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা পুঁথিপত্তরের বক্তব্যটাকে প্রথমে আরবী ভাষায়—পরে সেই আরবী তর্জমা থেকে ল্যাটিন ভাষায়—আরও পরে ওই ল্যাটিন তর্জমা থেকে ইউরোপের আধুনিক সব ভাষায় সে-সবের তর্জমা করা হয়।

অনুবাদ পরম্পরায় প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যের বেঁচে থাকার গল্প বানাতে গিয়ে নেপথ্য শিল্পীরা বেশ গোলমাল করে বসেছিলেন। গল্পগুলোকে ঐতিহাসিক বলে চালানোর জন্য কিছু সন্দেহসৃষ্টি এবং তা কাটিয়ে ওঠার গল্পও তাঁদের বানিয়ে রাখতে হয়েছিল। নেপথ্য শিল্পীদের সততা বোঝানোর একটা কায়দা হিসাবেই খেলাটা খেলা হত। একটা উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝানো যাক। এক নম্বরের সন্দেহটা জানানো হল এই কায়দায়। প্রশ্ন রাখা হল: প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা কেতাবগুলো আরবী ভাষায় কে বা কারা তর্জমা করলেন? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই এক সন্দেহের কথা

জানানো হল। বলা হল: আরবীভাষী পণ্ডিতেরা সে-যুগে ওই প্রাচীন গ্রিক ভাষার নাড়িনক্ষত্র কিছুই জানতেন না। আর তাই তাঁরা যে ওই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সন্দেহটা জাগিয়ে তা কাটানোর ব্যবস্থাও তাঁরা করলেন। তাঁরা বললেন: আসলে প্রাচীন গ্রিক ভাষা থেকে সরাসরি আরবী ভাষায় তর্জমা করা হয়নি। করা হয়েছিল অন্য কায়দায়। প্রাচীন গ্রিক ভাষা থেকে প্রথমে অ্যারেমীয় ভাষায়—পরে ওই অ্যারেমীয় তর্জমা থেকে সেগুলো আরবী ভাষায় তর্জমা করার ব্যবস্থা হয়। দু-প্রস্থ অনুবাদের ওই খেলাটা কারা খেলেছিলেন—এ প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা আর এক গল্প বানালেন।

তাঁরা বললেন: ইহুদি পণ্ডিতেরা ওই প্রাচীন গ্রিক ও অ্যারেমীয় দুটো ভাষাই জানতেন আর তাঁরাই ওই অনুবাদের দায়িত্বটা নিয়েছিলেন। এখানে একটা প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে। ইহুদি পণ্ডিতেরা অ্যারেমীয় ভাষায় ওসব অনুবাদ করতে গেলেন কেন? সে-ভাষা ত' অনুবাদ করার সময়ের অনেক আগেই মৃতভাষার তালিকায় ঠাঁই পেয়েছিল। তাহলে? জীবন্ত কোনও ভাষায় অনুবাদ না করে কেন তাঁরা মৃতভাষায় তা করতে গেলেন? এ-প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিতেরা দেননি। বিদেশী বইয়ের জীবন্ত ভাষায় অনুবাদ না করে মরে হেজে যাওয়া ভাষায় তা করার পণ্ডশ্রম কেউ করেন না। করলে বুঝতে হয় নেপথ্যে থাকা কোনও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার আশ্বাস পেয়েই তাঁরা তা করেছেন। ভারতের প্রাচীন বলে প্রচার করা বেদ উপনিষদের ফরাসী বা জার্মান অনুবাদ করার মধ্যে সন্দেহের কিছু না থাকলেও মৃতভাষা ল্যাটিনে তা অনুবাদ করার কাজটার কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুবাদ করার দরকার থাকলে তা জীবন্ত ভাষাতেই করতে হয়—মৃতভাষায় নয়। প্রশ্ন আসছেই। এক, প্রাচীন সব ধর্ম এবং দর্শনের নামে লিখে রাখা ধর্মীয় ও দার্শনিক জালিয়াতিগুলো পুষে রাখার মাধ্যম হিসাবে মৃতভাষা ল্যাটিনকে কেন কাজে লাগানো হল? কার নির্দেশে?

দুই, ল্যাটিন ভাষা নিয়ে নাচানাচি সবচেয়ে বেশি ওই ইংল্যাণ্ডে কেন হয়েছিল? ল্যাটিন চর্চা সবচেয়ে বেশি কেন সেদেশে হয়েছিল? ইংরিজি-ল্যাটিন ডিক্সনারি প্রকাশ করার পরে অন্য ভাষায় ল্যাটিন ডিক্সনারি কেন প্রকাশ করা হয়েছিল? তিন, ল্যাটিনের চর্চা ত' তথাকথিত রোমান গোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের মধ্যেই বেশি হওয়ার কথা। তা হয়নি কেন? চার, অন্য ভাষা থেকে ল্যাটিন তর্জমা করার কাজে মেতে ওঠা পণ্ডিতদের মধ্যে ইংরেজ ও আইরিশদের সংখ্যা সন্দেহজনক মাত্রায় বেশি কেন? তবে কি ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক বদান্যতার ওপরে ওই ভাষার চর্চাটা নির্ভরশীল ছিল? তাইত আসছে।

গল্পের পরের অংশটা এই রকম। অ্যারেমীয় ভাষা থেকে পরে আরবী পণ্ডিতেরা সে-সব আরবী ভাষায় তর্জমা করে নিয়েছিলেন। নিতে পেরেছিলেন কারণ তাঁরা গ্রিক ভাষা না জানলেও জ্ঞাতি-ভাষা অ্যারেমীয়টা জানতেন। প্রশ্ন কিন্তু এসেই যাচ্ছে। সুবিপুল প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য যদি আরবী ভাষায় তর্জমা করা হয়েই থাকে তবে সে-সব গেল কোথায়? তবে কি সে-সব না থাকার কারণ হিসাবে খাড়া করার জন্যই আলেকজাণ্ড্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগারের বহ্ন্যুৎসবের গল্পটা বানিয়ে রাখা হয়েছিল? তাইত আসছে। এক মিথ্যা ঢাকতে অসংখ্য মিথ্যা এই ভাবেই বানাতে হয়। প্রমাণের অভাবে কল্পিত গ্রন্থাগারের কল্পিত অগ্নিকাণ্ডের এই ধরনের গল্প আমাদের শিবাজী সম্পর্কেও বানানো হয়েছিল। শিবাজীর সব প্রমাণই নাকি পুড়ে গেছে।

অনুবাদ পরম্পরার গল্পটার মধ্যে কিছু ফাঁক ও ফাঁকি থেকে গেছে। প্রশ্ন আসছেই। প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা ত' কিছুই পাওয়া যায় নি। তাহলে বর্তমানে ওই ভাষায় লেখা যা কিছু পাচ্ছি সেসব করে লেখা হল? এ-প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা যা বলেছেন তার মধ্যেই রহস্যের ইঙ্গিত থেকে গেছে। তাঁরা বলেছেন ওসব reconstructed language-এ লেখা হয়েছে? বিচিত্র সংবাদ একেই বলে!

'নতুন করে তৈরি করে নেওয়া' ওই প্রাচীন গ্রিক ভাষার কথাটা কি সোনার পাথরবাটির মতো শোনাচ্ছে না?

আসলে ব্যাপারটা কি? প্রাচীন বলে চালানো সব ভাষাই reconstructed অর্থাৎ নতুন করে বানিয়ে নেওয়া—তা সে ল্যাটিনই হোক আর ওই প্রাচীন গ্রিকই হোক—হিব্রুই হোক বা সংস্কৃতই হোক। আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে এ-সব ভাষাই বানিয়ে রাখতে হয়েছে। এ-ছাড়া উপায় ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে প্রচার করা কোনও ভাষাই পুঁথি বা বংশ পরম্পরায় আধুনিক যুগে এসে পৌঁছয়নি। আর তা এসে পৌঁছয়নি বলেই লিথুয়ানীয়, ল্যাটভীয় পণ্ডিতদের দিয়ে কৃত্রিম সব ভাষা সৃষ্টির নেপথ্য কর্মকাণ্ড শুরু করতে হয়েছিল। এ-ছাড়া ভারত ও ইউরোপের অন্য জাতের পণ্ডিতেরাও সে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পুনর্গঠিত ভাষাগুলোর চর্চাটা আঠারো শতকে শুরু হলেও ওইসব ভাষার কেতাবগুলোর বেশিরভাগই উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল। সতেরো বা আঠারো শতকে নয়। ব্যাপারটা সন্দেহের। আর তা আসছে কেতাবগুলোর প্রকাশকাল সম্পর্কেই। বইগুলো প্রকাশ করতে এত দেরি হল কেন—এ-প্রশ্ন কেউ তোলেন নি। তোলা উচিত ছিল। আসলে ওই জাতের ভাষাগুলোর সবই পণ্ডিতদের কুক্ষিগত. পণ্ডিতদের দ্বারা এবং পণ্ডিতদের জন্য তৈরি করে নেওয়ার দরকার পড়েছিল। পণ্ডিততান্ত্রিক ভাষাগুলোর উদ্ভাবনার মূলে যেমন এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের দরকার পড়েছিল তেমনি প্রাচীন সংস্কৃতির তথ্যে ভরপুর নানান সব কেতাব লেখানোর জন্যও আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নেওয়ার দরকারও পড়েছিল। ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ ছিল। আসলে বিদ্বৎকৃত, বিদ্বৎভোগ্য এবং বিদ্বৎ প্রশংসিত ভাষাগুলোয় অভিজ্ঞ অল্পসংখ্যক পণ্ডিতদের দিয়েই কাজটা সারতে হত। আর তাইতেই ওইসব ভাষায় লেখা কেতাবগুলো প্রকাশ করতে কিছু দেরি হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন আরও এসে যাচ্ছে। এক, প্রাচীন গ্রিক ভাষা থেকে ওই অ্যারেমীয় ভাষায় যদি কিছু তর্জমা করা হয়েই থাকে তবে সেসব গেল কোথায়? তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? তবে কি ওই অনুবাদ করার তথ্যটা ভিত্তিহীন। তাইত আসছে।

দুই, দুনিয়ার যত পণ্ডিত সবাই কি সেযুগে ইহুদি-ধর্মাবলম্বী ছিলেন? ধর্মের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের কি সম্পর্ক? প্রচারটা এমনভাবে রাখা হয়েছে যেন সে-যুগের ইহুদি মাত্রেই প্রচণ্ড সব পণ্ডিত ছিলেন। ইহুদিদের পাণ্ডিত্যের মিথটা বানানো হয়েছিল তাঁদের জাতে তোলার জন্য। অনেক মিথ্যা ইহুদিদের লেখা বলেই সত্যি বলে চালাতে সুবিধা হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান শাখায় ব্যবহার করার উপযোগী শব্দ তৈরি করার কাজে গ্রিক ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করার নেপথ্য কর্মকাণ্ড আঠারো শতকে শুরু হলেও উনিশ শতকেই গ্রিক-মূলীয় পরিভাষা সৃষ্টির কাজটা পুরোদমে চলেছিল। ইংরিজি-গ্রিক ডিক্সনারী সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে। সংগঠিতভাবে গ্রিক চর্চা ওই সময় থেকেই শুরু হয়। মজার কথা হল গ্রিক ভাষার চর্চা শুরু হলেও ওই সময় তথাকথিত প্রাচীন গ্রিক ভাষার নাড়ি-নক্ষত্র কেউই কিছু জানতেন না। শোনেনও নি। বুঝতে কষ্ট হয়না ওই 'প্রাচীন গ্রিক' বলে প্রচার করা ভাষার উদ্ভাবনার নেপথ্য কর্মকাণ্ড ১৮২০-রও পরে শুরু হয়েছিল। শুরু হয়েছিল ওই ইংল্যাণ্ডেই। গ্রিস দেশে নয়। 'প্রাচীন গ্রিক' ভাষায় শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া পণ্ডিতদের ট্রেনিং দেওয়ার কাজটা গোপন কর্মকাণ্ড হিসাবেই সারা হত। কাকপক্ষী টের পেত না—এমনই ছিল সে-গোপনীয়তা। মন্ত্রগুপ্তির জালে জড়ানো নেপথ্য পণ্ডিতদের দিয়ে প্রশিক্ষণের কাজটা সময়সাপেক্ষ ছিল।

প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা বিশ্ববিখ্যাত কেতাবগুলোর সবই প্রকাশিত হয়েছে উনিশ শতকের সাতের দশকে। তার আগে নয়। ব্যাপারটিকে যে কোনও পণ্ডিতই সন্দেহ করেননি—সেটাও এক

সন্দেহের ব্যাপার। আসলে পণ্ডিতেরা ভাড়া খেটেছিলেন—আর সে-ভাড়া খাটার মূল সর্ত ছিল কোনও ব্যাপারে সন্দেহ না করার।

প্রাসঙ্গিক একটা কথা বলে রাখা দরকার। দুনিয়ার কোনও জীবন্ত ভাষা পণ্ডিতেরা তৈরি করেননি। পণ্ডিতদের জন্যও কোনও জীবন্ত ভাষা তৈরি হয়নি। পণ্ডিতদের মনোপলি-মার্কা ভাষা থাকার কথাটা নেহাৎ-ই একটা মিথ। জীবন্ত কোনও ভাষা কারুর প্রশংসা পাওয়ার কল্যাণে বেঁচে থাকে না। তা না পেলেও তার বেঁচে থাকতে কোনও অসুবিধাই হয় না। তথাকথিত মৃতভাষা-গুলোর ব্যাপার-স্যাপার সবই উল্টো। পণ্ডিতদের প্রশংসায় ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে বসে থাকা ওইসব ভাষা স্রেফ পণ্ডিতদের প্রশংসার কল্যাণেই 'বেঁচেবর্তে' আছে যদিও তা শুধু কিছু পণ্ডিতম্মন্যদের মধ্যেই 'বেঁচে' আছে। 'মরা'র লক্ষণ নেই। যা জন্মায়নি তার মরার প্রশ্ন ওঠেই বা কি করে?

তথাকথিত মৃতভাষায় কেতাব লেখার নেপথ্যশিল্পী পণ্ডিতেরা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই বইপত্র লিখতেন। বিনিময়ে পেয়ে যেতেন নেপথ্যে থাকা রাষ্ট্রশক্তির বদান্যতা। নেপথ্য লেখকেরা আমৃত্যু গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার করতেন। মন্ত্রগুপ্তির বেড়াজাল টপকে বেরিয়ে আসার পথটাও থাকত বন্ধ। বেরিয়ে আসার বিপদও থাকত ভয়ঙ্কর।

## ইতিহাসের পণ্ডিতদের ক্ষমতা কম নয়

ইতিহাসের পণ্ডিতদের ক্ষমতা কম নয়। নির্ভেজাল গল্পকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে জানাতে—জলজ্যান্ত মিথ্যাকে সত্যি বলে প্রচার করতে কিংবা আধুনিককালে লেখা কেতাবকে প্রাচীন বলে চালিয়ে দিতে তাঁদের জুড়ি নেই। আর তাঁদের সে ক্ষমতা আছে বলেই ইতিহাসে এত মিথ্যা ঢুকে বসে আছে। ইতিহাসের উৎস-গ্রন্থগুলো প্রাচীন সেজে পণ্ডিতদের বোকা বানানোর এক উপকরণ হয়ে বসেছে। মজার কথা হল: এত মিথ্যাচার সত্ত্বেও ওই ইতিহাসটাকে দুনিয়ার পণ্ডিত কিন্তু প্রামাণ্য বলেই মেনে নিয়েছেন। এমনকি দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম ও রাজনীতির পণ্ডিতেরাও ওই ইতিহাসের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন না। দেখে শুনে মনে হয় পাণ্ডিত্য থাকার পূর্বসর্ত বুঝিবা ওই বিষয়টির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে অবিচল আস্থা আর অকুণ্ঠ বিশ্বাস থাকাটাই। ইতিহাসের প্রতি এই যে আনুগত্য—ইতিহাসটাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করার মধ্য দিয়ে এক পরম আত্মতৃপ্তি—এ সবই পণ্ডিতদের পেয়ে বসেছে। শ'দুয়েক বছরের ইতিহাস-চর্চার ফলশ্রুতি বলতে এইটুকুই। পণ্ডিতদের কাছে সেইটুকুই পরম পাওয়া। কারণ ওইসব মেনে নেওয়ার জন্যই তাঁদের নামডাক বেড়ে যায়। বেড়ে যায় পাণ্ডিত্যের আসরে প্রতিপত্তি।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। ইতিহাসটা আসলে রাষ্ট্রের উদ্যোগে বানিয়ে রাখা একটা মতলব ছাড়া আর কিছুই নয়। আর তাই রাষ্ট্রের সুনজরে থাকার নিশ্চয়তা কিংবা রাষ্ট্রের তরফ থেকে সুযোগসুবিধা আদায় করে নেওয়ার গ্যারান্টি যে ওই ইতিহাসটাকে মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়েই আসবে—এতে আশ্চর্যের কি আছে? এস্‌টাব্লিশ্‌মেন্টের বিরুদ্ধে না যাওয়াটাই যে বুদ্ধিমানের কাজ। সরকারী প্রচার-মাধ্যমের আনুকূল্য ইতিহাসের পণ্ডিতদের

পাণ্ডিত্যের দিগ্বিজয়ে যে কতটা সাহায্য করে তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। এ-ত' গেল ব্যক্তির তরফ থেকে ইতিহাস মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা। এর চেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার সব রাষ্ট্রও নির্দ্বিধায় ওই ইতিহাসটাকে প্রামাণ্য বলেই মেনে বসে। মতাদর্শের দিক দিয়ে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে ফারাকই থাক না কেন—ইতিহাসটাকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা সব রাষ্ট্রেই রাখা হয়। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সেমিনার বসে বিষয়টিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই। এমনকি ধর্মকে গুরুত্ব দেয়না এমন সব রাষ্ট্রও প্রাচীন সব ধর্মের জয়জয়কারের গল্পগুলোকে মেনে নেয়। ধর্মের বুজরুকিগুলোকে প্রাচীন বলেই ভেবে বসে। আর তাইতেই আসল কাজটা হয়ে যায়। মিথ্যাগুলো বেঁচে থাকে।

আসলে পণ্ডিতদের বক্তব্যসম্পর্কে সন্দেহ করাটা রীতিবিরুদ্ধ বলেই তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কেউই প্রশ্ন তোলেননা। তাছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে রাষ্ট্রের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য দানের মধ্যে যে কোনও মতলব থাকতে পারে—তাও কেউ সন্দেহ করেন না। সব পণ্ডিত আর সব রাষ্ট্র যখন ওই ইতিহাসটাকে সত্যি বলে প্রচার করছে তখন কি তা মিথ্যা হতে পারে? সবাই যেটাকে সত্যি বলছে সেটাকে মিথ্যা বলি কোন্ যুক্তিতে? সাধারণ লোক এই যুক্তিতেই সব কিছু মেনে নেন। ইতিহাসটাকে কে যেন বলেছিলেন 'lie agreed upon'। এর চেয়ে ভালো সংজ্ঞা হয়না।

ইতিহাস শেখানোর নামে ওইসব মিথ্যা সারা দুনিয়া জুড়েই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কোমলমতি শিশুদের মনটাকেও প্রভাবিত করা হয়। বাধ্যতামূলকভাবে ওই ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা হয় শিক্ষাপর্বের একেবারে শুরু থেকেই। মগজধোলাইপর্বটা শুরু হয়ে যায় প্রথম থেকেই। এই সময় মানুষের মনটা থাকে নরম। ভুল ধারণাগুলো গেঁথে যায়। 'সর্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ স্বাহা'-মার্কা মিথ্যা ধারণাগুলো ছাত্রদের গেলানো হয়। 'স্বাহা'-মানেও গেলা।

কথাটা মরাঠী। তমলুক-বাঁশবেড়ের পণ্ডিতদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেয়ে ওই সংস্কৃতে ঠাঁই পেয়েছে। পরে অজস্র মন্ত্রে। সে যাই হোক, কালক্রমে মিথ্যা ধারণাগুলো ছাত্রদের মনে পোক্ত হয়ে বসে। ধারণা থেকে জন্ম নেয় বিশ্বাস যা যুক্তিতর্কের ধার ধারেনা। মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আর্য-মহিমার গল্প—ইহুদি-বিদ্বেষ চাগাড় দিয়ে ওঠে এমন সব গল্প—জাতীয়তাবাদ উস্‌কে দেওয়ার উপযোগী গল্প—ধর্মের জন্য রক্ত গরম হয়ে ওঠে—আঞ্চলিকতাবাদের সুড়সুড়ি দেওয়া যায়—এমন অনেক গল্পও ওই ইতিহাসে রাখতে হয়। ভগবানদের নামেও কম ভূতুড়ে গল্প লেখা হয়নি। ঈশ্বরবাদী বেদান্তবাদীদের দল নিজেদের নৈষ্কর্ম আর অপদার্থতার দায়টাও ওই ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে দায়মুক্ত হয়েছেন। আর দায়মুক্ত হয়ে মাতব্বর ব্যক্তিত্বগুলো নিজেরাই মূর্তিমান ইতিহাস হয়ে বসেছেন। ইতিহাস শুধু ভূতই পুষে রাখেনি—রেখেছে অনেক অদ্ভুতকেও।

ইতিহাসে পুষে রাখা হয়েছে অনেক ভেজালও। ইতিহাসের সঙ্গে ধর্মের ভেজাল একটু বেশি মাত্রায় রাখতে হয়েছে। সে ভেজাল ইতিহাসটাকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছে। অর্ধশিক্ষিতদের ত' কথাই নেই—শিক্ষিতদেরও বেশ বড় একটি অংশের ওপরে ধর্মের আবেদন কিঞ্চিৎ বেশি। এদেশে ধর্মের পণ্ডিত সেজে মহাপুরুষ বনে যাওয়া যায়। রাজনীতির পাণ্ডারাও তিরুপতিতে, বেলুড়ে হত্যে দেন। মানুষ ক্ষেপানোর কাজে রাজনীতির নোংরা খেলায় ধর্মজীবিরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ধর্মের প্রসঙ্গ একটু বেশি থাকাতে ইতিহাসটা ধর্মের পণ্ডিতদেরও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

ভাষাতত্ত্বের নামেও প্রচুর মিথ্যা ওই ইতিহাসে রাখা হয়। 'ভগবানদের মাতৃভাষা' সংস্কৃতে যা কিছু লেখা হয়েছে সেগুলোকে ইতিহাসের আগমার্কা কাঁচা মাল হিসাবে সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরাই। সে-ভাষায় লেখা প্রাচীন বলে প্রচার করা গ্রন্থের ভাষার চরিত্রলক্ষণ বিচার করে সেসবের আনুমানিক

বয়স জানানোর খেলাও তাঁরাই খেলেন। নানান ধাতুর প্রাচীন কালে প্রচলিত থাকার গল্পকথার 'প্রমাণ' সরবরাহ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকেরাই। রোড্‌স দ্বীপের বিশাল ব্রোঞ্জমূর্তি (পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য্যের একটি) যেখানে ছিল বলে পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন তার ধারে কাছে এক টুকরো ব্রোঞ্জ যে পাওয়া যায়নি—ব্রোঞ্জের জন্মও যে তখনও হয়নি—১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দের আগে যে ব্রোঞ্জ তৈরির কথা কল্পনাও করা যেতনা—টিন ধাতুর আবিষ্কার যে ওই সময়েই হয়েছিল—সুনির্দিষ্ট অনুপাতে টিন, তামা ও দস্তা ব্যবহার করেই যে ওই ব্রোঞ্জ-নামক ধাতুসংকর বানানো সম্ভব হয়েছিল—১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দের আগে যে তা বানানো অসম্ভব ছিল—এই অষ্টম আশ্চর্যের কথা পণ্ডিতেরা চেপে গেছেন। কর্তৃপক্ষের সেইরকমই নির্দেশ ছিল। আর তা ছিল বলেই মোহেন্‌জোদাড়োতে ব্রোঞ্জ-মূর্তি গুঁজে রাখার দরকার পড়েছিল। তথাকথিত ব্রোঞ্জযুগ একটি জলজ্যান্ত মিথ্যার আর এক নাম।

ধর্ম, ভাষাতত্ত্ব ছাড়া ইতিহাসে রাখা হয় দর্শনের ছয়লাপও। ইতিহাস পড়তে গেলে ইচ্ছা থাক আর না থাক অতীতকালে জনগণকে মাতিয়ে রাখা দর্শনের মূল বক্তব্যগুলোও পড়তে বাধ্য হতে হয়। দেখে শুনে মনে হয় অতীতের মানুষগুলোর আর কোনও কাজকর্ম ছিল না। ধর্ম, দর্শন আর ভাষাতত্ত্ব নিয়েই বুঝিবা তাঁরা সারাজীবন কাটিয়ে দিতেন। ধর্মের কচকচি শুনতে, দর্শনের খিটকেল প্রশ্নের বিটকেল উত্তর খুঁজতে এবং ভাষাতত্ত্বের ভুল বোঝানোর পাণ্ডিত্যের খেলা দেখতে তাঁরা বুঝিবা জীবনসংগ্রাম থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারতেন। সে যাই হোক, ইতিহাসে ওই ভাষা আর দর্শনের ছয়লাপ থাকার দরুন ইতিহাসটা যে একটু বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠেছে তা স্বীকার করতেই হয়। আর একটা কথা দর্শনের কথা একটু বেশিমাত্রায় থাকাতে দর্শনের পণ্ডিতদের কাছেও ইতিহাসটা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

আসলে ধর্মের ভড়ং নিয়ে, দর্শনের ধূম্রজাল ছড়িয়ে আর

ভাষাতত্ত্বের ছাইপাঁশ উড়িয়ে অনেক মিথ্যার ধোঁয়াসা যে আমাদের দৃষ্টিটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেইটাই কেউ বোঝেননি। বোঝার কথা যাঁদের তাঁরা মিথ্যাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার কাজেই ব্যস্ত। ফাঁস করার গরজ নেই। এস্‌টাব্লিশ্‌মেন্টের সেবাদাস হিসাবে ওই কাজেই তাঁরা মনপ্রাণ ঢেলে দেন। আর এ-ব্যাপারে সব পণ্ডিতই সমান উৎসাহী। পণ্ডিতদের দলগত প্রয়াসটা সত্যিই দেখার মতো। ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত নিজের জ্ঞানের চৌহদ্দি ভুলে গিয়ে ধর্মের জয়গান গাইতে শুরু করে দেন। চৈতন্যের জীবনী লিখতে শুরু করে দেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ওই চৈতন্যের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেই। ভদ্রলোকটিকে সংস্কৃত পণ্ডিত সাজাতে গিয়েই নেপথ্য শিল্পী গোলমাল করে বসেছেন। ধর্মের পণ্ডিত ভাষাতত্ত্বের প্রশংসায় ডগমগ হয়ে ওঠেন—যদিও সে তত্ত্বের সবই তাঁর অজানা। দর্শনের পণ্ডিত ইতিহাসের সবকিছুকে সত্যি ভেবে নিয়ে দার্শনিক তত্ত্বের ক্রমপরিবর্তনের গল্প তৈরি করে বসেন। 'সুদূর' অতীতের দার্শনিকদের গল্পকথার সবটাই যে ইতিহাসের গোঁজামাল তা বোঝার চেষ্টাও তাঁরা করেন না। ইতিহাসের পণ্ডিত প্রাচীন দর্শনের কীর্তন গেয়ে বসেন যেন দর্শন শাস্ত্রটাও তাঁর নখদর্পনে। ধর্মের পণ্ডিত ইতিহাসের সবকিছুকে সত্যি ভেবে দেশের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধের আদিখ্যেতা প্রকাশ করে বসেন। তৈরি করে নেওয়া ইতিহাস পড়ে পুলকিত হয়ে তাঁরা বলে বসেন—'যে দেশের ইতিহাস আছে সে দেশের সব আছে। যার নেই তার কিছুই নেই।' কখনো ভগবানই ভরসা—কখনো-বা ইতিহাসই ভরসা-মার্কা কথা বলে এঁদের কেউ কেউ নতুন যুগের পত্তনের খোয়াবও দেখতেন। ধর্মের গুরু 'গুরু'-শব্দের জন্মের ইতিহাস আবিষ্কার করে বসতেন। 'গু'-মানে অন্ধকার আর 'রু'-মানে আলো অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারীকেই ত' গুরু বলে। গুরুবাদীদের হাতে পড়ে ইটিমলজির এই হালই হয়!!

একটা কথা বলে রাখা ভালো। অন্য সব পণ্ডিত ইতিহাসকে

গুরুত্ব দিলেও ইতিহাস নিয়ে মাতামাতির ব্যাপারে ধর্মের পণ্ডিতেরাই সবচেয়ে এগিয়ে আছেন। ইতিহাসটাকে এঁরা যেন লুফে নিয়েছেন। যা কিছু পুরনো ভেবে আনন্দ পাওয়া যায়—যা কিছু প্রাচীন বলে ইতিহাসের পণ্ডিতেরা প্রচার করে আসছেন তার মধ্যে যুক্তিযুক্ততা আরোপ করার—তথাকথিত মুনিঋষিদের লেখাগুলোকে পুরনো ভেবে অহেতুক গুরুত্ব দেওয়ার—যা কিছু সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃতে লেখা তার মধ্য থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আবিষ্কার করার মূঢ়তা ছোঁয়াচে রোগের মতোই এঁদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এঁদের কথা শুনলে মনে হয় জ্ঞানের শেষ কথা বুঝি আড়াই হাজার বছর আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে—তা সে দর্শনই হোক, ধর্মই হোক বা ভাষাতত্ত্বই হোক। আর ছোঁয়াচে বলেই রোগটা ধর্মধ্বজীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। অন্যদের মধ্যেও অল্পবিস্তর ছড়িয়েছে।

আসলে প্রাচীন বলে যা কিছু চালানো হচ্ছে তা যে ষোলো আনা প্রাচীন নয়—তার চেয়ে বড় কথা প্রাচীন লেখা হলেই যে তা যুক্তিযুক্ত হবে—এটা ভেবে নেওয়াটাই যে মারাত্মক ভুল—এইটাই ওই ধর্মধ্বজীরা বোঝেন নি। আড়াই হাজার বছর আগে লেখা—ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিরা দেবভাষার সার্টিফিকেট ঝোলানো সংস্কৃতে লিখে রেখেছেন—অতএব সেসব অভ্রান্ত—এমন কথা বলাটা নির্বোধদের পক্ষেই মানায়।

বুদ্ধির দিক দিয়ে দেউলিয়া হলেই যে এ-ধরনের কথা কেউ বলতে পারে—এই সোজা কথাটাই কেউ বোঝেন নি। বোঝেননি তথাকথিত মহাপুরুষদের কীর্তিকলাপটাও। সংশ্লেষণবাদী এইসব মহাপুরুষ যত না নতুন কথা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি লিখেছেন প্রাচীন মনে করে নেওয়া ছেঁদো কথা। যত না নিজের কথা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি বলেছেন মুনিঋষিদের নামে চালানো পুরনো (?) কথা। পাকা বলে মনে হয় এমন কথা কিছু বললেও ন্যাকা কথাও এঁরা কিছু কম বলেন নি। অন্তঃসারশূন্য অর্থহীন

কথা এবং স্ববিরোধী কথা বলার রোগও এঁদের অপ্রকাশ থাকেনি। সরকারী-বেসরকারী প্রচারমাধ্যম এঁদের মহিমাকীর্তন যতই করুন—এঁরা নিজেরা কিন্তু সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের ধার ধারেন নি। এঁদের বিচারের ধারাটাই বিচিত্র ধরনের। তথাকথিত পরম্পরার ওপরেই এঁদের যতটা বিশ্বাস—যুক্তির ওপর আস্থা ততটা এঁদের কোনও কালেই ছিল না। হিন্দু ধর্মের নামে যা কিছু চলছে তা সবই ভালো কারণ তা সবই 'সুদূর' প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সনাতন বলে কথা! যে সব সংস্কার হিন্দু ধর্মের নামে চলছে তা সবই ভালো কারণ স্বয়ং ভগবানই নাকি তা আমাদের দিয়েছেন—দুনিয়ার ভালো আর মন্দের সমষ্টি সব সময় সমান—ভালো বাড়াতে গেলে মন্দও বেড়ে যায়। অতএব ভালো কিছু করতে যেওনা। ভালো করার আমরা কে? কেবল ভগবানই আমাদের ভালো করতে পারেন—এই ধরনের জ্ঞান বিতরণ করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন আমাদের মনীষি-মহামনীষির দল। এঁদের পুষে রাখা সংস্কার—ভূতুড়ে লজিকের জগদ্দল পাথর আজকের মৌলবাদীদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। নড়বার লক্ষণ নেই। টেনে হিঁচড়ে না নামালে ও-ভূত নামে না। রাজনীতিকেরা ভূতগুলোকে নিয়ে মাঝেমাঝে লোফালুফি খেলেন। ওই পর্যন্তই। আসলে উনিশ শতকের আঁতেলি ইন্টেলিজেন্সের অপজাতক ধার্মিক শিশুদের ধর্ম-সর্বস্ব বক্তব্য বিশ শতকের রাজনৈতিক ইন্টেলিজেন্সের অপজাতক মৌলবাদীদের (এঁদের জন্ম ১৯৩৪-এ) মাথা বিগড়ে দিতে ভালই কাজে লেগেছে। ধর্মের আফিম আর রাজনীতির হেরোইন মিলে-মিশে সোনায় সোহাগা।

ইতিহাসের বক্তব্যের আবেদন ষোল-আনা সার্থক হয়েছে ধর্মধ্বজীদের ক্ষেত্রে—মৌলবাদীদের ক্ষেত্রে। অতীতপ্রেম, আর্যপ্রেম, চতুরাশ্রমপ্রেম, চাতুর্বর্ণপ্রেম, বেদপ্রেম, বেদান্তপ্রেম, সংস্কারপ্রেম, সংস্কৃতপ্রেম, হনুমানপ্রেম ও হিন্দুপ্রেম—দশাবতার প্রেমের ঠেলায় মনুষ্যপ্রেমটাই উবে যাওয়ার জোগাড়। ধর্মব্যবসায়ীরা ঈশ্বর শব্দের

সঙ্গে ইশ্বরকে মিলিয়ে কবিতা লেখেন। বাঁয়ে ঈশ্বর—ডাইনে ঈশ্বর—ওপরে-নীচে ঈশ্বর—করতে করতে এরা মানুষকেই নেপথ্যে রাখার ব্যবস্থা করে। রাজনীতির পাণ্ডারা অবশ্য মানুষের কথাই ভাবেন। তবে বিশেষ জাতের মানুষের কথাই একটু বেশি ভেবে বসেন, এই যা। এঁদের কেউ কেউ 'সবার উপরে পুত্র সত্য তাহার উপরে নাই'—কথাটাকেই মূল তত্ত্ব হিসাবে ধরে রেখেছেন। কেউ কেউ 'পুত্র' শব্দের বদলে কন্যা, জামাই, শালি বা ভায়রাভাই-ও করে নিয়েছেন। কেউ আবার সবগুলোকেই সত্য ঠাওরে নিয়েছেন। বাইবেলের God is true বাক্যটিকে উল্টেপাল্টে fruth is God নামক ভূতুড়ে বাণী লিখে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আনন্দ দেখে কে? চণ্ডীদাসকে উল্টে রাজনীতিকদের উল্লাসও কম নয়।

# অর্বাচীন পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'—আধুনিক একটি জালিয়াতি

মূলগ্রন্থ প্রকাশের আগেই তার অনুবাদের ব্যবস্থা প্রাচীন অন্য অনেক বইয়ের মতোই বৈয়াকরণ চূড়ামণি পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-র ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে। প্রকাশিত হয় ইংরিজিতে—সংস্কৃতে নয়। সংস্কৃত ভাষার সেরা ব্যাকরণ লেখা হল আদ্যন্ত ইংরিজি ভাষায়। বলা হল ওটা সংস্কৃত 'অষ্টাধ্যায়ী'র ইংরিজি অনুবাদ। মূল সংস্কৃত বইটি প্রকাশ না করে তার ইংরিজি অনুবাদটা আগেই কেন প্রকাশ করা হল— এ-প্রশ্ন কেউ তোলেননি। 'অরিজিনাল' বইটার দেখাসাক্ষাৎ নেই— তার অনুবাদ-ই-বা হল কি করে—এ-প্রশ্নও কেউ করেননি। সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। সংস্কৃত মূলগ্রন্থের টুকরোটাকরা কিছু অংশ ওই ইংরিজি অনুবাদে থাকলেও তার পুরো বয়ান তাতে রাখা হয়নি। ইংরিজি 'Astadhyayi'-র ভাষা, বাক্যবিন্যাস সবই উঁচু দরের। ব্যাকরণ বোঝানোর জন্য যা যা দরকার সবই ছিল সে-বইটিতে। ব্যাকরণের নামে ধাঁধা বানানোর কোনও ইচ্ছা যে নেপথ্যে থাকা ওই ইংরিজি বইটির লেখকের ছিলনা তা বলতেই হয়। উল্টো দিকে আদি 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে আগাগোড়া ধাঁধামার্কা ভাষায় বক্তব্য রাখার খেলা দেখানো হয়েছিল। খেলাটা বোঝে কার সাধ্য! দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা সেই ধাঁধার জট খুলতে গিয়ে রাজ্যের 'কারিকা' বানিয়ে নিতেন। সংস্কৃত-পড়ুয়াবা ওইসব 'কারিকা' পড়েই ওই পাণিনির মর্মোদ্ধার করতেন। ইংরিজি 'Astadhyayi'-তে ব্যাকরণগত কুটকচালি যাই থাকনা কেন ভূগোলের তাণ্ডবনৃত্য ছিলনা। ব্যাকরণ বোঝাতে গিয়ে কেউ ওই ভূগোল নিয়ে পড়েননা। পড়ার কথাও নয়। ইংরিজি বইটিতে স্থাননামের—

জায়গার নাম—নদীর নাম—পাহাড়-পর্বতের নাম—এককথায় ভৌগোলিক নামের তালিকা বা সে-সব নামের ব্যুৎপত্তিরহস্য প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়নি যা হয়েছিল পরবর্তীকালে প্রকাশিত সংস্কৃত 'অষ্টাধ্যায়ী'তে। আসলে ওই পাণিনি-কে মহাকালের 'ভারতীয় যিশু খ্রীস্ট' বানাতে গিয়েই ওই সংস্কৃত ব্যাকরণে 'ভূগোল' রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের কিছুটা প্রাক-পাণিনীয়—বেশ কিছুটা পাণিন্যোত্তর বলে চালানোর দরকার পড়েছিল। অমুক লেখক পাণিনির ব্যাকরণগত ফতোয়া মানেননি তাই তিনি তাঁর চেয়ে প্রাচীন—তমুক লেখক তা মেনে নিয়েছেন তাই তিনি তাঁরও পরের—এই ধরণের উৎকট যুক্তিপরম্পরা দিয়ে তথাকথিত প্রাচীন কালের লেখকদের কালানুপর্বিক অবস্থানের গল্পকথা—সোজা ভাষায় কে আগের-কে পরের—তা জানানোর ব্যবস্থা হত। ইনি পাণিনির দেওয়া ভৌগোলিক নামের বানান ভুল লিখেছিলেন তাই ইনি তাঁর পূর্ববর্তী—উনি পাণিনি-নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার করেছেন তাই উনি তাঁর পরবর্তী—এ ধরণের যুক্তি (!)-ও দেখানো হত। সে যাই হোক, এই রকমই একটি স্থাননাম ওই সংস্কৃত ব্যাকরণে রাখতে গিয়েই পাণিনি একটু গোলমাল করে বসেছেন। পঞ্জাবের একটি স্থাননামের খবর দিতে গিয়ে ভদ্রলোক তাঁর অর্বাচীনত্বই জাহির করে বসেছেন। মিথ্যার কিছু ফাঁকফোকর থেকেই যায়। এমনই একটি সহরের নাম তিনি ওই ব্যাকরণে রেখেছিলেন যার পত্তন হয় ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে। সহরটির নাম বন্নু যা সংস্কৃত ছদ্মবেশে 'বুণু' হয়ে বসেছিল ওই ব্যাকরণে (অষ্টাধ্যায়ী ৪/২/১০৩)। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে যে সহরের পত্তন হয়েছিল তার খবর তেরো বছর পরে প্রকাশিত সংস্কৃত 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে থাকতেই পারে। উনচল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত ইংরিজি বইটিতে তা থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। তবে ওই 'বুণু'-কে দেখে একটি সিদ্ধান্ত নিতেই হয় আর তা এই : সংস্কৃত 'অষ্টাধ্যায়ী'র লেখক শ্রীমান পাণিনি ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দেও বেঁচেছিলেন। তাঁকে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের লোক বা মুনি মনে করে নেওয়ার কোনও

কারণ নেই। দিকপাল পণ্ডিতেরা যাই বলুন না কেন—পাণিনি অর্বাচীন এক ব্যক্তি। 'অষ্টাধ্যায়ী' আধুনিক একটি জালিয়াতি।

## বেদের যুগেও পুলিশ ছিল

বেদের যুগেও পুলিশ ছিল। ছিল গোয়েন্দা। ছিল পুলিশের প্রতিশব্দ—গোয়েন্দার পরিভাষা। অন্তত: দিকপাল সব পণ্ডিত এই কথাই বলে আসছেন। বলে আসছেন শ' খানেক বছর ধরে। পুলিশ ছাড়া কি দেশ চলে? পুলিশের প্রতিশব্দ যে থাকতেই হবে নাহলে রাজনীতিকদের বে-আইনী নির্দেশ মেনে চলার—ক্ষেত্রবিশেষে রাজনীতিকদের পরিচালনা করার—নিজেদের বক্তব্যটাকে মন্ত্রী-নামক অধস্তন কর্মচারীকে দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করার কাজে ওস্তাদ পুলিশ নামক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ যে সে-যুগে ছিলেন তা বলা যাবে কি করে? 'পুলিশ'-এর বৈদিক প্রতিশব্দ বানাতে গিয়ে বৈদিক বাচস্পতি বেশ একটু খেলা খেলেছিলেন। খাঁটি ইংরিজি 'foolish' থেকে সংস্কৃত 'বালিশ' বানানো হলেও 'police'-এর উচ্চারণ চুরি করে বৈদিক কোনও শব্দ বানানো হয়নি। অন্য একটি কায়দা নেওয়া হয়েছিল। 'পুলিশ'-এর কাজটা কি? সন্দেহভাজন হোন বা না হোন—দোষী কিংবা নির্দোষ লোককে 'জ্যান্ত ধরে এনে কব্জায় রাখা'—অর্থাৎ grip-এর মধ্যে রাখা—এইটুকুই তাঁর কাজ। এর কমও নয়—বেশিও নয়। কারুর কথায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া—কিংবা তাঁর বিচার করা বা থানায় তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলা কোনোটাই তাঁর কাজ নয়। বিচার করা বা শাস্তি দেওয়াটা বিচার বিভাগের ওপরেই বর্তায়। তবে বিচিত্র পুলিশমন্ত্রী থাকলে স্বতন্ত্র কথা। সেক্ষেত্রে ওইসবই পুলিশের মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যার নাম থানেশ্বর—তারই নাম কুরুক্ষেত্র। থানার ঈশ্বরের সামনেই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে যায়। বৈদিক পণ্ডিতেরা, শুনতে

কিছুটা আশ্চর্য লাগলেও ইংরিজিটা মোটামুটি জানতেন। বনারস-গাজিপুরের উনিশ শতকের বাসিন্দারা ইংরিজি জানবেন না তাইকি কখনো হয়? প্রকাশ না করলেও ভাবপ্রকাশের কাজে একটু অসুবিধায় পড়লেই ইংরিজি শব্দের আদলে শব্দ বানিয়ে নিয়ে—'Somehow'-কে 'সমহ' সাজিয়ে কাজ চালিয়ে নিতেন। জ্যান্ত বা জীবন্ত অর্থে মরাঠী 'জীব'-শব্দ আর ইংরিজি 'to grip' ক্রিয়া থেকে বৈদিক 'গৃভ'-ধাতু বানিয়ে ইঙ্গ-মরাঠী জোড়কলম 'জীবগৃভ' শব্দটা তাঁরা বানিয়ে নিয়েছিলেন। নিয়েছিলেন police-এর প্রতি-শব্দ হিসাবে চালানোর জন্য। বৈদিক পণ্ডিতদের জবাব নেই।

যে পুলিশের প্রতিশব্দ বানাতে গিয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা হিমসিম খেয়ে গেছেন—আরক্ষা-মার্কা দুবক্ষর সব প্রতিশব্দ খাড়া করেছেন—সেই পুলিশের বৈদিক প্রতিশব্দ বানানোর বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়। তবে তাঁদের প্রাচীনকালের মানুষ বলে স্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না। আধুনিক একটি জালিয়াতির কারিগর হিসাবেই তাঁদের সনাক্ত করে নিতে কোনও অসুবিধা হয় না।

## মিথ্যা বারবার বলতে বলতেই ইতিহাস হয়ে ওঠে

মিথ্যা বারবার বলতে বলতেই সত্যি হয়ে ওঠে—এ-কথা বলেছিলেন জার্মানীর গোয়েবেল্‌স্‌ সাহেব। প্রোপাগাণ্ডার নামে গণ্ডায় গণ্ডায় মিথ্যা বলতে তাঁর না আটকালেও তাঁর ওই কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। আসলে ওটা একটা 'তত্ত্ব' আর ওই 'তত্ত্ব'-টাকে কাজে লাগিয়েই বানানো হয়েছিল রাজ্যের মিথ্যা। যার অনেক নাম। প্রাচীন ইতিহাস—প্রাচীন দর্শন—প্রাচীন ধর্ম—প্রাচীন ভাষা—প্রাচীন রাজনীতি—প্রাচীন সাহিত্য। এককথায় 'প্রাচীন' ষড়যন্ত্র বললেও খুব একটা ভুল হয়না।

আসলে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের নামে সাম্রাজ্যবাদী মতলবের সহযোগিতা করতে কম পণ্ডিত এগিয়ে আসেননি। নানান রাষ্ট্র থেকে নামী নামী পণ্ডিত সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্যোগে বানানো এক নেপথ্য কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন। কেউ স্বনামে—কেউ বেনামে। বিনিময়ে তাঁরা পেয়ে গেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অকুণ্ঠ আর্থিক বদান্যতা। ইতিহাসের উৎস-গ্রন্থ বানানোর এক মতলবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সেই নেপথ্য কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল। অনেক জ্ঞানতপস্বীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতি অনেক মিথ্যাকেই লোকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছে। কারণ মিথ্যাগুলোকে বারবার বলা হয়েছে। বলার ব্যবস্থা হয়েছে। আসলে মিথ্যা কখনোই সত্যি হয়ে ওঠেনা। প্রচারের গুণে লোকে সত্যি বলে মনে করে বসে। ঘটনা হচ্ছে এই। আর ওইসব মিথ্যার বেশির ভাগই তৈরি হয়েছিল ওই গোয়েবেল্‌স্‌-এর জন্মের অনেক আগেই। তাই বলতেই হয় 'তত্ত্ব'-টা নতুন নয়। গোয়েবেল্‌স্‌-এর কৃতিত্ব শুধু এই যে তিনি সত্যি কথাটা অংশতঃ ফাঁস করে দিয়েছিলেন। অংশত বলার কারণ তাঁর কথায় কিছু ফাঁকও ছিল। সব মিথ্যাই সত্যি হয়ে ওঠে না। সব মিথ্যাকে সত্যি বলে প্রচার করা হয়না। সত্যি বলে প্রচার করা হয় সেইসব মিথ্যা যা রাষ্ট্রের উদ্যোগে বানিয়ে রাখা হয়—বাঁচিয়ে রাখা হয়।

ব্যক্তির তৈরি মিথ্যা ধোপে টেঁকেনা। রাষ্ট্রের বানানো মিথ্যা দিব্যি বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার কারণও আছে।

এক, মিথ্যা বানানোর নেপথ্য-শিল্পীদের মন্ত্রগুপ্তির জালে জড়ানোর ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতেই থাকে। ব্যক্তির হাতে থাকেনা। রাষ্ট্রের উদ্যোগে বানানো মিথ্যাগুলো গোপনীয় কর্মকাণ্ড হিসাবেই সারা হয়। কাকপক্ষী টের পায় না। গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তরফ থেকেই করা হয়।

দুই, রাষ্ট্রের হাতে এমন কতকগুলো ক্ষমতা থাকে যা ব্যক্তি বিশেষের থাকে না। মিথ্যা বানানোর কাজে—মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে টাকা-পয়সার অভাব রাষ্ট্রের হয় না। বাজেট-বহির্ভূত খরচ করার স্বাধীনতাও রাষ্ট্রের থাকে আর তার জন্য জবাবদিহি করার প্রশ্নও ওঠে না।

তিন, নানান রাষ্ট্রের নাম জড়িয়ে গল্প লেখার ক্ষেত্রে—মিথ্যা বানানোর ক্ষেত্রে—সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটা গোপন সমঝোতা গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মন্ত্রগুপ্তির খেলা চলে। এক রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স দপ্তরের সঙ্গে অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স দপ্তরের গোপন সমঝোতার ফলেই রাষ্ট্র-ঘটিত বা সরকার-ঘটিত কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি কিংবা নেতাজি-মার্কা গল্পগুলো চাপাচোপা দিয়ে রাখা হয় কিংবা বারবার প্রচার করার মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়। এমন কি রাষ্ট্রশক্তি বিরোধীপক্ষের হাতে এসে গেলেও সেসব মিথ্যা ফাঁস করা হয়না। রাষ্ট্রীক মতাদর্শের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পরেও তা ফাঁস করার কথা কেউ ভাবতেও পারেন না। কারণ ইন্টেলিজেন্স-এর তৈরি তথাকথিত 'ক্লাসিফায়েড সিক্রেট' জানার অধিকার প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকলেও তা ফাঁস করার অধিকার তাঁরও থাকেনা। আর তা ফাঁস করার শাস্তিও থাকে মারাত্মক। আর তাই বোফর্স ধামাচাপা পড়ে যায়। শেয়ার কেলেঙ্কারীও চাপাচোপা দিয়েই রাখা হবে। রাখা হবে রাষ্ট্রেরই উদ্যোগে। কোন্ মুখ্যমন্ত্রীর—কোন্ প্রধানমন্ত্রীর সুইস-ব্যাঙ্কে কত

টাকা জমা আছে তা-ও কাকপক্ষী জানতে পারবে না। মো. ক, গান্ধীর নামে, জে. নেহেরুর নামে, এস. সি. বোসের নামে ইণ্টেলিজেন্সের তৈরি গল্পগুলোকেই বারবার প্রচার করার মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে—ব্যবস্থা থাকবে। ওগুলোকে ইতিহাস বলে চালিয়ে যাওয়া হবে। ইতিহাসের তাবড় পণ্ডিতেরা তাঁদের স্তুতিগান গেয়েই কর্তব্য পালন করবেন। 'কেউ জাতির পিতা' সেজে থাকবেন ত' কেউ পণ্ডিত চূড়ামণি—কাউকে আবার 'আপাদমস্তক দেশপ্রেমিক' বলেও কেউ কেউ ভেবে বসবেন। সবই যে বানানো চরিত্র—সবই যে যথানিয়োজিতোঽস্মি তথা করোমি'—মার্কা ভূমিকায় অভিনয় করে হাত পাকিয়েছেন—এইটাই কেউ বোঝেননি।

রাষ্ট্রের তৈরি মিথ্যা—রাষ্ট্রের তৈরি গল্প এ-সবই মিলেমিশে কালক্রমে ইতিহাস হয়ে বসে—হয়ে বসে বারবার বলতে বলতেই। আর একবার ইতিহাসে ঢুকে বসতে পারলে মিথ্যাগুলোকে তাড়ায় কার সাধ্য! জ্ঞানের জগতে মৌরসী পাট্টা নিয়ে থেকে যায়। গোয়েব্‌ল্‌স্‌-সাহেব যে কাজ করে অপবাদ কুড়িয়েছেন সেই একই কাজ করে রাষ্ট্র ইতিহাস বানিয়েছে। সে-ইতিহাসকে ওল্‌টাতে গেলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। এছাড়া পথ নেই।

## সংস্কৃত-জানা পণ্ডিতদের দিয়ে অনেক কাজই করানো হত

নেপথ্যে থাকা সংস্কৃত-জানা পণ্ডিতদের ওপরে যে কত রকমের দায়িত্ব চাপানো হত তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁদের দিযে লেখানো হত ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর নানান 'গ্রন্থ'। কাউকে দিয়ে 'মূল'-গ্রন্থ—কাউকে দিয়ে তার টীকাটিপ্পনী। কেউ সাজতেন ব্যাস বা বাল্মীকি—কেউ সাজতেন সায়নাচার্য বা মহীধর। কাউকে দিযে লেখানো হত শিলালিপি বা তাম্রশাসনের বয়ান যেগুলোকে পরবর্তীকালে ইতিহাসের কাঁচামাল বলে চালানো হত। কাউকে দিয়ে লেখানো হত পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ট-মার্কা নামের ভাষায় কেতাব লেখানোর পূর্বকৃত্য হিসাবে বানিয়ে রাখা সংস্কৃত 'আদিরূপ' যাকে রসিকতা করে বলা হত 'ছায়া' আর তার ছায়া-অবলম্বনে বানানো কাণ্ডকারখানাটাকে বলা হত 'মূল'। কোনটা যে কায়া আর কোনটা যে ছায়া বোঝে কার সাধ্য! ফটোর 'পজিটিভ' বানাতে গেলে যেমন 'নেগেটিভ' বানিয়ে রাখতে হয় ঠিক তেমনি পালি-প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষায় কিছু লেখানোর আগেই সেসবের 'ছায়া' বানিযে রাখতে হত। 'নেগেটিভ' থাকলে ফটো প্রামাণ্য হয়ে ওঠে। ফটোয় কিছু কারসাজি করা হযেছে কিনা তা জানতে গেলে 'নেগেটিভ'-টা দেখতেই হয়। সংস্কৃত 'নেগেটিভ' পালিপ্রাকৃত 'পজিটিভ'-গুলোকে প্রামাণ্য বলে চালাতে সাহায্য করত। তথাকথিত চর্যাপদের সংস্কৃত 'ছায়া' বানিয়ে রাখার প্রয়োজন ওই কারণেই ঘটেছিল। ঘটেছিল ধম্মপদের সংস্কৃত 'ছায়া' বানানোরও।

পালি-প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষায় লেখার ট্রেনিং নেওয়া পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে লেখা 'আদিরূপ' তথাকথিত ছায়ার যান্ত্রিক ও ফরমুলা-মাফিক বিদিগিচ্ছিরি বিকৃতির মধ্য দিয়ে তৈরি করে নিতেন

পা-পা-অ-অ মার্কা ভাষায় লেখা উত্তররূপ যার নাম দেওয়া হয়েছে পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি। সংস্কৃত নামক ভাষারাজ্যের 'নিখুঁতি'টা যে কালক্রমে পচে গলে ভেবড়ে গিয়ে (ভাষাতাত্ত্বিকদের পরিভাষায় যার নাম দেওয়া হয়েছে decomposition) উদ্ভট ওইসব ভাষার উদ্ভব হয়েছিল—একথা পণ্ডিতদের সকলেই অনবরত বলে চলেছেন। মিথ্যা কথা বলতে আর যাঁদেরই ক্লান্তি আসুক পণ্ডিতদের আসে না। সে যাই হোক, পরবর্তীকালে পচাগলা বীভৎস কুৎসিৎ ওইসব ভাষা থেকে প্রকৃতির কোন খেয়ালে ঔদ্ভট্যমুক্ত হয়ে পরিণত ও সুন্দর আধুনিক সব উত্তর ভারতীয় ভাষার সৃষ্টি হল—এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা কোনও কথাই বলেননি। বলেননি তার কারণ এস্টাব্লিশ্‌মেন্টের সেবাদাস হিসাবে ভাষার, সমাজের, সভ্যতার, সংস্কৃতির কালানুপর্বিক অবক্ষয়ের গল্পটাই তাঁরা ফেঁদেছিলেন। ফাঁদতে হয়েছিল কারণ নেপথ্য প্রযোজকদের সেই নির্দেশই ছিল।

অতীতের কল্পিত মিলেনিয়াম-এর সৃষ্টিকর্তারা কোনও কিছুর ক্রমোন্নতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কেই সন্দিহান সেজেছিলেন। ভাষার পচনের গল্প আর পচনের মধ্য দিয়ে তার নাতি-পুতির জন্মের গল্পটাই তাঁরা বানাতে বলেছিলেন। পচনের মধ্য দিয়ে যে ভাষার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা—নাতিপুতির জন্ম হওয়াটা যে অবাস্তব কল্পনা হয়ে দাঁড়ায়—এই সোজা কথাটা বুদ্ধিভ্রংশ পণ্ডিতেরা বোঝেননি।

আসলে প্রাচীন যুগে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত থাকার কথাটাকে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যই ওই ভাষার ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পালিপ্রাকৃত ইত্যাদি ভাষার জন্মের গল্পটা বানাতে হয়েছিল। ভাষাটাকে এত প্রাচীন যুগে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে ওই গল্প না বানালে এবং সে-গল্পের প্রমাণ না রাখতে পারলে লোকে সন্দেহ করে বসত। সন্দেহ করত ওই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কেই। ক্রমপরিবর্তন সময়সাপেক্ষ কর্মকাণ্ড। ধাপে ধাপে এত সব পরিবর্তন যে ভাষাটার ঘটে গেল

তা কি প্রাচীন না হয়ে যায়? সন্দেহবাদীরাও এই যুক্তিতেই সংস্কৃতকে প্রাচীন ভেবে বসলেন।

পালি-প্রাকৃত ভাষার উদ্ভাবনা হল। ওইসব ভূতুড়ে ভাষার বই কাদের দিয়ে লেখানো হবে এইটাই মূল সমস্যা হিসাবে দেখা ছিল। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। সংস্কৃত সাহিত্য বানাতে যেমন প্রধানতঃ বাঙালী পণ্ডিতদের কাজে লাগানো হয়েছিল তেমনি পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষার সাহিত্য বানাতে গিয়েও ওই বাঙালীদেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছিল ইতিহাসের কাঁচা মাল বানানোর নেপথ্য প্রযোজকদের। ব্রিটিশ সরকারের অাঁতেলি এবং রাজনৈতিক ইণ্টেলিজেন্সের খেলায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক বাঙালী নেপথ্য শিল্পীর অভাব কখনোই হয়নি।

# রামায়ণ-মহাভারত ও যীশুখ্রীস্ট

রামায়ণ-মহাভারত যে যীশু খ্রীস্টের জন্মেরও আগে লেখা হয়েছিল—একথা প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতদের সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের এই স্বীকৃতির ফলে আর কিছু হোক আর না হোক ওই যীশু খ্রীস্টের ঐতিহাসিকত্ব জাহির করার কাজটাই সামান্য একটু এগিয়েছে। বই দুটির রচনাকাল-রহস্য প্রকাশ করার কাজটা মোটেই এগোয়নি। কানু ছাড়া গীত নেই। যীশু ছাড়া ইতিহাস হয়না। কেউ তাঁর আগের—কেউ তাঁর পরের। যীশুকে মেনে নিন—ইতিহাস লেখা শুরু করুন। ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানার পূর্বসর্ত বুঝিবা ওই মহাপুরুষের ঐতিহাসিকত্ব মেনে নেওয়া। আর তা মানতে গিয়েওই ডায়নিসিউস্‌-কেও মানতে হয়েছে। কারণ প্রথম ব্যক্তির 'আবির্ভাব'-এর প্রমাণটা যে দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বের ওপরেই নির্ভরশীল। প্রথমটিকে প্রমাণসিদ্ধ বানানোর জন্যই যে ওই চরিত্রটির উদ্ভাবনার আয়োজন ও প্রয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয় চরিত্রটি যে ওই 'যীশুখ্রীস্ট'-কে স্বচক্ষে দেখেছেন। যীশুর কর্মকাণ্ডের তিনি যে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। পর্তুগীজমূলক 'যীশু' আর ইংরিজিমূলক 'খ্রীস্ট' দুয়ে মিলে মহামানবের নাম ঠিক হল।

দ্বিতীয় চরিত্রটির নাম কি দেওয়া যায়? ইংরিজি ব্যক্তিনাম 'ডেনিস'-কে ল্যাটিন সাজাতে গিয়ে তৈরি হয়ে গেল ডায়নিসিউস্‌ এই বিচিত্র নামটি। সব মানুষের নাম উস-ভাগান্ত হবে—সব ধাতুর নাম উম্‌-অন্ত হবে—সব দেশের নাম 'ইআ' দিয়ে শেষ হবে—এমন বিচিত্র ও উদ্ভট বিধান জীবন্ত কোনও ভাষায় না থাকলেও ওই ল্যাটিন 'ভাষা'য় ছিল এবং 'ভাষা'টা নাকি এককালে ইউরোপের বিরাট একটি অংশে 'আজন্ম মৃতভাষা' হিসাবে চালু ছিল। চালু ছিলনা শুধু 'ভাষা'টির জন্মস্থান ইটালিতে। অন্তুতঃ

পণ্ডিতদের এই রকমই ধারণা। সে যাই হোক, বিশুদ্ধ একটি চরিত্র বলেই ইংল্যাণ্ড থেকে তাঁর নাম আমদানি করার দরকার পড়েছিল। আদর্শ একটি চরিত্র বলেই পাক্কা দু'শ বছর তিনি বেঁচেছিলেন—বাঁচতে পেরেছিলেন। একশ' খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে জন্ম—একশ' খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু। টায়টায় দুশ' বছর তিনি বেঁচেছিলেন স্রেফ ওই 'মহান পরিত্রাতা'কে ইতিহাসের আলোকে আলোকিত করে তুলতে। আক্ষরিক অর্থে নিজের জীবনের মধ্যভাগে তাঁকে চাক্ষুষ দেখার দুর্লভ মুহূর্তটিকে মহাকালের সন্ধিক্ষণ বানানোর দায়িত্বে থাকা ওই চরিত্রটির অবদান কিন্তু কম নয়। 'ইতিহাসের জনক'-বলে প্রচার করা হেরোডোটাস্-এর চেয়েও বেশি। ওই সন্ধিক্ষণ না থাকলে ধনাত্মক-ঋণাত্মক অব্দের কালপঞ্জী যে লেখাই যেতনা। হেরোডোটাস নিজেও ইতিহাসের পিতৃত্বের দাবীদার ছিলেন না। তিনি সে কৃতিত্ব হোমার-এর প্রাপ্য বলে জানিয়েছিলেন। জানিয়ে ভুল তিনি করেননি। হোমার-নামটা খাঁটি ইংরিজি। আসলে ইতিহাস তৈরির আদি কারখানাটা যে ওই ইংল্যাণ্ডেই বানানো হয়েছিল—ইঙ্গিতে সেই কথাটাই তিনি জানিয়েছিলেন। কল্পিত একটি চরিত্রকে দিয়ে অন্য এক জীবন্ত চরিত্রকে 'ভারতীয় জাতির জনক' বলে চালানোর চেষ্টা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। আসলে ইতিহাস কিংবা জাতির জনক-মার্কা কথাগুলো অর্থহীন। ওই জনকত্বের দাবীকে গুরুত্ব দিতে গেলে রাষ্ট্রপোষ্য ইতিহাস-শিল্পের নেপথ্য কারিগরদের কিংবা ইন্টেলিজেন্সের লোকজনদের ইতিহাসের কিংবা জাতির পিতামহগণ বা প্রপিতামহবৃন্দ বলে মেনে নিতে হয়। কারণ ইতিহাসই বলুন আর ব্রিটিশ আমলের রাজনৈতিক চরিত্রগুলোর কথাই ধরুন সবই রাষ্ট্রের গোপন কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি। কোনওটা আঁতেলি—কোনওটা বা রাজনৈতিক ইন্টেলিজেন্সের। শুনতে রূঢ় শোনালেও ঘটনা হচ্ছে এই।

আর একটা কথা। ইতিহাসের জনক বা প্রথম রচয়িতা হওয়ার

সুযোগ ওই হেরোডোটাস পাবেন কি করে? তাঁর লেখা বলে প্রচার করা বই বার করার অনেক আগেই যে ইহুদিদের ইতিহাসটা লেখা হয়ে গিয়েছিল। দুনিয়ার প্রাচীনতম ইতিহাসটা যে ওই ইহুদি-জাতি সম্পর্কেই বানানো হয়েছিল। গ্রিস, 'রোম', মেসোপটেমিয়া, ইজিপ্ট, চিন, ভারতের ইতিহাস লেখা হয়েছে পরে। ইহুদি জাতির ইতিহাসটাকে এত প্রাচীন যুগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যা ভাবলে অবাক হতে হয়। অবাক হতে হয় ওই হিব্রু ভাষার মৃত্যুর নিখুঁত সাল-তারিখ—ওই অ্যারেমীয় ভাষার মরণের দিনক্ষণ জানানোর খেলা দেখে। খেলাটা যে কেউ বোঝেননি—এটাই আশ্চর্যের।

আসলে ইতিহাসে আমাদের হাতেখড়ি হয়েছিল ইহুদি নীতি-শাস্ত্র, খ্রীস্টধর্ম আর হিব্রুভাষার মহিমাকীর্তনের মধ্য দিয়ে। দুনিয়ার যা কিছু মহান তার সবই যে ভূমধ্যসাগরের পূব তীরের ইহুদিদেরই সৃষ্টি—দুনিয়ার সব ভাষার আদি জননী যে ওই হিব্রু ভাষা—দুনিয়ার নীতিশাস্ত্রের জন্মদাতা যে ওই ইহুদিরাই ছিলেন—এই ধরনের উদ্ভট সব তত্ত্ব প্রচার করার মধ্য দিয়েই প্রাচীন যুগের ইতিহাস নামক মিথ্যার দিগ্বিজয়ী জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। শুরু হয়েছিল আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। একাধারে ঐতিহাসিক তথ্যে ভরা এবং ধর্মনীতিশিক্ষার উপযোগী ওল্ড ও নিউ টেস্টামেণ্ট লেখানের আয়োজন হল ওই সময়েই।

প্রাচীন ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ বলে বইদুটোকে চালানো হল। জ্ঞানের জগতে ধর্মের হাত ধরেই ইতিহাসের হামাগুড়ি শুরু হল। মৃতভাষা, ভূতুড়ে ভাষাতত্ত্ব আর ওইসব মৃতভাষায় লেখা ধর্ম ও দর্শনের ওপর মহিমা আরোপ করার খেলা শুরু হল।

প্রাচীনকালের লেখা বলে চালানো মূল কেতাবগুলোর কোনও-টারই প্রকাশ আঠারো শতকে হয়নি। হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে। ব্যাপারটাকে কেউ সন্দেহ করেননি। করার দরকার ছিল। ল্যাটিন, প্রাচীন গ্রিক, হিব্রু, অ্যারেমীয় ইত্যাদি তথাকথিত মৃত ও আড়ষ্ট-মার্কা ভাষায় লেখা এবং প্রাচীন সংস্কৃতির

ধারক ও বাহক বলে প্রচার করা বিশ্ববিখ্যাত বইগুলোর অনুবাদ-গুলোরই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল আগে। মূল গ্রন্থগুলোর প্রকাশ ঘটতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। মূল গ্রন্থের দেখাসাক্ষাৎ নেই—অনুবাদগুলো হল কি করে—এ-প্রশ্নের গুরুত্ব থাকলেও কোনও পণ্ডিতই তা তোলেননি। তুললে রহস্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

আসলে রহস্যটা কি? আসলে নেপথ্যে উল্টো কাণ্ডটাই ঘটে-ছিল। আধুনিক ভাষায় লেখা মূল কেতাব আগে লেখানো হয়েছিল পরে শিখিয়ে পড়িয়ে পণ্ডিতদের দিয়ে সে-সবের তথা-কথিত মৃতভাষায় অনুবাদ করানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। কৃত্রিম ভাষায় অনুবাদ করাটা সময়সাপেক্ষ ছিল। ওইসব ভাষায় লেখানো কেতাবগুলোকে প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ বলে চালানোর জন্যই ওগুলোকে প্রাচীন বলে জানানোর দরকার পড়েছিল।

ই‍িহাসের তথাকথিত উৎসগ্রন্থগুলোকে প্রামাণ্য বলে মেনে নিয়েছেন দুনিয়ার পণ্ডিত আর তা মেনে নিয়ে পুরো ইতিহাস-টাকেই তাঁরা পরম নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য জ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে মেনে নিয়েছেন। পণ্ডিতদের কেউই ওই ইতিহাসের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেননি। উল্টে ওইসব উৎসগ্রন্থ থেকেই তাঁরা তাঁদের তত্ত্বের সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে নিয়েছেন। এমনকি মার্কস্ সাহেবও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। 'এসিয়াটিক মোড অফ প্রোডাক্শনে'র ভ্রান্ত তত্ত্ব তিনি দিয়েছিলেন ওই বার্নিয়ের-এর লেখা বইটিকে প্রামাণ্য বলে মনে করে বসে। ওই ধরনের বইগুলো যে কত মিথ্যার উৎস সে খবর কে আর রাখেন? তা যদি রাখ-তেনই তবে পণ্ডিতেরা ওইসব বইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তেন না। 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সি' কিংবা 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' ইত্যাদি আদ্যোপান্ত জাল বইগুলোকে নিয়ে হুলুস্থুলু কাণ্ড হত না। মজার কথা এই: ঐতিহাসিকেরা কিন্তু ওই জাতের বইগুলোকে প্রামাণ্য বলেই মেনে নিয়েছেন। না মেনে উপায়ও তাঁদের ছিলনা। মিথ্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথও থাকত বন্ধ। এ সেই গল্পের

অভিমন্যুর চক্রব্যূহে আটকে পড়ার মতোই ব্যাপার। ঢোকা যায় বেরোনো যায় না। ইতিহাসের পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে চক্রব্যূহের কাজ করে মন্ত্রগুপ্তির জাল। এই জালে যাঁরা নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছেন—মগজ ধোলাইয়ের আড়ংঘাটায় আড়ং ধোলাই হয়ে যাঁরা বিকিয়ে গিয়েছেন তাঁরা ওই জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। পারা যায়ও না। বলে রাখা ভালো ওই জালে জড়ানোর ক্ষমতা—ওই ধোলাইয়ের ক্ষমতা ব্যক্তির হাতে থাকে না। থাকে রাষ্ট্রের হাতে। নামী ঐতিহাসিকেরা, নামী পণ্ডিতেরা, নামী ভাষাতাত্ত্বিকেরা রাষ্ট্রের তৈরি মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখেন। ওই রাষ্ট্রেরই উদ্যোগে ইতিহাস বানানোর অঁাতেলি চক্রান্তের শরিক হয়ে। মন্ত্রগুপ্তির গুপ্তিপাড়ার বাসিন্দা হিসাবে সব কিছুই তাঁরা গোপন রাখেন – রাখতে বাধ্য হন। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, রোমা রল্যাঁ, মহাদেব দেশাই ও নীরদ সি চৌধুরীদের সকলেই সে চক্রান্তে অংশ নিয়েছিলেন। প্রথম তিনজন অঁাতেলি—পরের তিন জন রাজনৈতিক ইন্টেলিজেন্সের গোপন খেলায় নেমেছিলেন। প্রথমটি উনিশ শতকের—দ্বিতীয়টি বিশ শতকের খেলা। দুটোরই নেপথ্য প্রযোজক ছিলেন ব্রিটিশ সরকার।

আঠারো শতকের 'ইতিহাসে' মহান ইহুদি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার ইংরিজি-মাধ্যম গল্পকথা বানানো হয়েছিল। ইতিহাসের নায়ক তখন ইহুদি জাতি। উনিশ শতকের ইতিহাসে আর্যজাতি / ভাষার উপাখ্যান বানানো হল। 'আর্য'-মহিমাকীর্তনের নামে এমনই আদিখ্যেতা দেখানো হল যে ওই ইহুদি জাতি বা হিব্রু ভাষার সুমহান ঐতিহ্যের গল্পগুলোও ম্লান হয়ে পড়ল। আর্যমহিমার গল্পগুলোকে লুফে নিয়ে মতলববাজ হিটলার ইহুদি মারণযজ্ঞে মেতে উঠলেন। তথাকথিত রোমক সাম্রাজ্যের নামে বানিয়ে রাখা মহামহিমান্বিত সম্রাটদের গল্পকথার প্রভাবে কিনা জানিনা মুসোলিনির মাথাটাও বিগড়ে গিয়েছিল। তিনি 'আধুনিক রোমক সম্রাট' হতে চেয়েছিলেন। উন্মাদ হিটলারের হাতে পঁয়ষট্টি লক্ষ ইহুদি

খুন হয়ে যাওয়ার পরেও কোনও পণ্ডিতই যে ছোট্ট সত্যি কথাটা ফাঁস করেননি তা হল এই যে ওই ইহুদি জাতিটার পুরো ইতিহাসটাই একটা বানানো গল্প। মুসোলিনিকে কোনও পণ্ডিত যা জানতে দেননি তা হচ্ছে এই : তথাকথিক রোমক সম্রাটদের কীর্তিকাহিনীর সবটাই কাহিনী। ইতিহাস নয়। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের ওইসব গল্পের ওপর ভিত্তি করে পণ্ডিতেরা যেসব তত্ত্বকথা তৈরি করে নিয়েছেন তা যে সবই ভ্রান্ত—এইটাই পণ্ডিতেরা কাউকে বুঝতে দেননি। ওই আব্রাহাম—ওই মোজেস—ওই যিশুদের পুরো কাণ্ডকারখানাটাই বানানো একটা মতলব যেমন বানানো আর এক মতলব উস্‌-ভাগান্ত তথাকথিত রোমক সম্রাটদের কীর্তি-কাহিনী। বিশাল ওই সাম্রাজ্যের সম্রাটেরা নাকি সব রোমান ভাষায় কথা বলতেন। সৈন্যরাও সবাই ওই ভাষায় কথা বলতে বলতে একটি দেশ দখল করে নিজেরাই সে-দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী বনে গিয়েছিলেন। ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বসেছিলেন এমন ঘটনার কথা ইতিহাসে ওই একটিই ঘটেছিল। রোমান সৈন্যরা রোমানিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করেছিলেন এমন একটা প্রচণ্ড মিথ্যা কথাকে আজ ইতিহাস বলে চালানো হচ্ছে।

আসলে ব্যাপারটা কি? ইটালির রোমের বাসিন্দাদের কস্মিনকালেও রোমান বলা হত না। এখনও বলা হয়না। তাছাড়া একটি সহরের অধিবাসীদের নামে পুরো একটি জাতির নাম রাখার কথাটা অবিশ্বাস্য—আজগুবি। দুনিয়ার কোনও জাতির নাম ওই কায়দায় হয়নি। আসলে প্রাচীন সব সভ্যতার—প্রাচীন সব সাম্রাজ্যের পত্তন কোনও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ করেননি। নানান দেশের কল্পিত কিংবা বাস্তব কোনও উপজাতি বা সম্প্রদায়ের নামেই ওইসব সাম্রাজ্য বা সভ্যতার নামকরণের ব্যবস্থা করেছিলেন নেপথ্যে থাকা ইতিহাসের কারিগরেরা। অ্যাসিরীয় উপজাতির মানুষ এখনও আছেন। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বলতে এখন কিছুই নেই। এঁদের নামে প্রাচীনকালের এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাম্রাজ্যের গল্পকথা বানানো হয়েছিল। 'রোমানীয়'-দের নামটাকে

কাজে লাগিয়েই রোমান সাম্রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। রোমান সৈন্যদের দখল করা দেশ বলে ওটার নাম রোমানিয়া হয়নি। 'রোমক শব্দের ব্যবহার মহাভারতেও হয়েছে। শব্দটি দেখে একদল পণ্ডিত মহাভারতকে ইতিহাস ভেবে বসেছেন। আর একদল শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করে আনন্দ পেয়েছেন। আসলে মিথ্যার আন্তর্জাতিকীকরণের একটা খেলা হিসাবেই ওই 'রোমক' শব্দটা মহাভারতে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। পণ্ডিতেরা এই সোজা কথাটাই বোঝেননি।

খেলাটার পুরো পরিচয় জানতে গেলে আরও গভীরে ঢুকতে হবে। বুঝতে হবে পাণ্ডিত্যের সাম্রাজ্যবাদকে। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইংরেজ, আইরিশ ফরাসী, ওলন্দাজ, লিথুয়ানীয়, ল্যাটভীয় (পরবর্তীকালে ডেনীয়, জার্মান, পোলিশ, ইটালীয়, রুশীয় ইত্যাদি) পণ্ডিতদের সকলের চেষ্টায় পাণ্ডিত্যের সাম্রাজ্যবাদ নামক মতলবটার জন্ম হয়েছিল। জন্ম হয়েছিল ওইসব ভাষাভাষী রাষ্ট্রের (বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের) আর্থিক আনুকুল্যে। অন্য দেশের পণ্ডিতেরা ইংল্যাণ্ডে এসে প্রয়োজনবোধে ভাড়াও খাটতেন। তুনিয়ার পণ্ডিতদের অস্থায়ী একটা আস্তানা ওই ইংলাণ্ডে রাজ্যের মিথ্যা বানানোর (বলে রাখা ভালো বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধানের কর্মতৎপরতাও ওই ইংল্যাণ্ডেই বেশি হয়েছিল।) বিশেষ করে দর্শন, ধর্ম ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখার মধ্য দিয়েই এঁদের কর্তব্য শেষ হত। মজার কথা এই : পাণ্ডিত্যের এই সাম্রাজ্যবাদকে সব রাষ্ট্রই কিন্তু লুফে নিয়েছে। তোয়াজ করে যাচ্ছে। এই সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু নেই। সব রাষ্ট্রের কমনওয়েল্‌থ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই সাম্রাজ্যবাদ। রাষ্ট্রিক মতাদর্শের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পরেও প্রাচীন চীনের ইতিহাসের ওপর গবেষণা করতে আজও চীনের ছাত্র প্যারিসে গিয়ে ওঠেন। ইন্দোনেশিয়া বা আরবের ছাত্র যান আমস্টার্ডামে। ভারতের ছাত্ররা লণ্ডনে, অক্সফোর্ডে, কেম্ব্রিজে। চেঙ্গিজ খাঁ-কে নিয়ে চীনের-গৌরববোধ—

অশোককে নিয়ে ভারতের মাতামাতি কম নয়।

পাণ্ডিত্যের সাম্রাজ্যবাদটা কি—এটা বোঝার দরকার আছে। হিব্রু, ল্যাটিন, প্রাচীন গ্রিক, অ্যারেমীয়. ফিনিশীয়, সংস্কৃত ইত্যাদি reconstructed অর্থাৎ পুনর্গঠিত ভাষায় লেখা উৎসগ্রন্থ-গুলোকে ভিত্তি করে প্রাচীন যুগের ইতিহাস বানানোর একটা হিড়িক শুরু হয়েছিল ওইসব পণ্ডিতদের যোগসাজসে। মিলেনিয়াম্-এর কল্পিত স্বর্ণযুগটাকে অতীতে পাঠানোর সেই উদ্যোগ আয়োজন আঠারো শতকের শেষাশেষি বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলেও নেপথ্য কর্মকাণ্ড জোরকদমে চলেছিল উনিশ শতকে। চলেছে এই বিশ শতকেও। মজার কথা এই. সে-উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্য দিয়ে যে প্রাচীন যুগের ইতিহাসটা বানানো হয়েছিল তা কিন্তু সব রাষ্ট্রই সত্যি বলে মেনে বসে আছে। আজও রামায়ণ-মহাভারত-ভিত্তিক 'ইতিহাস'—ইলিয়াড-ওডিসি-বাইবেল নির্ভর 'ইতিবৃত্ত'—ঋগ্বেদ-উপনিষদ-পুরাণ থেকে 'ইতিকথা'-র টুকরো-টাকরা উপাদান খুঁজে নেওয়ার ব্যাপারে কি রাশিয়া, কি চীন, কি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, জাপান—কি ভারত—সব রাষ্ট্রই সমান উৎসাহী কেন? কেন আজ এ রাষ্ট্রে, কাল ও রাষ্ট্রে, পরশু আর এক রাষ্ট্রে একই মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজ্যের সেমিনার-এর ব্যবস্থা করা হয়? ওয়াশিংটন. মস্কো, টোকিও, দিল্লী ও বেইজিং-এ একই মিথ্যার কচ্‌কচি কেন করা হয়? মতাদর্শের এত ফারাক থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার পণ্ডিত এই একটা ব্যাপারে কেন একমত? একমত কারণ দুনিয়ার মজদুর এক না হলেও দুনিয়ার পণ্ডিত কিন্তু বহুদিন আগে থেকেই এক হয়ে গেছেন। এক থেকে যাবেন। মার্ক্স সাহেবের জন্মের আগেই ওই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। আর তার প্রভাব-প্রতিপত্তি মার্ক্সবাদের চেয়ে কিছু কম নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে তার দাপট। 'দুনিয়ার পণ্ডিত এক হও' বলে এঁরা চীৎকার করেন না কারণ তাঁরা এক হয়েই আছেন। এঁদের স্লোগান—'দুনিয়ার পণ্ডিত জিন্দাবাদ'। সব রাষ্ট্রই প্রাচীন সব ইতিহাসের—প্রাচীন

সব ধর্মের—প্রাচীন সব দর্শনের—প্রাচীন সব সংস্কৃতির—প্রাচীন সব ভাষার ভেলকি দেখানোর ব্যাপারে সমান উৎসাহী। আর কিছুতে না হোক, এই একটা ব্যাপারেই রাষ্ট্রগুলির যত মিল।

## পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষার জন্মবৃত্তান্ত

সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত বলে প্রচার করা পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষাগুলোর জন্মের ইতিহাসটা বেশ মজার। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণগত জটিলতাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে—শুধু তার ধ্বনিগত জটিলতাকে ঝেড়ে ফেলেই পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ট ইত্যাদি বিচিত্র এবং উদ্ভট সব ভাষা জন্মেছিল। জন্মেছিল ভাষাতত্ত্বের নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই। জন্মেছিল কারণ রাষ্ট্রপোষ্য নেপথ্য শিল্পীরা ওইসব ভাষার উদ্ভাবনার কাজটি সেরে ওগুলোকে প্রাচীন ভাষা বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। সমসাময়িক এবং উত্তরকালের পণ্ডিতদের বোকা বানানোর মহান উদ্দেশ্য নিয়েই। বিশ্বাসযোগ্য হোক বা না হোক ভাষাগুলো জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের নজর কেড়ে নিয়েছিল—জনগণের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃত ভাষার দাঁতভাঙা উচ্চারণ করতে গিয়ে যাঁরা হিমসিম খেয়ে যেতেন তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। শব্দের ভেতরের দিককার ত' বটেই—এমনকি প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির বেশ কিছু প্রাকৃত ম্যাজিকে—পালি-মার্কা ভোজবাজিতে কিংবা অপভ্রংশ-মার্কা ভানুমতীর খেলায় স্বরধ্বনিতে কিংবা সহজতর—ক্ষেত্রবিশেষে জটিলতর (ন→ণ) কোনও ব্যঞ্জনে বদলে যেত। শব্দগুলো হাড়গোড় ভেঙে নেতিয়ে পড়ত। আর নেতিয়ে যাওয়া ভাষাগুলোর ওপর গবেষণা করতে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। জিভের এবং স্বরযন্ত্রের জড়তার জন্য উত্তর ভারতের বেশির

ভাগ মানুষ উচ্চারণ ক্ষমতার বিচারে জরদ্গব কিংবা জড়ভরত হয়ে বসেছিলেন। ব্যঞ্জন-আতঙ্ক ও স্বরভীতি নামের দুটি ছোঁয়াচে রোগ সারা উত্তর ভারতে ত' বটেই এমনকি মরাঠা (→মহারাষ্ট্র) এবং উৎকল-কলিঙ্গ অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তা ছড়ানোর জন্যই উচ্চারণের জগৎ থেকে বেশ কিছু ব্যঞ্জন ধ্বনিকে (এবং কিছু স্বরধ্বনিকেও) ঝেঁটিয়ে বিদেয় দেওয়ার এক বিচিত্র এবং উদ্ভট খেয়ালে মেতে উঠেছিল অদ্রাবিড়ভাষী—অনাদি-বাসী—সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন তথাকথিত আর্য ভাষাভাষী ভারতীয় মানুষ। তথাকথিত আদিবাসীরা নিজে-দের ভাষায় প্রচলিত স্বরব্যঞ্জন-ধ্বনির সবই বাঁচিয়ে রাখলেন—প্রচলিত ধ্বনির ভূতুড়ে পরিবর্তন আনার কোনও চেষ্টাই করলেন না। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মানুষ তাঁদের ভাষায় প্রচলিত ধ্বনিগুলোকে পরম নিষ্ঠায় যথাযথভাবেই উচ্চারণ করে চললেন—ধ্বনির উচ্চারণে কোনও বিকৃতিও তাঁদের এল না। জটিল ধ্বনিকে সহজ করে নেওয়ার ইচ্ছাও তাঁদের এল না। এমন কি উত্তর ভারতীয় ভাষা থেকে—খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ—এই দশটি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনিযুক্ত শব্দ আত্মসাৎ করে নেওয়ার চেষ্টা করলেন যদিও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ক্ষমতা তাঁদের কোনওকালেই ছিল না।

আদিবাসী-দ্রাবিড় ভাষীদের স্বরযন্ত্রের কোনও দুর্বলতা বা বৈকল্য ঘটল না। সোজা ভাষায় তাঁদের স্বরযন্ত্রের কলকব্জা ঠিক মতোই কাজ করতে থাকল। যত গোলমাল যত গণ্ডগোল বাধল শুধু তথাকথিত আর্য ভাষাভাষীদের স্বরযন্ত্রে। কোন মহাপ্রভুর ষড়যন্ত্রে তা হল তাও জানার উপায় নেই। সুন্দর, সুঠাম সুশ্রাব্য সব সংস্কৃত শব্দের বিদিগিচ্ছিরি বিকৃতির মধ্য দিয়ে পালি, প্রাকৃত অপভ্রংশ বীভৎস কুৎসিৎ সব ভূতুড়ে শব্দ বানাতে শুধু ওই আর্য ভাষাভাষীরাই ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আর ক্ষেপে গিয়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে মাগধী—মধ্যাঞ্চলে শৌরসেনী—মরাঠী-মুলুকে মহারাষ্ট্রী—

এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পৈশাচী প্রাকৃত ভাষা উদ্ভাবনার মধ্য দিয়ে পৈশাচিক এক উল্লাস প্রকাশ করার মোচ্ছব শুরু করেছিলেন।

অন্ততঃ দিকপাল এবং প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতদের শতকরা এক শ' ভাগেরই এই ধারণা। আর এই ধারণাটাকে মহান সত্য বলে প্রচার করার জন্যই ওইসব ভাষার প্রাচীনকালে প্রচলিত থাকার গল্পের অফুরন্ত প্রমাণ বানিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে 'আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র পোষ্য রায়বাহাদুর-রায়সাহেব-মহামহোপাধ্যায়দের কর্মতৎপরতায় এবং সৌজন্যে বানিয়ে রাখা শিলালিপি, প্রত্নমুদ্রা, তাম্রলিপির সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার উদ্যোগ আয়োজনের মধ্য দিয়ে। অবিশ্বাস করে কার সাধ্য!

পাড়ার বিগড়ে যাওয়া ছেলেগুলোকে নিয়ে রাজনীতির পাণ্ডারা কাড়াকাড়ি করেন। কে যে কার সঙ্গে ভিড়বে এই নিয়েই লাগে গোলমাল। বিগড়ে যাওয়া ভাষাগুলোকে নিয়ে নানান ধর্মের মাতব্বরদের মধ্যেও লাগল কাড়াকাড়ি। ধর্মের পাণ্ডাদের কে কোন ভাষায় প্রচারকার্য চালাবেন তা নিয়ে লাগল গণ্ডগোল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল বুদ্ধপ্রেমিকেরা পালি আর প্রাকৃত ভাষাদুটোকে তাঁদের ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবেন। অঞ্চলবিশেষে প্রাকৃত অন্যত্র পালি। তবে সংস্কৃত ভাষাটাকে তাঁরা যে ধর্ম প্রচারের কাজে একেবারে বাতিল করেছিলেন তা নয়। ভাড়াটে সংস্কৃত পণ্ডিতের সংখ্যা ভাড়াটে পালি-প্রাকৃত পণ্ডিতের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তাই তথাকথিত 'বৌদ্ধসংস্কৃত' ভাষা-টাকেও প্রচারের কাজে লাগানো হত। মহাবীরের দলের প্রচার-কুশলীরা অঞ্চলবিশেষে অর্ধমাগধী—অন্যত্র তথাকথিত অপভ্রংশ ভাষায় ধর্মপ্রচার করবেন বলে ঠিক করলেন। পণ্ডিতদের ভাষা-গুলোকে দিয়ে কি জনগণের কাছে পৌঁছনো যায়? জনগণের কাছে পৌঁছতে গেলে সর্বাগ্রে চাই জনগণের ভাষা। আধুনিক রাজনীতির মানুষ কিংবা অমানুষগুলোর মতোই তখনকার ধর্ম-জীবিরা 'জনগণ'-ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না।

বুদ্ধ আবার জনগণকে এত বেশি ভালবেসে ফেলেছিলেন যে জনগণের মধ্যে প্রচলিত বলে প্রচার করা চৌষট্টি রকমের লিপির সবই তিনি শিখে নিয়েছিলেন। অন্ততঃ 'ললিতবিস্তরে'র সাক্ষ্য মেনে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতদের সকলে এই কথাই বলে আসছেন। ভাষার সঙ্গে ধর্মের নাম জড়ানোর কল্যাণে এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রচারের ঠেলায় ভাষাগুলো প্রাচীন সেজে বসল। আর তাঁদেরই আঁতেলি খেলার ফলে ধর্মগুলোকে প্রাচীন বলে চালাতে সুবিধা হল। ধর্মপুস্তকগুলোর ভাষা প্রাচীন হলে ধর্মগুলো কি আর প্রাচীন না হয়ে যায়? বৌদ্ধ-জৈন-আজীবক সব ধর্মই প্রাচীন সেজে বসল। ব্যবস্থাটা ভালোই হয়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিক জিন্দাবাদ।

পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ইত্যাদি ভাষাগুলোকে প্রাচীনকালের প্রচলিত ভাষা বলে চালাতে গিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এমন সব তত্ত্ব তৈরি করে নিয়েছেন যা শুনলে হাসি পায়। বিচার-বিবেচনা করতে গেলে তাঁদের ওপরে কেন জানিনা অনুকম্পা দেখানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকেনা। কারণ পাণ্ডিত্যের ছদ্মবেশের আড়ালে তাঁদের যে পরিচয় গোপন রাখা হত তা এই: তাঁরা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের আঁতেলি ইণ্টেলিজেন্সের সহ-যোগী। এঁদের নাম জানিয়ে প্রবন্ধের আয়তন বাড়িয়ে নেওয়ার ইচ্ছা নেই। একই কথা সব পণ্ডিত লিখলে আলাদা করে নাম জানানোর দরকারটাই ফুরিয়ে যায়। পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলেছেন: তখনকার দিনের স্ত্রী জাতির কেউই সংস্কৃত শব্দ ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারতেন না। আর তাই তাঁরা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলতেন। আর সেইজন্যই সংস্কৃত নাটকের স্ত্রী চরিত্রের অভিনেত্রীদের প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্তা বলতে হত। আজগুবি কথা আর কাকে বলে! স্ত্রী-জাতি সম্পর্কে এ-হেন অবমাননাকর কথা বলেও পণ্ডিতেরা যে কি করে পার পেয়ে গেলেন—প্রচণ্ড সব মহিলা পণ্ডিত-ই বা কি করে কথাটা হজম করে নিলেন—সেও এক রহস্য। বারবনিতার তিনশ' আটাত্তর খানা প্রতিশব্দ আবিষ্কার করার মূঢ়তায় যেসব

মহিলাপণ্ডিত মশ্‌গুল থাকেন—তাঁরাই-বা জলজ্যান্ত মিথ্যাটাকে কি করে মেনে নিলেন তা ভেবে অবাক হতে হয়। পণ্ডিতেরা যে তত্ত্বই দিন না কেন—যত বড় পণ্ডিতই তাঁরা হোন না কেন—সত্য হচ্ছে এই :

এক, সংস্কৃত ভাষা যদি সত্যিই প্রাচীনকালে প্রচলিত থাকত তাহলে ওই ভাষার সব ধ্বনির উচ্চারণ করার ক্ষমতা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের আয়ত্তের মধ্যেই থাকত। কারণ ভাষায় প্রচলিত ধ্বনি-একক যত জটিলই হোক না কেন সেই ভাষাভাষীদের সবাই তা উচ্চারণ করতে পারেন। ছেলেমেয়ে বাচ্চাবুড়ো সকলেরই সড়গড় থাকে ভাষায় প্রচলিত প্রত্যেকটি ধ্বনিই। সাঁওতালি ভাষায় পঁয়তাল্লিশটি ধ্বনি-এককের চল আছে। সেসব উচ্চারণ করতে কারুরই কোনও অসুবিধা হয়না। মেয়েরাও স্বচ্ছন্দেই সেসব যথাযথভাবেই উচ্চারণ করে।

দুই, ভাষায় প্রচলিত ধ্বনি-এককের (phoneme) সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। তা কমেও না—বাড়েও না। কমানোও যায় না—বাড়ানোও যায় না। তা বাড়ানোর বা কমানোর ক্ষমতা কোনও পণ্ডিতের হাতে থাকে না। এমনকি জটিলতম কোনও ধ্বনির উচ্চারণকে সহজ করে নেওয়ার ক্ষমতাও ভাষাভাষীদের কারুর থাকে না। ব্যঞ্জন ধ্বনিকে স্বরধ্বনিতে বদলে নেওয়ার স্বাধীনতাও ভাষাভাষীদের কারুরই থাকে না।

তিন, ভাষায় প্রচলিত সব ধ্বনি-একক ভাষাভাষীদের সকলে শিশুকালেই শিখে নেয়। ভাষার নিজস্ব ধ্বনি-একক যত জটিলই হোক না কেন তার সবই বেশ কিছু শিশু একবছর বয়সেই আয়ত্ত করে নেয়। কারুর কারুর তা আয়ত্ত করতে দু-তিন বছরও লেগে যেতে পারে এ-ও ঘটনা। তবে মজার কথা এই : ওই বয়সে যেসব ধ্বনি-এককের উচ্চারণ-ক্ষমতা গড়ে ওঠে সেই ক্ষমতাই তার থেকে যায়। পরে নতুন করে নতুন কোনও ধ্বনি-এককের উচ্চারণ-ক্ষমতা গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে না।

অসমীয়া ভাষাভাষীরা চ, ছ, জ, ঝ, ত, থ, দ, ধ ধ্বনিগুলো ঠিকমতো উচ্চারণ করতে শিশুকালে শেখেনা। শেখেনা তার কারণ ওই ভাষায় ওইসব ধ্বনির চল নেই। বেশি বয়সেও তাঁরা ওইসব ধ্বনির উচ্চারণে অক্ষম থাকেন তার কারণ বেশি বয়সে নতুন করে তা আয়ত্ত করা যায় না। যা হওয়ার তা শিশুকালেই হয়ে যায়। পণ্ডিতেরা আর একটি উদ্ভট কথা যুক্তি হিসাবে খাড়া করার চেষ্টা করছেন।

তাঁরা বলেছেন: শিশুদের কেউই সংস্কৃত ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারত না। আর পারত না বলেই তারা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলত। অর্থাৎ জন্মসূত্রে উত্তর ভারতীয় অনাদিবাসী-অদ্রাবিড়-ভাষী সব শিশুই প্রাকৃতভাষী ছিল। কথাটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সব শিশু যদি প্রাকৃতভাষী হত তবে তারা শিশুবয়সে যেসব ধ্বনির উচ্চারণ-ক্ষমতা অর্জন করত সেই ক্ষমতা নিয়েই তাদের সারা জীবন কাটাতে হত। অন্ততঃ তাই হওয়ার কথা। আর তা সত্যি হলে নতুন নতুন ধ্বনির উচ্চারণ-ক্ষমতা নতুন করে বেশি বয়সে আসার কথা নয়। আমরা বাঙালীরা মূর্ধন্য-ণ বা মূর্ধন্য-ষ উচ্চারণ করার যতই চেষ্টা করি না কেন দন্ত্য-ন আর তালব্য-শ ছাড়া আর কিছুই আমাদের স্বরযন্ত্র থেকে বেরুবে না। কারণ ওসব ধ্বনি-একক বাঙলায় চালু নেই। অনুস্বারের উচ্চারণ আমরা বাঙালীরা ঙ্ কিংবা ঙ-র মতোই করব। গুজরাতি অনুস্বারের উচ্চারণ নকল করে আমরা কেউ সিংহ-কে সীঁহ বলব না। বলে রাখা ভালো সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ ওই গুজরাতি ভাষার অনুকরণেই করা হয়—অনুস্বারের বাঙলা উচ্চারণের নকল করে নয়। মোদ্দা কথা, প্রাকৃতভাষী শিশু উত্তরকালে সংস্কৃত উচ্চারণে পারদর্শী হয়ে বসত—একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

চার, ভাষায় প্রচলিত ধ্বনির উচ্চারণের স্পষ্টতার কথা বিচার করলে বলতেই হয় এ-ব্যাপারে নারীজাতির মানুষই এগিয়ে আছেন। তাদের উচ্চারণ পুরুষ জাতির চেয়ে অনেক স্পষ্ট। আর

কথাটা সব ভাষা সম্পর্কেই সমানভাবে প্রযোজ্য। জিভের কিংবা স্বরযন্ত্রের জড়তা বা আড়ষ্টতা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি এ-কথা কেউই স্বীকার করবেন না।

পাঁচ, ভাষায় প্রচলিত কিছু ধ্বনির উচ্চারণে অক্ষমতা থাকার দরুন নতুন একটি ভাষার জন্ম হয়েছে—এ নজির দুনিয়ার কোথাও নেই। ভাষায় প্রচলিত সাতটি ব্যঞ্জন আর তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও ভাষা মূল ভাষা থেকে বেরিয়ে এসেছে এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সংস্কৃত কত শ্লোক যে পণ্ডিতদের ঠকানোর জন্যই বানানো হয়েছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অনুষ্টুভ ছন্দে লেখা ননস্টপ মিথ্যার একটি নমুনা পণ্ডিতেরাই সরবরাহ করেছেন। শ্লোকটি এই রকম :

শ্রূয়তে হি মগধেষু শিশুনাগো নাম রাজা।
তেন দুরুচ্চারানষ্টৌ বর্ণানপাস্য স্বান্তপুর ॥
একঃ প্রবর্তিতো নিয়মঃ টকারাদয়শ্চত্বারো।
মূর্ধন্যাস্তৃতীয়বর্জমুষ্মণস্ত্রয়ঃ ক্ষকারশ্চেতি ॥

মগধের রাজা শিশুনাগ তাঁর অন্তঃপুরে ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ এবং ক্ষ—এই আটটি দুরুচ্চার্য ধ্বনির উচ্চারণ করাটা বন্ধ করে দিয়ে একটি নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন। আজগুবি কথা আর কাকে বলে! সে ক্ষমতা কোনও পণ্ডিতেরও থাকে না। থাকে না পরাক্রান্ত কোন সম্রাটেরও। সংস্কৃত শ্লোক দেখলেই যেসব অপোগণ্ড ধর্মধ্বজী পরম প্রামাণ্য ভেবে পুলক বোধ করেন তাঁদের কথা বাদ দিলাম। শ্লোকটি পড়েই এক পণ্ডিত এক তত্ত্ব বানিয়ে বসেছেন। তিনি বলেছেন : 'ইসসে য়হ্ ভী প্রতীত হোতা হৈ কি ভাটো কে লিয়ে মাগধ শব্দকা প্রয়োগ ভী ইসী জনপদকে আধার পর প্রচলিত হুয়া হৈ।' মিথ্যা থেকে তত্ত্ব তৈরি করতে গেলে এই হয়! তৈরি হয় মিথ্যার ডালপালা। দিকপাল পণ্ডিতেরা ওই ধরনের কত ডালপালা বানিয়ে পণ্ডিত সেজে বসে আছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ভাবতে অবাক লাগে ভাষাতত্ত্বের মাতব্বর পণ্ডিতেরা

ওই আজগুবি শ্লোককে বিশ্বাস করে বসলেন কি করে? তবে কি তারা পুরোপুরি বিকিয়ে গিয়েছিলেন? তাইত আসছে।

ছয়, ভাষার পার্থক্যের মূল উপাদান তার ব্যাকরণ। ভাষা আলাদা ত' তাদের ব্যাকরণও আলাদা। ব্যাকরণগত পার্থক্য যে কোনও দুটি ভাষার ক্ষেত্রে থাকতেই হবে। সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ নামের ভাষাগুলোর মধ্যে ব্যাকরণগত পার্থক্য নেই বললেই চলে। আর তা নেই বলেই সংস্কৃত ভাষার সাহেব পণ্ডিতের মনগড়া ফরমুলামাফিক বিকৃতিকরণের মধ্য দিয়েই পালি-প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষায় রূপান্তরটা সম্ভব। উল্টো দিকে ওইসব ভাষার নিয়মতান্ত্রিক সুকৃতিকরণের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতে উত্তরণও অসম্ভব নয়। দুটি জীবন্ত ভাষার ক্ষেত্রে ওই কায়দায় ভাষান্তর করার কথা কল্পনাও করা যায় না। একই ব্যাকরণ অনুসরণ করে দুটি ভাষা যে থাকতে পারেনা তা নয়। শব্দসম্পদের বেশ কিছু আরবী-ফারসী থেকে এনে হাজির করার ফলে উর্দু ভাষা হিন্দী থেকে আলাদা হয়ে গেছে ঠিকই। বেশ কিছু ইংরিজি ও বান্টু-ভাষার শব্দ আত্মস্থ করে নিয়ে আফ্রিকান (Africaan) ভাষা ওলন্দাজ ভাষা থেকে পৃথক হয়েছে এও সত্যি। তবে এ-কথা সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সম্পর্কে খাটেনা কারণ ওইসব ভাষার কোনও-টাতেই বিদেশাগত শব্দের প্রচলনের বাড়াবাড়ি ঘটেনি।

সাত, সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ট ইত্যাদি ভাষায় প্রকাশিত পুঁথিগুলোর কোনটারই বয়স দু-শ' বছরের বেশি নয়। পণ্ডিতেরা ওইসব ভাষায় লেখা বেশ কিছু জাল পুঁথি থাকার কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন। পুঁথিগুলো যে জাল তা জানা গেল কি করে? এ-প্রশ্নের উত্তরটাই বেশ মজার। এক, পুঁথিগুলোর মাপ নিতে গিয়ে দেখা গেল তার দৈর্ঘ্য এত সেন্টিমিটার ত' প্রস্থ কিছু কম সেন্টিমিটার। পুঁথির কাগজ যে মেট্রিক পদ্ধতিতে কাটা হয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। দৈর্ঘ্য মাপার কাজে মেট্রিক পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয় ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুলাই। পুঁথিটা যে

পাঁচ শ' বছরের পুরনো নয়—ওটা যে উনিশ শতকের জালিয়াতি তা কি বুঝতে কষ্ট হয় ?

দুই, পুঁথির কাগজ আলোর সামনে ধরতেই Made in France জলছবিটা দেখা গেল।

তিন, পুঁথির কাগজের রঙ হলদে কারণ পোকামাকড় বা ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু আর্সেনিক-ঘটিত যৌগ মিশ্রিত হলুদ-গোলা জলও পুঁথির কাগজে মাখিয়ে রাখা হত। পাঁচ শ' বছর আগে ওই আর্সেনিক কাকে বলে কেউই জানতেন না।

প্রশ্ন হল কিছু পুঁথিকে জাল বলে প্রতিপন্ন করার খেলাটা মিথ্যার কারবারীরা নিজেরা খেললেন কেন ? কিছু পুঁথিকে জাল বলে চালানোর দরকার ছিল। এক ঢিলে দুটো পাখী মারার ব্যবস্থা হত। কিছু পুঁথিকে জাল বলার মধ্য দিয়ে বাকি পুঁথিগুলো যে জাল নয় তা বোঝানোর ব্যবস্থা যেমন হত তেমনি তাঁদের নিজেদের সততা বোঝানোর বন্দোবস্তও হয়ে যেত। প্রশ্ন আসছেই। এক, জাল পুঁথিগুলো লিখতেন কারা ? দুই, তাঁদের নাম জানা যাচ্ছেনা কেন ? তাঁরা সকলেই নিজেদের নাম গোপন রাখার চেষ্টা কেন করতেন ? তিন, তবে কি তাঁদেরও মন্ত্রগুপ্তির জালে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল ? আর সেইজন্যই কি তারা কিছু অর্থের বিনিময়ে নিজেদের নাম গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন ? চার, ওই জালে জড়ানোর ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের হাতেই থাকে। তবে কি পুরো ব্যাপারটার পেছনে রাষ্ট্রের বা সরকারের মতলববাজি কাজ করেছিল ? তাইত আসছে। পণ্ডিতেরা রাষ্ট্র-নির্দেশিত মিথ্যা বানিয়ে রাখার কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা জার্মানীতে পাচার করা পালি-প্রাকৃত পুঁথির বেশির ভাগই বাঙলা হরফে লেখা হয়েছে। বুঝতে কষ্ট হয়না নেপথ্যশিল্পীদের বেশির ভাগই বাঙলা ভাষাভাষী ছিলেন। তাঁরাই বেশি মাত্রায় ভাড়া খেটেছিলেন। প্রাকৃত ভাষার চর্চা মরাঠীমুলুকে বেশি হত—আর প্রাকৃত পুঁথির সবই বাঙলা হরফে লেখা হত—কথাদুটো

স্ববিরোধী। ‘প্রাকৃতকল্পতরু’-নামক উদ্ভট নামের কেতাবের পুঁথি যা ইংল্যাণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত আছে তা বাঙলা হরফেই লেখা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, আর্সেনিক-ঘটিত বিশেষ একটি যৌগকে আমরা বাঙালীরা সেঁকো বিষ বলি। ‘সেঁকো বিষ’-কে সংস্কৃত সাজাতে গিয়ে ‘শঙ্খবিষ’ শব্দের জন্মের ব্যবস্থা আমরাই করেছিলাম। ‘yellow’ arsenic এর খাঁটি ইংরিজি yellow অংশ থেকে সংস্কৃত ‘আল’ শব্দ বানানো হয়েছিল। শব্দ দুটি প্রাচীন কালের সংস্কৃত ভাষায় কোন ম্যাজিকে ঢুকে বসল সেইটাই মজার। আসলে সংস্কৃত ভাষাটাই অর্বাচীন। আর অর্বাচীন বলেই তার প্রাচীনত্বের মিথের মারণাস্ত্র ওই ‘আল’ এবং ‘শঙ্খবিষ’ কে পুষে রেখেছে সংস্কৃত ভাষা। কেউ বোঝেননি এইটাই আশ্চর্যের।

আট, কিছু কিছু ধ্বনির উচ্চারণ প্রকাশ করার ব্যাপারে ত্রুটি কিংবা অক্ষমতা ভাষাভাষীদের অংশবিশেষের মধ্যে থাকতে পারে তার কারণ কোনও ভাষায় প্রচলিত সব ধ্বনি একক ভাষাটির সব উপভাষায় চালু থাকেনা। উল্টো দিকে, এক একটি উপভাষায় বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ধ্বনি-একক থাকতে পারে যা ভাষাটির অন্য উপভাষায় চালু থাকেনা। মেদিনীপুরে মূর্ধন্য ণ ও ল-এর উচ্চারণের চল থাকলেও বাঙলাভাষী অন্য কোনও জেলায় ওই দুই ধ্বনি-এককের চল নেই। আসলে যে উপভাষার ভিত্তিতে প্রমাণ কথ্য ভাষা গড়ে ওঠে সেই উপভাষার প্রচলিত ধ্বনি-একককেই সে-ভাষার প্রমাণ ধ্বনি-একক বলে ধরে নেওয়া হয়। পূব বাঙলার কিছু অঞ্চলে শ-ধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে ছ বা হ উচ্চারণ করে বসেন। (যেমন বি এস. সি=বি. এছ সি; সকল=হগল)।

নয়, সংস্কৃত ভাষাটা পণ্ডিতদের কুক্ষিগত ছিল—এই রকম একটি ‘তত্ত্ব’-ও পণ্ডিতদের কেউ কেউ দিয়ে বসেছেন। পণ্ডিতেরা বললেও কথাটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। শুধু পণ্ডিতদের জন্যই তৈরি হয়েছে এমন কোনও ভাষার সন্ধান কেউই দেননি। দেওয়া যায়না।

ছুনিয়ার কোথাও ওই ধরনের কোনও ভাষা কস্মিনকালেও ছিলনা। আসলে পণ্ডিতদের কুক্ষিগত কিছু মিথ্যার নানান নাম—ভগবানের ভাষা, পণ্ডিতদের ভাষা, মুনিঋষির ভাষা চণ্ডালদের বিভাষা, আভীরদের বিভাষা—পণ্ডিতদের মিথ্যার ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়া বেড়াল ওগুলো। জ্ঞানরাজ্যের শুদ্ধিকরণে ওগুলোকে পত্রপাঠ বিদায় করা ছাড়া রাস্তা নেই। শ' খানেক বছর ধরে বড় বড় পণ্ডিতদের গলায় ওই মিউ মিউ ধ্বনিই শুনতে হচ্ছে। বেড়ালগুলোর দাপাদাপির কমতি নেই। আসলে উনিশ বিশ শতকের বেশ কিছু পণ্ডিত সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সেবাদাস হিসাবে তাদেরই কুক্ষিগত হয়ে বসেছিলেন। এঁরাই ল্যাটিন, হিব্রু, সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রিক ভাষাগুলোকে 'পণ্ডিতদের কুক্ষিগত' ভাষা বলে চালাতেন। এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। আসলে ওগুলোর সবই 'আজন্ম-মৃতভাষা'। সবই এক গোত্রের। সবই মিথ্যার কারবারীদের বানিয়ে রাখা মতলব। প্রাচীনও নয়—ভাষাও নয়। রাজ্যের মিথ্যা পুষে রাখার আড়ষ্ট-মার্কা আধুনিক কৃত্রিম মাধ্যম।

দশ, স্ত্রী-জাতি সম্পর্কে বক্রোক্তি করেই পণ্ডিতেরা ক্ষান্ত হননি। সংস্কৃত ভাষা যথাযথভাবে উচ্চারণ করার অক্ষমতা থাকার দরুন গয়লাদের ওপরেও এক হাত নিয়েছেন তাঁরা। ওই সম্প্রদায়ের পুরুষ মানুষেরাও নাকি সংস্কৃত সব ধ্বনির উচ্চারণ করতে পারতেন না। লাল-বাল-গোপালেরা যে সংস্কৃত বলতে পারতেন না—এই উদ্ভট তত্ত্বটি পণ্ডিতেরা সংস্কৃত একটি বাণী দেখেই আবিষ্কার করে নিয়েছেন।

সংস্কৃতাদির্বাগ জাতিঃ। জাতিনামা শব্দালঙ্কার উচ্যতে। ইতি সম্বন্ধঃ। সা চ পাণিন্যাদি অষ্ট-ব্যাকরণোদিত শব্দ লক্ষণেন সংস্করণাৎ সংস্কৃতা প্রোচ্যতে। আদিশব্দাৎ প্রাকৃত-শৌরসেন-মাগধ-পিশাচ-অপভ্রংশরাচাং পরিগ্রহঃ। তত্র সকল-বাল-গোপালাঙ্গনাহৃদয়সংবাদী নিখিলজগজ্জন্তুনাং শব্দশাস্ত্রাকৃতবিশেষসংস্কারঃ সহজো বচনব্যাপারঃ সমস্তেতর ভাষাবিশেষাণাং মূলকারণত্বাৎ প্রকৃতিরিব প্রকৃতি।

শিশু-গয়লা আর স্ত্রীজাতির মানুষের স্বাভাবিক ভাষা হিসাবেই ওই প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত হয়েছিল—এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। গয়লাদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক কথাবার্তা বলে বাঙালী ব্রাহ্মণদের অনেকেই কেন জানিনা একটু আনন্দ পেতেন। নেপথ্যে থাকা কোনও বাঙালীর কীর্তি যে ওই বাণী তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

এগারো, ভাষাতত্ত্বের গল্পের বইয়ে বলা হয়েছে প্রাকৃত ভাষায় যাঁরা কথা বলতেন তাঁরা ওই 'প্রাকৃত'-শব্দের উচ্চারণই করতে পারতেন না। স্বরযন্ত্রের কলকব্জা সবই নাকি তাঁদের এমনি বিগড়ে বসেছিল যে 'প্রাকৃত' বলতে গিয়ে তাঁরা 'পাউঅ' বা 'পাউণ' বলে বসতেন। আজগুবি কথা আর কাকে বলে? তথাকথিত আদর্শ 'পাউঅ' ভাষা-ভাষীদের উত্তরপুরুষ মরাঠী ভাষাভাষীরা এখনও 'প্রাকৃত'-শব্দটাকে 'প্রাক্রুত' উচ্চারণই করেন। কেউই পাউঅ বা পাউণ বলেন না। বলে রাখা ভালো মরাঠী ভাষায় 'পাউণ' শব্দও চালু আছে যার বাঙলা অর্থ 'পৌনে' অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ। মরাঠী 'পাউণ' থেকেই বাঙলা 'পৌনে' শব্দটা এসে গেছে। ওই 'পাউণ' শব্দকে সাজিয়ে গুছিয়ে সংস্কৃত বানিয়ে 'পাদোন' হিসাবে সংস্কৃত অভিধানে রাখা হয়েছে। আসলে ওটি 'মরাঠী-সংস্কৃত'-শব্দ। আর একটা কথা, মরাঠি ভাষায় 'প্রাকৃত'-শব্দের অর্থই 'মরাঠি'। কোনও ভূতুড়ে কিংবা প্রাচীন ভাষাকে তাঁরা প্রাকৃত বলতেই বা যাবেন কেন? মরাঠিরা 'বর্ষা'কে 'পাউস' বলেন—অতিথিকে 'পাহুণা' বলেন। মজার কথা এই ঃ

অন্য অনেক মরাঠি শব্দের সংস্কার করে 'মরাঠি-সংস্কৃত' বানানোর সঙ্গে সঙ্গে ওই পাউস থেকে 'প্রাবৃষ' ও 'প্রাবৃষা' এই দুটি তথাকথিত সংস্কৃত শব্দ বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। মরাঠী 'পাহুণা'কে ঘষে মেজে যে কত সংস্কৃত শব্দ বানানো হয়েছে তা দেখে অবাক হতে হয়। প্রঘুণ / প্রঘূর্ণ / প্রাঘুণ / প্রাঘুণক / প্রাঘুণিক / প্রাঘূর্ণক / প্রঘূর্ণিক। অতিথি দেখেই মস্তক প্রকৃষ্ট রূপে ঘূর্ণিত হয় বলে কিনা জানিনা প্র উপসর্গ আর ঘূর্ণ-ধাতু যোগেই শব্দটি নিষ্পন্ন

হয়েছে। আর তা যদি হয়েই থাকে তবে বলতেই হয় ধাতুপ্রত্যয় গত অর্থের মনিকাঞ্চনযোগ হয়েছে শব্দটিতে।

নেপথ্যে থাকা বাচস্পতিবাবুকে ধন্যবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। তবে ভদ্রলোক একটু বাড়াবাড়ি করে বসেছেন। একই শব্দের ট্যারা-বাঁকা সাতখানা অবতার পুষে রাখতে গেলে যে অভিধানের কলেবর অহেতুক বেড়ে যায় এইটাই তিনি বোঝেননি। পণ্ডিতেরা উল্টো তত্ত্বই দিয়েছেন। সংস্কৃত থেকে মরাঠী শব্দের জন্মের ফিরিস্তি দিতে তাঁরা ক্লান্ত হননা। আসলে ব্যাপারটা পুরোটাই ঘটেছিল উল্টো। মরাঠী শব্দ থেকেই ওইসব সংস্কৃত শব্দের জন্ম হয়েছিল। মরাঠী পায়তণ ( =জুতা ) সংস্কৃত সেজে পাদত্রাণ। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের উল্টো জ্ঞানদানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কি কোনও উপায় নেই ?

## আর্য-জাতির প্রসঙ্গ প্রাচীন গ্রন্থেও রাখা হয়েছিল

'আর্য'-শব্দটা নির্দিষ্ট অর্থবহ কোনও বাঙলা মৌলিক শব্দ নয়। পূর্ব ভারতের কোনও ভাষায় শব্দটির অর্থবহতা ছিলনা। এখনও নেই। এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশ করা পত্রপত্রিকায় শব্দটির প্রয়োগ ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল ঠিকই তবে কোনও জাতি বা ভাষার নাম হিসাবে তার প্রয়োগ ঘটেনি। 'আর্যাবর্ত'-শব্দটাও ওইসব পত্রিকায় ব্যবহার করা হয়েছিল তবে বিচিত্র অর্থে। শব্দটির অর্থ তখনও 'উত্তর ভারত' হয়ে ওঠেনি। তখনও পর্যন্ত তার অর্থ ছিল land of virtue বা India। আর্যাবর্ত' শব্দের সঙ্গে land of virtue কথাটার যে কি সম্পর্ক তাও বোঝানো হয়নি। land মানে আর্য নয়—virtue মানেও তা নয়। land মানে আবর্ত নয়—virtue মানেও তা নয়। তবুও কেন যে 'আর্যাবর্ত'-কে land

of virtue বলে চালানো হল তাও বোধগম্য নয়। তবে land=area=আর্য্য ধরে নিলে এবং virtue=বর্ত মেনে নিলে ইংরিজি শব্দবন্ধটির উচ্চারণ চুরি করেই যে ওই 'আর্যাবর্ত' শব্দটা বানানো হয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয়না। কষ্ট হয়না কারণ ইংরিজি শব্দের উচ্চারণ চুরি করে ওই কায়দায় শব্দ বানিয়ে নেওয়ার খেলাটা একটু বেশি মাত্রাতেই খেলা হয়েছিল। আর তা না বোঝার কথাও নয়। তবে পণ্ডিতেরা কেন যে তা বোঝেননি—এইটাই আশ্চর্যের এবং সন্দেহেরও। সে যাই হোক, আঠারো শতকের শেষ ভাগেও 'উত্তর ভারত'—অর্থে 'আর্যাবর্ত'-শব্দের প্রয়োগ হয়নি—এইটাই লক্ষ্যণীয়।

উনিশ শতকে রাষ্ট্রনিয়োজিত বেশ কিছু ভাষাতাত্ত্বিকের নেপথ্য ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে এসিয়া ও ইউরোপের নানান ভাষার সামান্য কিছু শব্দের সঙ্গে তথাকথিত সংস্কৃত ভাষার সমসংখ্যক শব্দের (এর মধ্যে 'কেন্দ্র' শব্দের মতো কিছু তৈরি করে নেওয়া শব্দও ছিল যা ভারতে কস্মিনকালেও প্রচলিত ছিলনা) কষ্টকল্পিত মিল খুঁজে নিয়ে কিংবা কপোলকল্পিত তারকাচিহ্নিত বেশ কিছু উদ্ভট ভূতুড়ে শব্দ বানিয়ে নিয়ে কল্পিত একটি 'মূলভাষা'-র উদ্ভাবনার আয়োজন এবং সে ভাষার প্রাচীন কালে প্রচলিত থাকার গল্পকথা বানানো হয়েছিল। দুনিয়ার নামী নামী সব পণ্ডিতের বানানো সেই গল্পটাকে ভারতের ভাষাতাত্ত্বিকেরা বিচারবিবেচনা না করেই পরম সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। সে যাই হোক, কল্পিত ওই মূলভাষা এবং সেই ভাষাভাষীদের 'আর্য' বলে জানানো হয়েছিল ওই উনিশ শতকে প্রকাশিত ভাষাতত্ত্বের বইয়ে।

এই আর্যদেরই একটি শাখা ভারতে এসে হাজির হয়েছিলেন। এবং কালক্রমে উত্তর ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হয়ে বসেছিলেন তাঁরাই। অন্ততঃ পণ্ডিতদের এই রকমই ধারণা হয়েছিল। আর সেই জন্যই প্রধানত আর্য-অধ্যুসিত উত্তর ভারতকে বোঝাতে তাঁরাউনিশ শতকে সম্পূর্ণ নতুন অর্থে 'আর্য্যাবর্ত' শব্দটির ব্যবহার শুরু

করেছিলেন। আঠারো শতকে শব্দটির ওপর যে অর্থই চাপানো হোকনা কেন উনিশ শতকে তার অর্থ করা হয়েছিল 'abode of Aryans অর্থাৎ আর্যদের বাসভূমি।

মোদ্দা কথা হল এই : আঠারো শতকের শেষভাগেও কোনও জাতি বা ভাষার ওপরে 'আর্য' নাম চাপানো হয়নি। বহিরাগত মতান্তরে ভারত থেকে বাইরে চলে যাওয়া কোনও জাতি বা তাদের ভাষাকে তখনও পর্যন্ত কেউ 'আর্য' বলে জানতেন না। মজার কথা হল ওই আর্য-শব্দটাই রামায়ণ-মহাভারত-বেদ-পুরাণে জাতিবাচক পরিচিতিতেই ঠাঁই পেল। কোথাও ইঙ্গিতাত্মক শব্দপ্রয়োগে— কোথাও সোজাসুজি আর্য-শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। আর্য-মহিমার গল্পকথা ওইসব কেতাবগুলোতে যত্ন করেই রাখা হল। আঠারো শতকের শেষভাগে জাতিবাচক যে নামের প্রচলন ছিলনা সেই নাম প্রাচীন কালের কেতাবে কোন ম্যাজিকে ঢুকে বসল এই সোজা কথাটাকেই কেউ গুরুত্ব দেননি। তবে কি প্রাচীন কালের লেখা বলে চালানো কেতাবগুলো উনিশ শতকেই লেখা হয়েছিল? আর তা হয়েছিল বলেই কি ওইসব কেতাবে আর্যপ্রসঙ্গ রাখা সম্ভব হয়েছিল? তাইত আসছে। ভারতের পণ্ডিতেরা এসব প্রশ্ন তোলেননি। তাঁরা এসব ব্যাপারে সাহেব পণ্ডিতদের লেখা তত্ত্ব-গুলোকে গিলতেন—আর নিজের নিজের ভাষায় কিংবা ইংরিজিতে উগ্‌রে দিতেন। আর্য-তত্ত্বটাকে প্রামাণ্য মনে করে রামায়ণকে তাঁরা আর্য সম্প্রসারণের এক আলেখ্য হিসাবেই ধরে নিয়েছেন।

আর্য-তত্ত্বের প্রামাণ্যতা না থাকলেও পণ্ডিতদের তত্ত্ব তৈরির প্রতিযোগিতায় নামতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। একদল বললেন আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন ত' আর একদল বললেন ওঁরা ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ড থেকেই এসেছিলেন। সংস্কৃত ভাষার 'ভ্যাম্‌' বিভক্তিটা লিথুয়ানিয়া থেকেই আমদানি করা হয়েছিল বলে কিনা জানিনা ইউরোপের লিথুয়ানিয়া থেকে ওই আর্যদের আসার গল্পও কেউ কেউ শুনিয়েছেন। উগ্র জাতি-

য়তাবাদী কিছু ভারতীয় পণ্ডিত উল্টো এক তত্ত্ব দিয়ে বসলেন। তাঁরা বললেন: আর্যরা বিদেশ থেকে ভারতে আসেননি। ভারত থেকেই তাঁরা বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। আজগুবি 'তত্ত্ব'কে উল্টে দিলেও যে আর এক আজগুবি কাণ্ড তৈরি হয়—এইটাই তাঁরা বোঝেননি।

## আর্য-মহিমার গল্পগুলো অনেকের ভালো লেগেছিল

আর্য-মহিমার গল্পকথাগুলোকে ভারতের হিন্দুধর্মধ্বজী পণ্ডিত-স্মন্যরা লুফে নিয়েছিলেন। এঁদের কেউ কেউ বেদভক্ত হয়ে উঠেছিলেন ত' কেউ কেউ বেদান্তঅন্তপ্রাণ। তথাকথিত ভক্তিবাদের বন্যায় ভেসে গিয়ে অবতারপ্রেমিক হয়েও বসেছিলেন কেউ কেউ। বেদ-বেদান্ত এবং ভক্তিবাদী কেতাবগুলোর কোনওটাই যে আঠারো শতকে কেউ দেখেননি—এই সোজা কথাটাকে কেউই গুরুত্ব দেননি। তার চেয়ে বড় কথা, ওই বেদ-বেদান্ত-অবতারবাদীদের কেউই যে ব্রিটিশ-বিরোধী ছিলেন না—দেশবাসীর দৃষ্টিটাকে ধর্ম ও দর্শনের বুজরুকি দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার মতলবেই যে তাঁরা ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছিলেন—এ কথাও কেউ বোঝেননি। উনিশ শতকে তৈরি করে নেওয়া আর্যতত্ত্বের সুড়সুড়ির কল্যাণে বৈদিক-বৈদান্তিক-অবতারবাদীদের দল রাতারাতি 'আর্যহিন্দু' বনে গেলেন। হিন্দু হওয়ার আত্মতৃপ্তির সঙ্গে হঠাৎ আর্য হওয়ার গৌরববোধ সোনায় সোহাগার কাজ করল। গৃহী-সন্ন্যাসী-নির্বিশেষে অনেককেই মাতিয়ে তুলল। তাঁদের আনন্দ দেখে কে? বেদান্তবাদের সঙ্গে যে আর্য হওয়া না হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই—এই সোজা কথাটাও বেদান্তবাদীরা বোঝার চেষ্টা করেননি।

বলে রাখা ভালো ভারতীয় মুসলমানদের কেউই ওই আর্যতত্ত্ব নিয়ে নাচানাচি করেননি। তাঁরা সেমিটিক পয়গম্বরদের নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। আর্য-বাগাড়ম্বরকে পাত্তাই দেননি।

আর্যমহিমার বৃত্তান্ত পড়ে বিবেকানন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর্যদের তিনি এতই ভালবেসে ফেলেছিলেন যে ভাবের আবেগে উল্টোপাল্টা কথাও বলে বসেছিলেন। অহিন্দু কাউকে আর্য বলে মনে করতেও তাঁর কষ্ট হত। তিনি এক তত্ত্ব উপহার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'Only Hindus are Aryans' !!! হিন্দু ছাড়া কেউ আর্য নন। তবে আর্যদের ভালো লাগলেও তাঁদের বহিরাগত বলে মেনে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল। তাঁর যুক্তিটা ছিল এই রকম: আর্যরা যদি বিদেশ থেকে ভারতে এসেই থাকবেন তাহলে তাঁরা অতিমাত্রায় সংখ্যালঘু হিসাবেই এদেশে এসেছিলেন। আর তা হয়ে থাকলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাঁদের চাটনি বানিয়ে খেয়ে নিতেন। সত্যিইত ভারতের অধিবাসীদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ওই তুর্কীদের, ওই ইংরেজদের, ওই রাজনীতির পাণ্ডাদের, এমনকি তাঁদের পরিচালক টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কাদের ত' আমরা চাটনি বানিয়ে খেয়ে নিয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতেই বেঁচে আছি। সাধু-সন্ন্যাসী ও রাজনীতির পাণ্ডাদের মধ্যে দুটো ব্যাপারে বেশ মিল আছে। দুদলই পরান্নজীবি আর আজগুবি কথা বলতে কেউই কম যান না।

## সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষার নিজস্ব কোনও লিপি ছিল না

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ট—এই পাঁচটি ভাষার কোনওটারই নিজস্ব বলতে যা বোঝায় এমন কোনও লিপি ছিলনা। নিজস্ব কোনও লিপিতে ওইসব ভাষায় কিছু লেখা হতনা। ভাষাগুলো যেযুগে প্রচলিত ছিল বলে পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন সে-যুগে পুঁথিতে লেখার উপযোগী কোনও লিপিরই আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা হয়নি। অন্ততঃ পণ্ডিতদের এইরকমই ধারণা। ধারণাটাকে সত্যি

বলে মনে করতে গেলে একটি অবিশ্বাস্য ও আজগুবি কথাকে প্রামাণ্য বলে মেনে নিতে হয়। সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও ওই পাঁচটি ভাষায় লিপির প্রবর্তন হয়নি—এই স্ববিরোধী তথ্যটিকে মেনে নিতে হয়।

ব্যাপারটা একটু সহজ করেই বোঝানো যাক। ভাষা পাঁচটির সাহিত্যসম্ভারটাকে মুখস্থ করেই বাঁচিয়ে রাখতে হত। রাখতে হত বংশানুক্রমে। আর ওই কায়দায় অন্ততঃ হাজারখানেক বছর তা বাঁচিয়ে রাখার দরকার পড়েছিল। অন্ততঃ পণ্ডিতদের হিসাব মতো তাই আসছে।

প্রশ্ন হল: এক, তাই যদি হবে তবে ওই পাঁচটি ভাষায় লেখা পুঁথিগুলো আধুনিক কালে প্রচলিত সব লিপিতে লিখে রাখার দরকারটা পড়ল কেন? ওইসব লিপির প্রবর্তনের সময় ওই পাঁচটি ভাষার কোনওটারই যে প্রচলন ছিলনা। তাহলে? ওইসব লিপিতে আধুনিক সব ভাষাই লিখে রাখার কথা। মরে হেজে যাওয়া ভাষায় আধুনিক সব লিপির প্রয়োগটাই কি সন্দেহজনক নয়?

ইংরেজদের ভারতে আসার আগে এখনকার প্রচলিত সব লিপি ব্যবহার করে ভারতের নানান আঞ্চলিক ভাষায় যে পরিমাণ পুঁথি লেখা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে লেখা হয়েছিল সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি মরে ভূত হয়ে যাওয়া ভাষায় লেখা পুঁথি। অন্ততঃ প্রচারটা সেই রকমই রাখা হয়েছে। প্রশ্ন আসছেই।

এক, একদিকে মৃতভাষায় লেখা পুঁথির অফুরন্ত ভাণ্ডার—অন্যদিকে জীবন্ত ভাষায় লেখা পুঁথির সন্দেহজনক সংখ্যাল্পতার কথা জেনেও দিকপাল সব পণ্ডিতেরা কোনও কথা বলেননি কেন?

দুই, বয়সের গাছপাথর নেই এমন সব কাব্যকথা আধুনিক সব লিপিতে কে বা কারা লিখতে গেলেন? কার প্রেরণায়? কবে থেকে সেসব লেখা শুরু হল? আমরা আধুনিক সব লিপিতে আধুনিক সব ভাষায় কিছু লেখার কথাই ভাবি। মুখস্থ করে রাখা কোনও প্রাচীন ভাষায় কিছু লেখার কথা ত' আমাদের মনে আসে না।

তিন, আধুনিক সব লিপিতে প্রাচীন সব সাহিত্য লেখার হিড়িকটা উনিশ শতকে কেন শুরু হয়েছিল? আঠারো শতকে কেন হয়নি? আর এই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিড়িকটা হঠাৎ এত কমেই বা গেল কেন? এ-সব প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিতেরা দেননি। দিলেই রহস্যটা ধরা পড়ে যেত। রহস্যটা কি? আসলে নেপথ্যে থাকা কোনও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বদান্যতার ওপরে নির্ভরশীল কিছু ভাড়াটে পণ্ডিতই প্রাচীন ভাষার সাহিত্য রচনার কর্মকাণ্ডে মেতে উঠেছিলেন। আর যেহেতু ওই পাঁচটি ভাষার নিজস্ব কোনও লিপি ছিলনা তাই বাঙলা, ওড়িয়া, নাগরী (জাতে তোলার জন্য যার নাম দেওয়া হয়েছিল দেবনাগরী), গুজরাতি, তেলুগু ইত্যাদি আধুনিক সব লিপির মাধ্যমেই তা করতে হয়েছিল।

ইংরেজদের ভারত থেকে পাততাড়ি গোটানোর পরে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত চর্চায় ভাঁটা পড়াটা কি সন্দেহজনক নয়? তবে কি নেপথ্যে থাকা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ওই ব্রিটিশ সরকারের কোনও সম্পর্ক ছিল? আর তা ছিল বলেই কি রাতারাতি ওইসব ভাষার চর্চা উবে গেল? তবে কি স্বাধীন ভারত সরকার প্রাচীন ভাষা চর্চা কিংবা প্রাচীন বলে চালানো গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যাপারে ততটা আগ্রহ বা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না? তাইত আসছে। তবে একটা কথা, ওই ব্যাপারে ভারত সরকারের আগ্রহ কিছু কমে গেলেও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। বেশ কিছু প্রাচীন বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশ এখনও হয়নি। সেসব গ্রন্থের শুধু নামগুলোই জানানো হয়েছে। কালক্রমে সেসবই প্রকাশিত হবে। আর সেসব প্রকাশ করার জন্য এই ভারত সরকারই উদার হস্তে টাকা-পয়সা জোগাবেন। নেপথ্যশিল্পীরা আখের গুছিয়ে নেবেন। তাঁদের নামও কাকপক্ষী জানতে পারবে না। মন্ত্রগুপ্তির সর্ত অনুযায়ী নেপথ্য লেখক নিজেদের নাম গোপন রেখে চলবেন।

## ইতিহাসে পণ্ডিতবৎসল রাজার অভাব রাখা হয়নি

প্রাচীনকালের রাজারাজড়াদের কেউ কেউ প্রজাবৎসল ছিলেন ত' কেউ কেউ অত্যাচারীও ছিলেন। ইতিহাসে এইভাবেই তাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটার মধ্যে সন্দেহের কিছুই নেই। সন্দেহ আসে পণ্ডিতবৎসল সব রাজারাজড়ার ওই বাৎসল্যের বৃত্তান্ত পড়ে। ইতিহাসে এই জাতের গুণগ্রাহী রাজার সংখ্যা কম নয়। স্বভাবতই কিছু প্রশ্ন এসে যায়।

এক, প্রাচীনকালে বইপত্র ছেপে বিক্রি করার প্রশ্নটাই ছিল অবান্তর। কারণ প্রেসের জন্মই তখনও হয়নি। বনারসের কাছে মাটিচাপা কোনও প্রেসের ভাঙা মেসিনপত্র দেখিয়ে প্রাচীনকালে মুদ্রণ শিল্পটাও যে আমাদের জানা ছিল এই উদ্ভট কথাটাও কেউ কেউ বলতে চেয়েছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিত অবশ্য তা মেনে নেননি।

দুই, পুঁথির হাজার গণ্ডা নকল বানিয়ে কেনাবেচার প্রশ্নটাও ছিল সমান আজগুবি কারণ পুঁথি লেখার উপকরণগুলোর উদ্ভাবনা প্রাচীনকালে হয়নি। এই অবস্থায় তখনকার লেখক সম্প্রদায় কার বা কিসের প্রেরণায় ঢাউস সাইজের বইগুলো লিখতেন—এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। প্রাপ্তিযোগের আশা যেখানে শূন্য সেখানে লেখকেরা শুধু লেখার স্বার্থে লিখে কিংবা অন্যদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে তোলার বিবেকতাড়িত তাগিদ অনুভব করে রাজ্যের দর্শন, নীতি-শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র বা ভাষাতত্ত্ব বানিয়ে রাখার কাজে সময় নষ্ট করতেন—এমনটা ভেবে নিতেও কষ্ট হয়। কারণ তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর তা নয় বলেই যে পণ্ডিত-পৃষ্ঠপোষক এতসব রাজারাজড়ার গল্প বানিয়ে রাখতে হয়েছে—তা বুঝতে কষ্ট হয়না।

প্রাচীনকালে কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার-জ্যোতিষী-শাস্ত্রকার সবাইকেই প্রচণ্ড পণ্ডিত হতেই হত। নিজের নিজের ভাষায় কিছু না লিখে কৃত্রিম সব ভাষায় লিখতে গিয়ে তা না হয়ে উপায়

নয়

থাকত না। সে যাই হোক, পণ্ডিত পুষে রাখার এ-ধরণের গল্প যে শুধু ভারতের জন্যই বানিয়ে রাখতে হয়েছে তা নয়। রাখতে হয়েছে ইউরোপ, এশিয়ার নানান দেশের জন্যই। সংস্কৃতিগর্বী সব দেশেই রাজারা পণ্ডিত পুষতেন—পণ্ডিতদের তোয়াজ করে চলতেন। প্রচারটা সেইরকমই রাখা হয়েছে। বই বিক্রি হোক বা না হোক পুঁথি কেনার লোক পাওয়া যাক বা না যাক—কিছুই এসে যেতনা। পণ্ডিতদের সপরিবার খোরপোষের দায়িত্ব রাজারা নিতেন। পণ্ডিতেরা লেখাজোখায় মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন। ব্যাপারটা এই ভাবেই চলত। কেউ মামুদের সভাপণ্ডিত হয়ে বসতেন—ত' কেউ বিক্রমাদিত্যের—কেউ হর্ষবর্ধনের—কেউ-বা পেরিক্লিসের—কেউ-বা ভোজরাজার। ভোজবাজি-মার্কা গল্পগুলো বানিয়ে একটা কাজ কিন্তু বেশ ভালোই হয়েছে। কল্পিত রাজাদের কল্পিত অর্থানুকুল্য যে প্রাচীনকালে অফুরন্ত গ্রন্থ রচনার পেছনে প্রেরণা জুগিয়েছিল—এই তথ্যটি জানানোর কাজটাও হয়ে গেছে। ফলে রাজাগুলোও প্রামাণ্য সেজে বসেছেন। প্রমাণসিদ্ধ হয়েছে তাঁদের বদান্যতার গল্পগুলোও। অন্ততঃ পণ্ডিতদের এইরকমই ধারণা।

অফুরন্ত শব্দটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। প্রাচীন সব রাজাদের অনুগ্রহভাজন পণ্ডিতদের লেখা বলে প্রচার করা প্রচুর বইয়ের প্রকাশ ঘটলেও এখনও বেশ কিছু বই অপ্রকাশিত থেকে গেছে। সে-সব বইয়ের নামগুলোই শুধু ইতিহাসে জানানো হয়েছে। এবং তার সংখ্যাওখুব একটা কম নয়। অপ্রকাশিতসেসব বই কালক্রমে ছেপেও বেরুবে। ছেপে বেরুবে দেশবিদেশের নামী পণ্ডিতদের সম্পাদনায়। রাজ্যের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ বলে প্রচার করা প্রাচীন (?) সব কেতাব যে কায়দায় মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানতপস্বীদের 'সম্পাদনা'য় ( আসলে নাম জড়ানোর খেলায় ) শ' খানেক বছর ধরে প্রকাশ করা হচ্ছে সেই একই কায়দায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনোনীত পণ্ডিতদের 'সম্পাদনা'য় ওগুলোর প্রকাশ ঘটতে থাকবে। ঘটতে থাকবে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ,

অবহট্ট, প্রাচীন গ্রিক, হিব্রু, ল্যাটিন, ভালগার ল্যাটিন ভাষায় লেখা অপ্রকাশিত সব কেতাবই। কারণ সবই একই খেলার নানান নাম। সবই এমন সব ভাষায় লেখা হয়েছে যেগুলোর পবিত্রতা, প্রামাণ্যতা ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে দুনিয়ার কোনও পণ্ডিতেরই বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর তা নেই বলেই ওইসব ভাষায় প্রাচীন (?) সব কেতাব প্রকাশের মহোৎসব শুরু হয়েছিল ইউরোপের বিশেষ একটি রাষ্ট্রে। এবং সেই রাষ্ট্রের শুভেচ্ছাতেই কেতাবগুলোর প্রকাশ ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

প্রাচীনকালের রাজা-মহারাজাদের পণ্ডিত পুষে রাখার গল্পটাকে লোকে যাতে সন্দেহ না করে বসে তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে ওই ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনামাফিকই। ভারতের দেশীয় করদ রাজ্য মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, রাজপুতানা ইত্যাদি নানান রাজ্যের রাজা-মহারাজারাও পণ্ডিত পুষতেন। তবে বিশেষ জাতের পণ্ডিতদের। এরা সকলেই সংস্কৃত-জানা লেখকদেরই তোয়াজ করতেন। আঞ্চলিক ভাষার লেখকদেরও যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দরকার আছে তা তাঁরা বুঝতেন না। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার আশ্রয়ে থেকে গণপতি শাস্ত্রী ভাসের লেখা তেরোখানা নাটকের সম্পাদনা করে 'মহামহোপাধ্যায়' খেতাব পেয়েছিলেন। পরে জানা গিয়েছিল ওই তেরোখানাই জাল কেতাব। জালিয়াতি করে এই কায়দায় সামা শাস্ত্রীও 'মহামহোপাধ্যয়' হয়েছিলেন। দেশীয় রাজা মহারাজাদের আশ্রয়ে থেকে তাঁরা যে ব্রিটিশ সরকারের সেবাদাস হিসাবেই কাজ করেছিলেন এইটাই কেউ বোঝেননি। প্রাচীন বলে চালানো বইপত্র লেখানোর দায়টা দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপরে চাপানোর দরকার ছিল। নেপথ্যে থাকা ব্রিটিশ সরকার নিজেদের সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার ব্যবস্থা করে নিতেন রাজাদের দিয়ে পণ্ডিত পোষার খেলা দেখিয়ে।

## তামিল লিপি—প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য

সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ছিল বলে প্রচার করা সব ধ্বনি প্রকাশ করার উপযোগী অক্ষর তামিল লিপিমালায় কোনও কালেই ছিলনা—এখনও নেই। ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনি প্রকাশ করার জন্য ওই লিপিমালায় অক্ষর আছে মাত্র দশটি—ক, ঙ, চ, ঞ, ট, ণ, ত, ন, প, ম। বলে রাখা ভালো চ, ছ, জ, ঝ – এই চারটি ধ্বনির চল ওই ভাষায় নেই। তাছাড়া ক-গ, ট-ড, ত-দ, প-ব—এই চার জোড়া ধ্বনি ক, ট, ত, প,—এই চারটি অক্ষর দিয়েই প্রকাশ করতে হয়। আসলে অক্ষরের ঘাটতির জন্য তামিল লিপিতে সংস্কৃত ভাষা ঠিক-মতো লেখা যায়না। ঘটনা হচ্ছে এই : সংস্কৃত ভাষা প্রকাশ করার ব্যাপারে তামিল লিপির অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তামিল ভাষাভাষীরা কিভাবে প্রাচীনকালে ওই সংস্কৃতের চর্চা করতেন—এখনই-বা তাঁরা কি কায়দায় করেন—এ-প্রশ্ন কেউ তোলেননি। তুললে রহস্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ত। সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব কোনও লিপি যে কোনও কালে ছিলনা—এ-বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত।

প্রাচীনকালের কথা থাক। উনিশ শতকে ভারতের নানান প্রদেশে সংস্কৃত চর্চা শুরু হলেও কোনও বিশেষ লিপির মাধ্যমে তা হতনা। বাঙালী পণ্ডিত বাঙলা অক্ষরে—ওড়িয়া পণ্ডিত ওড়িয়া অক্ষরে—তেলুগুভাষী পণ্ডিত তেলুগু লিপিতে—কানাড়ী-ভাষী পণ্ডিত কানাড়ী লিপিতে—এক কথায় যে যার নিজের নিজের লিপি ব্যবহার করেই তা করতেন। করতেন না শুধু তামিল ভাষীরা। করা সম্ভব ছিলনা। আর তা সম্ভব ছিলনা বলেই তামিল মুলুকে প্রাচীন কালে সংস্কৃত ভাষার প্রচলনের গল্প বানাতে গিয়ে একটি প্রাচীন লিপির উদ্ভাবনার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন নেপথ্যে থাকা মিথ্যার কারিগরেরা। সংস্কৃত ঠিকমতো প্রকাশ করার উপযোগী সেই লিপির নাম দেওয়া হয়েছে 'গ্রন্থলিপি'।

প্রচারটা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে মনে হয় ওই লিপিতেই প্রাচীনকালে তামিলভাষীরা সংস্কৃত চর্চা করতেন। আসলে তা নয়। গ্রন্থলিপি কোনও লিপির নাম নয়। একটি প্রবঞ্চনার নাম। এখানে আর একটি প্রশ্ন আসছে। ভারতের নানান লিপিমালা সংস্কৃত ভাষার সব ধ্বনি প্রকাশক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কেবল ওই তামিল লিপিটাতেই ওই অক্ষমতা কেন আজও থেকে গেছে—এ-প্রশ্ন আসছেই। উত্তরে বলতে হয় ভাষা ও লিপির ব্যাপারে তামিল ভাষাভাষীরা সবচেয়ে বেশি রক্ষণশীল।

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন প্রচলনের গল্পটাকে প্রমাণসিদ্ধ বানানোর তাগিদে উচ্চারিত হয় না এমন সব ধ্বনিবোধক অক্ষর অন্য দ্রাবিড় ভাষায় চালু করা সম্ভব হলেও তামিল ভাষায় তা খুব কমই হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ওইসব ধ্বনিবোধক অক্ষর চালু করার ব্যাপারে তামিলভাষীদের অনীহা থেকে গিয়েছিল। ভাষা ও লিপির ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যবোধটাকেই তাঁরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে এই। একটা উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝানো যাক। খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ—এই দশটি মহাপ্রাণ বর্ণের ধ্বনি দ্রাবিড়গোষ্ঠীর কোনও ভাষাতেই ছিলনা—এখনও নেই। তবু ওইসব ধ্বনিবোধক অক্ষর কানাড়ী, মালয়ালাম ও তেলুগু লিপিতে রাখা হয়েছে। রাখা হয়নি শুধু তামিল লিপিতে। অদ্রাবিড় ভাষা থেকে তেলুগু, কানাড়ী বা মালয়ালাম ভাষায় এমন বেশ কিছু ধ্বনিযুক্ত শব্দ এসে গেছে যেসব ধ্বনি ওইসব ভাষায় কোনওকালে ছিল না—এখনও নেই। ওইসব শব্দ আসার সূত্রেই ওইসব ধ্বনি প্রকাশক্ষম অক্ষরের প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল ওইসব লিপিতে।

তামিল ভাষার ক্ষেত্রে অদ্রাবিড় ভাষার ধ্বনি প্রকাশ করার উপযোগী অক্ষর যে নতুন করে উদ্ভাবনার প্রয়োজন হয়নি তা নয়। হয়েছে তবে সে-ধরণের অক্ষরের সংখ্যা খুবই কম। আর সেসব অক্ষর ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও তামিলভাষীরা এমন কয়েকটি নিয়ম মেনে চলেছেন যা একান্তভাবেই তাঁদের নিজস্ব।

এক, অদ্রাবিড় উত্তর ভারতীয় ধ্বনি-প্রকাশক্ষম অক্ষর খাঁটি তামিল শব্দে তাঁরা ব্যাবহার করেন না।

দুই, সেইসব অক্ষর তাঁরা ব্যবহার করেন শুধু বহিরাগত এমন সব শব্দের ক্ষেত্রে যা তামিল ভাষায় মিলে মিশে একাকার হয়নি— যা সাহিত্যিক শব্দ হিসাবে শুধু শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই চলে। উল্টোদিকে, ওইসব অক্ষরযুক্ত শব্দ দেখেই বলে দেওয়া যায় ওগুলোকে তামিল ভাষা আত্মস্থ করে নেয়নি।

তিন, তামিল লিপির সংখ্যাল্পতা এবং সে ভাষায় অনুসৃত ধ্বনি-ঘটিত বেশ কিছু বিধিনিষেধের ফলে উত্তর ভারতীয় ভাষা থেকে আসা শব্দগুলোর উচ্চারণ তামিলভাষীদের মুখে এতটাই বিকৃত হয়ে পড়ে যে মূল শব্দের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ক্ষীণ হয়ে ওঠে। সোজা ভাষায় তামিলভাষীদের মুখে উত্তর ভারতীয় শব্দগুলো বিচিত্র উদ্ভট রূপে উচ্চারিত হয় যা অন্য কোনও দ্রাবিড় ভাষায় হয়না। ফলে তথাকথিত সংস্কৃত শব্দ বলে চালানো (আসলে মরাঠী, গুজরাতি, বাঙলা, ওড়িয়া-মূলক) ওইসব শব্দ তামিল ভাষীদের মুখে অতি মাত্রায় বিকৃত হয়েই উচ্চারিত হয়।

মজার কথা হল : বিকৃতির ফলে একদা উত্তর ভারতীয় শব্দ-গুলোর যে রূপ তামিল ভাষায় গড়ে উঠেছে তা তামিলভাষী সবাই মেনেও নিয়েছেন। আরও মজার কথা বিকৃত ওইসব উচ্চারণের সুকৃতি অর্থাৎ শুধরে নেওয়ার কথা তাঁদের কেউই ভাবেন না। ভাবেন না কারণ শব্দের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া রূপ গড়ে উঠলে তাকে শুধরে নেওয়ার ক্ষমতাও কারুর থাকে না। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার তথাকথিত পচনের মধ্য দিয়ে পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষা সৃষ্টির যে গল্পটা বানিয়ে রেখেছেন তা যে অবিশ্বাস্য তা এই ব্যাপারটা দেখেই বোঝা যায়। পচনের গল্পটা সত্যি হলে সংস্কৃত শব্দের পচে গলে যাওয়া বীভৎস সব রূপ পরবর্তীকালে শুধরে নিয়ে মরাঠী গুজরাতি, হিন্দী, বাঙলা ইত্যাদি আধুনিক উত্তর ভারতীয় ভাষার সুন্দর সুঠাম শব্দগুলো বানিয়ে নেওয়া সম্ভব হত না। পচন থেকে

নতুন কিছু আশা করা যায় না। পচে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ভাষা পচে না। পচে যাওয়ার গল্পটা পণ্ডিতেরা অর্ডারী লেখা হিসাবেই লিখেছিলেন। ঘটনা হচ্ছে এই।

## ঋগ্বেদের কুষ্মাণ্ডে মন্ত্রগুপ্তির তথ্যও ছিল

রামায়ণ-মহাভারতে মন্ত্রগুপ্তির প্রসঙ্গেও কিছু কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে'ও। এমনকি দুনিয়ার প্রাচীনতম কেতাব বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া ঋগ্বেদেও ওই মন্ত্রগুপ্তির বিপদের কথা জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছে ওই কেতাবেরই একটি 'কণ্ডিকা'য়। ঋগ্বেদের ঋষি-ছদ্মবেশী নেপথ্য লেখক মন্ত্রগুপ্তি-জনিত আতঙ্কের কথাও জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "তথ্য গোপন রাখার ব্যাপারে রাজপুরুষদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও উপায় নেই। মৃত্যুর পরেও তা তাড়িয়ে বেড়ায়।"

প্রশ্ন হল: প্রাচীন সব কেতাবে ওই মন্ত্রগুপ্তির তথ্যটা জানানোর দরকারটা পড়ল কেন? তবে কি মগজধোলাই কিংবা মন্ত্রগুপ্তি-নামক আধুনিক কালে উদ্ভাবিত অাঁতেলি কিংবা রাজনৈতিক ইণ্টেলি-জেন্সের তৈরি করে নেওয়া রাজনৈতিক গোপন কাণ্ডকারখানাটাকে প্রাচীন বলে চালানোর একটা চেষ্টা হিসাবেই প্রাচীন সব কেতাবে যত্ন করে ও:সব তথ্য রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল? প্রশ্নটা আসছেই কারণ তথাকথিত ক্রীতদাস-প্রথা, সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রচণ্ড সব সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী রাজারাজড়ার বানানো গল্পকথাগুলোকে প্রাচীন বলে চালানোর চেষ্টার পাশাপাশি মন্ত্রগুপ্তির ব্যবস্থাটাকেও প্রাচীন বলার উদ্যোগ-আয়োজন যে বেশ পরিকল্পনামাফিক নেওয়া হয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ইতিহাস লেখার কল্যাণে প্রাচীনকালে দেশে-দেশে কম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি—কম সাম্রাজ্য ভাঙেনি—দেশে-দেশে কম মানুষকে ক্রীতদাস বানানো হয়নি। নানান দেশে আর যারই অভাব থাকুক অত্যাচারী রাজা কিংবা

ক্রীতদাসের অভাব প্রাচীনকালে ঘটেনি। অন্তত: ইতিহাসের সাক্ষ্য তাই বলে।

প্রাচীনকালের অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের দুঃখ-কষ্টের কাহিনী লিখে হাত পাকাননি এমন ঐতিহাসিকের সংখ্যা খুবই কম। সেইসব মানুষের অপরিসীম সহনশীলতার ছবি নিরলসভাবে এঁকে চলেছেন ওই ইতিহাসের কারিগরেরা। আর তা আঁকার মধ্য দিয়ে যত না সত্যের প্রকাশ ঘটেছে তার চেয়ে বেশি প্রকট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ একটি বক্তব্য রাখার ইচ্ছাটাই। আসলে ব্যাপারটা কি?

আসলে আধুনিক কালের উদ্ভাবন ওই সাম্রাজ্যবাদ এবং তার প্রথম দিককার অপজাতক ওই ক্রীতদাসপ্রথা এবং ওই সাম্রাজ্যবাদী মহাপ্রভুদের দমনপীড়ন ও অত্যাচারের কর্মকাণ্ডটার মধ্যে যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু ছিল না—দুনিয়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসাবে রাষ্ট্র-শক্তির নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রদর্শনের অধিকার যে প্রাচীনকাল থেকেই এক শ্রেণীর মানুষ ভোগ করে আসছে—আর সেইসব প্রথা বা ব্যবস্থাকে যে মানুষ নিয়তির বিধান বলেই ভেবে আসছেন—এমনকি প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল বলে প্রচার করা ধর্মগুলো কিংবা সেইসব ধর্মের পণ্ডিতেরা যে ওইসব ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে বুনিয়ে নিয়েই বেঁচেবর্তে ছিলেন—এইসব ডাহা মিথ্যা কথাগুলোকে ইতিহাসের মূল বক্তব্য বলে জানানোর জন্যই ওইসব প্রথা বা ব্যবস্থাকে প্রাচীন বলে চালানোর চেষ্টা পণ্ডিতেরা করে চলেছেন। ঘটনা হচ্ছে এই।

আর একটা কথা। প্রাচীনকালের উৎপীড়িত মানুষগুলোর জীবন-যন্ত্রণার মর্মন্তুদ ছবিগুলো এঁকে ইতিহাসের পণ্ডিতেরা ওই ইতিহাস-টাকে যে একটু পাঠযোগ্য করে তুলেছেন তা মানতেই হয়। চরিত্র-চিত্রণে যে তাঁরা মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসটাকে একটা চলন্ত মিথ্যার চলচ্চিত্র না ভেবে জীবন্ত কিছু মানুষের শোভাযাত্রা বলে লোকে যে মনে করে বসেছে তার মূলে অতীতের মানুষের দুঃখকষ্টের গল্পগুলোর প্রভাব কম নয়। ইতিহাস

জীবন্ত হয়ে উঠেছে ওইসব গল্পের কল্যাণে। ইতিহাসের কতটুকু সত্যি—কতটা মিথ্যা—এসব প্রশ্ন না তুলে ক্রীতদাসের দুঃখের গল্প-গুলোকে সত্যি ভেবে বসেছে লোকে। গল্পগুলোর সত্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ তারা করেনি।

প্রশ্ন আরও আসছে। মন্ত্রগুপ্তির ব্যবস্থাটা যে প্রাচীনকালে চালু ছিল—একথা জানাতে গিয়ে নেপথ্যশিল্পীরা এত কাঁচা কাজ করে বসলেন কেন? প্রাচীন বলে চালানো ওইসব কেতাবের সবই যে আধুনিক জালিয়াতি। তাহলে? তবে কি কেতাবগুলোর জালিয়াতি যতদিন না ধরা পড়ে ততদিন অন্ততঃ মিথ্যাটা বেঁচে থাকুক এইটুকু তাঁরা চেয়েছিলেন? তাইত আসছে। আসলে মন্ত্রগুপ্তির ব্যবস্থাটা যে যুক্তিযুক্ত—আর তা যে রাষ্ট্রশক্তি প্রাচীনকাল থেকেই কাজে লাগাচ্ছে—এই বক্তব্য প্রচার করার জন্যই প্রাচীন বলে প্রচার করা কেতাবে মন্ত্রগুপ্তির তথ্য রাখা হয়েছিল। প্রাচীন-কাল থেকে চলে আসা সব প্রথাই যদি শাশ্বত বা সনাতন বলে মেনে নিতে হয় তবে মন্ত্রগুপ্তির ব্যবস্থাটাকেও মানতেই হয়—এই ওজরটাকেই যুক্তি হিসাবে দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

ঋগ্বেদের 'কণ্ডিকা'—শব্দটার একটা ইতিহাস আছে। গুজরাতি 'কডী'—শব্দের অর্থ Stanza। শব্দটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সংস্কৃত ঠাটের 'কণ্ডিকা' শব্দটা বানানো হয়েছিল। পণ্ডিতেরা যথারীতি উল্টো কথাই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন: 'সংস্কৃত 'কণ্ডিকা' থেকেই ওই গুজরাতি 'কডী'র জন্ম হয়েছিল। কণ্ডিকা থেকে কডী হওয়ার কথা নয়। হওয়ার কথা নয় কডী থেকে কণ্ডিকা-ও। কডী থেকে হওয়ার কথা কটিকা। তবু যে 'কণ্ডিকা' কেন হল তা বোধগম্য নয়। গাড়ী শব্দটা উত্তর ভারতের বেশির ভাগ ভাষায় চালু আছে। এ-থেকে সংস্কৃত 'কটিকা' বানানো হয়েছিল। প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে। তবে কি গুজরাতি থেকে না বানিয়ে হিন্দী কংডী থেকেই ওই 'কণ্ডিকা'-শব্দটা বানানো হয়েছিল? হিন্দী 'কংডী'-শব্দের অর্থ "থুপা হুআ/সুখায়া হুআ গোবর জো জলানে কো কামমে আতা

হৈ।" তবে কি ওই ঋগ্বেদটা যে ঐতিহাসিক তথ্যের আকর নয়—ওটা যে তথাকথিত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ নয়—ওটা যে মুখকর্ণপরম্পরায় বেঁচে থাকা 'শ্রুতি'-নামক আজব কাণ্ডকারখানার ফলশ্রুতি নয়—ওটা যে নেহাৎই জ্বালানী হিসাবে কাজে লাগার উপযোগী গুচ্ছের 'কংডী'র গাদা তা বোঝানোর জন্যই কি ভোজপুরী সাকরেদরা ওই বৈদিক শব্দটা বানিয়ে নিয়েছিলেন? তাইত আসছে। বৈদিক শ্লোক বা Stanza বোঝাতে আর একটি শব্দের জোগান দিয়েছিলেন বাঙালী নেপথ্যশিল্পীরা। শব্দটি হচ্ছে 'কুষ্মাণ্ড'। 'যা কোনও কাজে লাগে না'—এই অর্থে অকালকুষ্মণ্ড বা 'অকালকুষ্মাণ্ড'—শব্দটা বাঙলায় চালু আছে। বৈদিক শ্লোকগুলো যে কোনও কাজে লাগবে না—লাগার কথা নয়—এই সোজা কথাটা তাঁরা জানতেন বলেই কি Stanza অর্থে রসিকতা করে 'কুষ্মাণ্ড'-শব্দটার প্রয়োগ তাঁরা শুরু করেছিলেন? তাইত আসছে।

## অশোক-চক্র একটি চক্রান্তের নাম

ভারতের নানান জায়গায় বেশ কয়েকটি অশোক-স্তম্ভ পাওয়া গেছে বলে পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরেও ওই স্তম্ভের দুটি নিদর্শন রাখা আছে। সুমসৃণ চকচকে পাথর কুঁদে তৈরি করা ওইসব স্তম্ভের কোনওটাতেই অশোক-এর নাম খোদাই করে রাখা হয়নি—রাখা হয়নি কোনও নামই—রাখা হয়নি কোনও লিপিও। আজ যাঁরা অশোক-স্তম্ভের চিত্ররূপের নীচে 'সত্যমেব জয়তে' বাণী লিখে ভারত সরকারের একটি প্রতীক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বসেছেন তাঁরা জানেন না ওই স্তম্ভের সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই—সম্পর্ক নেই অশোকের—সম্পর্ক নেই বৌদ্ধধর্মেরও। সত্যের জয় ঘোষণার বাণী লেখার ব্যবস্থা হলেও প্রতীকটি অনেক মিথ্যার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

এক, প্রাচীন কালে ওই সংস্কৃত ভাষারই জন্ম হয়নি। 'এব'—নামক খাঁটি মরাঠী অব্যয়কে আত্মস্থ করে নিয়ে 'সত্যমেব' শব্দটা সংস্কৃত সেজে থাকলেও আসলে মরাঠী শব্দ। যেমন মরাঠী শব্দ সদৈব। উপনিষদ থেকে উদ্ধৃত ওই বাণী রাখার মধ্য দিয়ে প্রাচীন কালে যে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল তা জানাতে গিয়ে প্রথম মিথ্যার প্রকাশ ঘটেছে।

দুই, স্তম্ভটির সঙ্গে অশোকের নাম জড়ানোর প্রশ্নই ওঠেনা কারণ পণ্ডিতেরা যত জোর দিয়েই বলুন না কেন আর যত বড় পণ্ডিতই তাঁরা হোননা কেন—অশোক নেহাৎ-ই একটি গল্পের চরিত্রের নাম। নামটির ওপর ঐতিহাসিকত্ব আরোপ করার—সোজা ভাষায় ওই অশোককে ইতিহাসের এক নায়ক মনে করার কোনও কারণ নেই। দ্বিতীয় মিথ্যার প্রকাশ ঘটেছে ওই অশোককে ঐতিহাসিক পুরুষ বলে প্রচার করার মধ্য দিয়ে।

তিন, তথাকথিত অশোকস্তম্ভগুলো যে পাথরে তৈরি তা শুধু উত্তর ভারতের মির্জাপুরের ধারেকাছেই পাওয়া যায়। অন্যত্র নয়। স্তম্ভ-নামক ঢাউস সাইজের পাথুরে কাণ্ডকারখানা বানানোর উপযোগী পাথরের চাঁইগুলোকে প্রাচীনকালে ওই মির্জাপুর থেকে দূরের জায়গাগুলোতে কি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—এ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা কোনও কথা বলেননি। যানবাহনের সুযোগ সুবিধা প্রাচীন যুগে ততটা উন্নত ছিল বলে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রাচীন কালের কথা বাদ দিলাম। তথাকথিত মধ্যযুগের পাথুরে স্থাপত্যনিদর্শনের সবই স্থানীয় পাথর ব্যবহার করেই করা হয়েছিল। দূরের জায়গা থেকে তা বয়ে আনার প্রশ্নই ওঠেনি। কারণ তখন তা কল্পনাও করা যেতনা।

চার, 'স্তম্ভ'-গুলোর মোলায়েম আর চকচকে ভাবটাই ওইসব পাথরের অর্বাচীনত্বের বড় প্রমাণ হিসাবে কাজ করছে। আড়াই হাজার বছরের পুরনো পাথরের ন্যূনতম যে বিকৃতি হওয়ার কথা তাও হয়নি। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের দাপট হাজার আড়াই বছর সহ্য করে থাকা নিটোল

ওই মূর্তিমান মিথ্যাটার গায়ে বয়সের কোনও ছাপই পড়েনি। আসলে ওগুলো যে আধুনিক কালে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে রাখা ত্রিমাত্রিক ম্যাজিক তা বুঝতে পণ্ডিতদের কষ্ট হলেও সাধারণ লোকের হয় না।

আঠারো শ' আঠারো খ্রীষ্টাব্দের আগে প্রকাশিত ইতিহাসে অশোক-এর নামগন্ধ নেই। বিহারী একটি পদবী-নামকে কাজে লাগিয়ে 'মৌর্য' বংশের নামকরণ হয়েছিল ঠিকই। সে-বংশের কোন রাজা কত বছর কত মাস কত দিন রাজত্ব করেছিলেন—কার পরে কে—সবই ছিল ইতিহাসে। ছিল না শুধু ওই অশোকের নাম। ছিলনা তার কারণ 'ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট'-এর নামটা তখনও পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারেননি নেপথ্যে থাকা পণ্ডিতেরা।

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এইচ, এইচ, উইলসনের 'স্যান্স্ক্রিট ইংলিশ ডিক্সনারি-তে 'অশোক'-শব্দটা রাখা হয়েছিল। রাখা হয়েছিল একটি গাছের নাম হিসাবে কোনও সম্রাটের নাম হিসাবে নয়। যদিও তথাকথিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অনেক রাজারাজড়ার নাম ওই বইয়ে রাখা হয়েছিল। হয়নি শুধু ওই রাজার রাজার নাম। আসলে অশোক ( অশোগ নামও চলে )—নামক খাঁটি মরাঠী ব্যক্তি-নামটা কোনও সম্রাটের নাম হিসাবে আরোপ করার কথাটা প্রথম দিকে চিন্তাও করা হয়নি। আসলে প্রথম দিকে কল্পিত ওই মৌর্য বংশের কল্পিত ওই সম্রাটের নাম রাখা হয়েছিল 'অশোকবর্ধন'—অশোক নয়। না-অর্থক 'অশোক'-শব্দের সঙ্গে বর্ধন যোগ করাটা কোনও কোনও পণ্ডিতের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছিল। আর তাই পরে ওই 'বর্ধন' অংশটুকু বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নেওয়া হয় ১৮১৯-এরও পরে। ব্যাপারটা বেশ মজার। মজার কথা আরও আছে। ইংরিজি বা বাঙলা মহাভারতে না থাকলেও ওই অশোক-এর প্রসঙ্গ সংস্কৃত মহাভারতে রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে 'অশোক' হিসাবে—অশোকবর্ধন হিসাবে নয়।

বুঝতে কষ্ট হয় না সংস্কৃত মহাভারতের ওই অশোকের তথ্যসমৃদ্ধ

অংশটি ১৮১৯-এরও পরে লেখা হয়েছে। প্রমাণ আরও আছে। বাঙলার তমলুক স্থাননামটাকে সংস্কৃত সাজিয়ে প্রথমে 'তামলিপ্ত' বানানো হয়েছিল। ১৮১৯-এ প্রকাশিত উইলসনের ওই ডিক্সনারিতে 'তামলিপ্ত' নামটা রাখা হয়েছে। তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত নামটা তখনও বানানো হয়ে ওঠেনি। মজার কথা হল ইংরিজি বা বাঙলা মহাভারতে 'তাম্রলিপ্ত' নামটা ব্যবহার করা না হলেও সংস্কৃত মহাভারতে কিন্তু ওই 'তাম্রলিপ্ত' নামটাই ব্যবহার করা হয়েছিল। বুঝতে কষ্ট হয় না আঠারো শ' উনিশেরও পরেই তাম্রলিপ্তের প্রসঙ্গ-সমৃদ্ধ অংশটা সংস্কৃত মহাভারতে লেখা হয়েছিল।

তথাকথিত অশোক-স্তম্ভ বা অশোক-চক্রের মতোই অশোক-শিলালিপিটাও আর এক কারসাজি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হওয়া তথাকথিত অশোক শিলালিপি জোগাড় করার খেলাটা সাম্প্রতিককালেও খেলা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি অশোকের অস্তিত্বের যত প্রমাণ রাখা হয়েছে ততটা প্রাচীন কালের আর কোনও ব্যক্তির নামে বানানো হয়নি। মজার কথা হল উনিশ শতকের যাঁরাই ওই অশোক শিলালিপির সন্ধান দিতেন তাঁরাই রায়বাহাদুর বা মহামহোপাধ্যায় খেতাব পেয়ে যেতেন। খেতাব পাননি এমন একজনও ওই শিলালিপির সন্ধান দেননি। ব্যাপারটা বেশ মজার। কেউ যে সন্দেহ করেননি—এ ব্যাপারটাও কম মজার নয়। আসলে শিলালিপি, তাম্রশাসন কিংবা তথাকথিত প্রত্নমুদ্রার সম্ভারের খোঁজখবর দেওয়াটা এক শ্রেণীর মানুষের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর এঁরাই পেতেন ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতা! এঁরাই কুড়োতেন খেতাব।

অশোক শিলালিপির কোনওটিতেই অশোক-নামটা ব্যবহার করা হয়নি। করা হয়েছিল 'দেবানাম্পিঅ' শব্দটা। প্রশ্ন আসছেই।

এক, নিজের নাম লেখানোর ব্যবস্থা না করে শিলালিপিগুলোতে

ওই 'দেবানাম্‌পিঅ' শব্দটা খোদাই করে রাখার ব্যবস্থা ওই অশোক করতে দিলেন কেন?

দুই, 'দেবানাম্‌পিঅ' শব্দটির দুটি অর্থ, এক, বোকা—দুই, ছাগল। শব্দটির সংস্কৃত ও বৈদিক সংস্কৃত রূপ 'দেবানাম্‌প্রিয়' আর তা থেকে উচ্চারণগত বিকৃতির মধ্য দিয়েই যে ওই শিলালিপির প্রাকৃত 'দেবানাম্‌পিঅ' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছিল তা পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম; ভালো ভালো রাজ্যের বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও নিজের নামের বদলে আত্ম-অবমাননাকর ওই ভূতুড়ে বিশেষণটাকে তিনি ব্যবহার করতে দিলেন কেন? তিন, 'দেবানাম্‌প্রিয়' শব্দটির ওই ভূতুড়ে অর্থটা কে আবিষ্কার করেছিলেন? beloved of the gods অর্থবহ শব্দটির ওপরে ওই অর্থ চাপানোর দরকার পড়েছিল কেন?

এসব প্রশ্ন আসছেই। আসলে প্রচলিত শব্দের ওপরে ভূতুড়ে সব অর্থ আরোপ করে মিথ্যার কারবারীরা অনেক খেলাই খেলেছেন। আর সে খেলার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে চার খণ্ডে সমাপ্ত রাজ্যের মিথ্যার ভাণ্ডার ওই বেদ-টাই। দেবানাম্‌প্রিয়' শব্দটা একই সঙ্গে সংস্কৃত ও বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রাখা হয়েছিল। রাখা হয়েছিল একই অর্থে। প্রশ্ন হল বৈদিক কিংবা সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহার করা শব্দের ওপরে উল্টোপাল্টা নানান সব অর্থ আরোপই বা করলেন কারা—সেই সব অর্থ তাঁরা জানতেই বা পারলেন কি করে—আর সে সব অর্থকে পণ্ডিতেরা অম্লান বদনে কেনই-বা মেনে নিলেন—এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ দেননি। দেবানাম্‌প্রিয় শব্দের ওপরে ওই ভূতুড়ে অর্থ আরোপ করা হলেও কেউ সন্দেহ করেননি কেন? তবে কি পাঠকের দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই শব্দের ভুলভাল উল্টোপাল্টা অর্থ আরোপ করার খেলাটা সাহেব পণ্ডিতেরা খেলতেন? ভারতের তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতেরা খেলাটা দেখে বাহবা জানিয়ে কি নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতেন? তাইত আসছে।

## 'প্রক্ষিপ্ত'—কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রাচীনকালে রামের লেখা বইয়ে শ্যাম কিংবা যদু মধুরা নিজেদের লেখা ঢুকিয়ে দিতেন। বইয়ের অংশবিশেষ খেটেখুটে লিখেও নিজেদের নামগুলো তাঁরা গোপন রাখতেন। কেন যে গোপন রাখতেন সে-ও এক রহস্য। তবে পণ্ডিতেরা ওই রহস্যের কথা স্বীকার করেননি। তাঁরা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক একটি ঘটনা বলেই মেনে নিয়েছেন। কোনও সন্দেহও প্রকাশ করেননি। ব্যাপারটাকে তাঁরা রামের হয়ে শ্যামের ভোট দেওয়ার মতোই স্বাভাবিক ভেবে বসেছেন। রামের লেখার মধ্যে শ্যামের লেখা ঢুকিয়ে দেওয়ার ওই কর্মকাণ্ডকে সংস্কৃতে 'প্রক্ষেপ' আর 'ঢুকিয়ে দেওয়া' লেখাগুলোকে 'প্রক্ষিপ্ত' বলা হয়েছে। 'প্রক্ষি'-মার্কা কাজের আর কী-ই বা নাম রাখা যায়! 'প্রক্ষিপ্ত'—শব্দটা 'ফেলে দেওয়া' —অর্থে মরাঠী ভাষায় চালু আছে—'ঢুকিয়ে দেওয়া'—অর্থে নেই। উল্টো কাজের এক নাম হওয়ার কথাও নয়। Spurious insertion বা interpolation—অর্থবহ দু-নম্বরী কর্মকাণ্ডের এত সুন্দর একটি প্রতিশব্দ প্রাচীন কালে তৈরি হয়েছিল জেনে সন্দেহ হয়। যেকালে বইপত্র লেখার এক নম্বরী কাণ্ডই হত না—সেকালে ওই দু-নম্বরী কাণ্ড হত কি করে? দু-নম্বরী যা কিছু দেখছি সবই যে আধুনিক। তাহলে?

মজার কথা হল এই: আধুনিক যুগের দিকপাল পণ্ডিতেরা কিন্তু তত্ত্বগতভাবে প্রাচীন কালের 'প্রক্ষেপ'-এর গল্পকথাগুলোকে বিশ্বাস করে বসেছেন। শুধু বিশ্বাস করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি। রাজ্যের মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে 'প্রক্ষেপ'—নামক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে মিথ্যার কারবারীদের বিপদতারণের ভূমিকাতেও তাঁরা নেমেছেন। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে লেখা বলে প্রচার করা একটি সংস্কৃত কেতাবে পেঁপে, পেয়ারা ও আতার দ্রব্যগুণ বোঝানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। পেঁপেকে সংস্কৃত

সাজানো হয়েছিল হিন্দী 'পপীতা'-কে আত্মসাৎ করে। পেয়ারা-কে 'পারাবত' বানিয়ে সংস্কৃত বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আতা-কে 'আতৃপ্য' বলেই পরিবেশন করা হয়েছিল। প্রাচীনকালের মুখরোচক ওই গল্প শুনেই সন্দেহবাদীরা চেপে ধরলেন। বললেন: ওসব যে এ-তল্লাটে সেযুগে ছিল না। আমেরিকা আবিষ্কারের আগে ও-সবের কথা এদেশে জানতেনই-বা কে—লিখলেনই-বা কে? কেতাবটা যে আধুনিক জালিয়াতি তা ধরে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে একদল পণ্ডিত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বললেন: না, বইগুলো জাল নয়। খাঁটি। তবে বিজাতীয় ফলের প্রসঙ্গটা প্রক্ষিপ্ত।

মহাভারতে অশোক এবং বুদ্ধের প্রসঙ্গ থাকাতে এক শ্রেণীর পণ্ডিত বইটিকে ইতিহাস ভেবে বসেছেন। ওই দুই মহান ব্যক্তির উল্লেখ থাকাতে বইটি যে অশোক-এর জন্মের পরে লেখা হয়েছে এমন একটি তত্ত্বও আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন—আবার আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত ওই বুদ্ধ কিংবা অশোকের প্রসঙ্গটা যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে—এই ভেবেই আনন্দ পেয়েছেন। পণ্ডিতেরা যে কত কায়দায় বিভ্রান্ত হয়েছেন সেইটাই লক্ষ্য করার মতো। জাল বইয়ের জালিয়াতিটাই কেউ ধরতে পারেননি।

দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত বাঙলা মহাভারতের সাম্প্রতিক সংস্করণে 'অশ্রুজল'—শব্দবন্ধটি ঢুকে বসে আছে। মরাঠী 'অশ্রু'-র মধ্যে জলের সংস্থান ছিল। ছন্দের খাতিরে তার ওপরে বাড়তি জল ঢেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর তৈরি করে নেওয়া ওই অশ্রুজল যে কি করে কাশিদাসের মহাভারতে ঢালা হল সেইটাই রহস্যের। আসলে প্রক্ষেপ করার কাজটা প্রাচীন কালে চালু ছিল বলে পণ্ডিতেরা জানালেও তা সেকালে চালু ছিলনা। তবে আধুনিক কালে যে ওই প্রক্ষেপ করার মহান কাজটা করা হয়েছে তার প্রমাণ ওই মহাভারত এবং রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর'। সুভাষচন্দ্রের নাম জড়ানো কালান্তরের একটি প্রবন্ধ যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়—ওটা

যে চলতি বাঙলায় গোঁজামাল—সুন্দর ভাষায় 'প্রক্ষিপ্ত' তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়।

কীর্তিবাস-এর লেখা বাঙলা রামায়ণ আর কাশিদাস-এর লেখা বাঙলা মহাভারতের প্রথম সংস্করণের (প্রকাশকাল ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দ) বইদুটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। বইদুটির কলেবর কালক্রমে বাড়তে বাড়তে আজ যা দাঁড়িয়েছে তা ওই প্রথম সংস্করণের বইদুটির যে দেড়গুণেরও বেশি হবে তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। প্রথম ও আধুনিকতম সংস্করণের বইগুলো খুঁটিয়ে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয়না কোন অংশ আদি গ্রন্থে ছিল আর কোন অংশ পরবর্তীকালে 'প্রক্ষেপ' করা হয়েছে। প্রশ্ন হল: বাড়তি লেখাগুলো কারা জোগালেন? তাঁদের নামগুলো জানা যাচ্ছেনা কেন? তবে কি নাম গোপন রাখার পেছনে তাঁদের কোনও স্বার্থ ছিল? তবে কি ওই সব 'প্রক্ষেপ'কারেরা কিছু অর্থের বিনিময়ে নিজেদের নামপ্রকাশে বিরত ছিলেন? তবে কি তাঁদের মুখ বন্ধ করে রাখার জন্য অন্য কেউ তাঁদের টাকাপয়সা দিতেন? এখানে একটি বড় প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। তবে কি তাঁদের মন্ত্রগুপ্তির জালে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল? আর সেইজন্যই কি তাঁরা ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলেন? আর একটা কথা। ওই জালে জড়ানোর ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের হাতে থাকে না। থাকে শুধু রাষ্ট্রের হাতে। তবে কি পুরো ব্যাপারটার পেছনে রাষ্ট্রের বা সরকারের মতলববাজি কাজ করেছিল? তাইত আসছে। কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর 'প্রক্ষিপ্ত' অংশ আবিষ্কার করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। সাম্প্রতিককালে সুকুমার সেন মহাশয়ও কাব্যটির মধ্যে কিছু 'প্রক্ষেপ'-এর সন্ধান পেয়েছেন। কম্বল থেকে লোম বাছতে গেলে এই হয়। প্রাচীন সাহিত্যের ষোল-আনা অংশই প্রক্ষিপ্ত। ষোল-আনাই বেনামে লেখা।

# বেদ-উপনিষদের অনুবাদ লেখার ম্যাজিক

বেদ-উপনিষদের অনেক মহিমা। ইতিহাসের পণ্ডিতেরা ওই বেদকে ভারত ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ ভেবে পাণ্ডিত্য ফলিয়েছেন। দর্শনের পণ্ডিতেরা ওই উপনিষদকে নিয়ে কম নাচানাচি করেননি। ভারত সরকারের ইন্টেলিজেন্স দপ্তরের কৃপাধন্য সাধু-সন্ন্যাসীর দল দেশেবিদেশে বেদপাঠের কিংবা বেদান্ত-অনুধ্যানের অনেক প্রতিষ্ঠানই খুলেছেন। সবই হয়েছে। হয়নি শুধু ওই বেদ-উপনিষদ সম্পর্কিত আসল সত্যের প্রকাশ। আসলে ওসবই বিশুদ্ধ বুজরুকির নানান নাম। সবই নানান কায়দার চালাকি। সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলে চালানো প্রচণ্ড মিথ্যার বেসাতি। মিথ্যাটাকে সত্যি বলে চালানোর জন্যই রসিকতা করে বইগুলোর ওপর বেদ-বেদান্ত নাম চাপানো হয়েছিল। বেদ মানে সত্য। বেদবাক্য মানে সত্যি কথা। বেদ-শব্দের অর্থবহতা অ-মরাঠী কোনও ভাষায় না থাকলেও বেদবাক্য শব্দের চল ভারতের অনেক ভাষায় আছে। আছে সঠিক অর্থেই। আসলে 'বেদ' খাঁটি মরাঠী শব্দ যার একটিই অর্থ আর তা হচ্ছে সত্য।

মজার কথা হল: মরাঠী বেদ শব্দকে সংস্কৃত ভাষায় রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য অর্থে। সে ভাষায় বেদ মানে জ্ঞান। বিদ্-ধাতু (=জানা) থেকে নিষ্পন্ন বলে প্রচার করা ওই 'বেদ'-এর সঙ্গে ইংরিজি 'wit'-এর আত্মীয়তা থাকার গল্প আবিষ্কার করে আনন্দ পেয়েছেন পণ্ডিতেরা। আসলে শব্দদুটির মধ্যে কোনও সম্পর্কই নেই। থাকার কথাটা আজগুবি।

উপনিষদ নামক চালাকিটাকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার এক নম্বর ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন রামমোহন রায়। সংস্কৃত উপ-নিষদগুলোর কোনও পুঁথি পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছিল কিছু উপনিষদের ফারসী অনুবাদ। অন্ততঃ প্রচারটা সেইরকমই রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন আসছেই : এক, সেইসব ফারসী তর্জমা থেকে সোজাসুজি তা সংস্কৃত ভাষায় ছাপা হল কি করে ?

দুই, তবে কি ওই ফারসী তর্জমা থেকে আগে সংস্কৃত অনুবাদ করে নিয়ে পরে তা ছাপা হয়েছিল ? তাই যদি হবে তবে সেই অনুবাদের কাজটি যিনি করেছিলেন তিনি তাঁর নামটি গোপন রাখতে গেলেন কেন ? তবে কি তাঁকে তাঁর নাম জানাতে বারণ করা হয়েছিল।

তিন, বাকি উপনিষদগুলোর ফারসী অনুবাদ ত ছিলনা—সেগুলোর সংস্কৃত অনুবাদই-বা করা হল কি করে ? তবে কি উপ-নিষদগুলোর ফারসী তর্জমা থাকার কথাটা নেহাত-ই একটা ভাঁওতা ? বেদ-উপনিষদকে মুখস্থ করে বাঁচিয়ে রাখার গল্পটাকে কেউ কেউ সন্দেহ করে বসতে পারে—একথা ভেবেই কি ওই ফারসী অনুবাদ থাকার গল্পটা বানানো হয়েছিল ? কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাচ্ছিনা।

উল্টো দিক দিয়ে এগুনো যাক। বেশ কিছু উপনিষদের বাঙলা, হিন্দী ও ইংরিজি অনুবাদ যে রামমোহন রায় নিজেই করেছিলেন—এই কথাই জানানো হয়েছে। প্রশ্ন আসছেই :

এক, রামমোহন সংস্কৃতটা শিখলেন কবে ? কোথায় ? কতদিন ধরে তিনি ভাষাটা শিখেছিলেন ?

দুই, তাঁর জীবনী-গ্রন্থে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহজনক কিছু তথ্যই রাখা হয়েছিল। 'সেকালে শিক্ষার স্থান ছিল তিনটি—পাঠশালা, চতুষ্পাঠী বা টোল ও মক্তব। মক্তবে তিনি ফারসী ও আরবী ভাষার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন।' তিনি একসঙ্গে তিন জায়গায় ভর্তি হয়েছিলেন ? 'চতুষ্পাঠী'-নামের জন্মই তখনও হয়নি। ওড়িয়া 'চউপাড়ি'-কে সাজিয়ে গুছিয়ে 'চতুষ্পাঠী' বানানোর কাজটা কি তখন হয়েছিল ?

তিন, বাঙলা-ভাষী নানান জেলায় ( বিশেষ করে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণায় ) সংস্কৃত শিক্ষার টোল খোলা শুরু হয় আঠারো শ' কুড়ি খ্রীস্টাব্দে। তার আগে কেন তা হয়নি—এই গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্নটাই কেউ করেননি। করলেই রহস্যটা ধরা পড়ে যেত। আসলে তার আগে সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির গোপন কর্মকাণ্ড চলতে থাকলেও সে ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা কোথাও হয়নি।

১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে বনারসে সংস্কৃত 'কলেজ' খোলা হলেও সেখানে ভাষা শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই প্রথম দিকে ছিলনা। ছিল নানান ভাষার শব্দের গোঁজামিলে সংস্কৃত নামক প্রাচীন (?) এক ভাষা বানানোর আধুনিক এক কর্মশালা। আসলে ভাষাটা যে সারা ভারতে আদ্যিকালে প্রচলিত ছিল এবং ইংরেজদের ভারতে আসার পরে শুধু বাঙলাভাষী অঞ্চলেই যে তার চর্চা সবচেয়ে বেশি হত— এই সন্দেহজনক ব্যাপারটা যাতে লোকে ধরে না ফেলে সেইজন্যই ভারতের নানান জায়গায় ওই ভাষা বানানোর নেপথ্য কর্মকাণ্ড চালানোর কয়েকটি কর্মশালা খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেসব জায়গায় কসরৎ করে শব্দ বানানোর মজাদার এক খেলা শুরু হয়েছিল। সে যাই হোক, রামমোহনের ছাত্রাবস্থায় কোনও টোলের প্রতিষ্ঠা হয়নি। ঘটনা হচ্ছে এই।

চার, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই তিনি গোপনে ভাষাটা শিখে নিয়েছিলেন তাহলেও আর এক প্রশ্ন এসে যায়। তিনি কি ভাষাটা এত ভালো শিখে ফেলেছিলেন যে দুরূহ তত্ত্বে বোঝাই ওই উপনিষদগুলোর অনুবাদ করার দায়িত্ব তিনি নিয়ে বসলেন?

পাঁচ, উপনিষদগুলোর যেসব বাঙলা অনুবাদ তিনি করেছিলেন বলে জানানো হয়েছে তার ভাষার মান বেশ উঁচু দরেরই ছিল। রামমোহনের লেখা বাঙলা ছিল আড়ষ্টমার্কা। বড় বড় বাক্য বানাতে গিয়ে তালগোল পাকানো বক্তব্য—ভুলভাল বাঙলা—ত্রুটি-পূর্ণ বাক্যবিন্যাস—সবই ছিল তাঁর ভাষায়। উল্টো দিকে উপনিষদের অনুবাদের ভাষা ছিল বেশ ঝরঝরে। ছোট ছোট কথায় ভাব প্রকাশের এমন সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গী ব্যবহার করা হয়েছিল যা সে-যুগের বিচারে যে উন্নত ছিল এ কথা বলতেই হয়। সমসাময়িককালে একই ব্যক্তির ব্যবহার করা ভাষায় এত তফাৎ থাকার কথা নয়।

ছয়, উপনিষদের ধাঁধা-মার্কা বাণীর হিন্দী ও ইংরিজি তর্জমা করার মতো ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন—ভাষা দুটিতে তাঁর সে-রকম দখল ছিল—এমন কিছু মনে করার কারণ নেই। আসলে ব্রিটিশ সরকারের একটি আঁতেলি চক্রান্তের শরিক তিনি হয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা যিনি নিয়েছিলেন তিনি একই সঙ্গে ভূতুড়ে ধর্ম ও দর্শনের প্রসারে উঠে পড়ে লাগবেন এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে প্রতিক্রিয়াশীল ওইসব ধর্ম ও দর্শনের গোঁজামিলটাকে কিছুটা জাতে তুলতে ওই রামমোহনের নামটাকে কাজে লাগানো হয়েছিল এবং তাঁর নাম জড়িয়ে ওইসব অনুবাদ লেখানোর মিথ্যা প্রচারটাকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন—কিংবা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঘটনা হচ্ছে এই। রামের লেখাকে শ্যামের লেখা বলে চালানোর খেলা ব্রিটিশ সরকার কম করেননি। অমুক বিদ্যাসাগর তমুক মহামহোপাধ্যায়ের লেখাগুলোকে বিচিত্র সব নামের মুনির কিংবা ঋষির লেখা বলে চালানোর উনিশ শতকী ম্যাজিকটাকে পণ্ডিতেরা বোঝেননি—এইটাই আশ্চর্যের।

বেদ-সম্পর্কে দু-নম্বরের ম্যাজিকটা দেখিয়েছিলেন বনারস-গাজীপুরের বেদ-রচনার নেপথ্য-শিল্পীরা। বেদের কোনও পুঁথি পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি তার কোনও ফারসী অনুবাদও। সেই 'নেই-পুঁথি'-র মতলব থেকে তার টীকাটিপ্পনী-সহ সংস্কৃত অনুবাদ মহীধর-সায়নাচার্য-ছদ্মনামের আড়ালে থাকা শিল্পীরা কোন ম্যাজিকে বানালেন—আর কি করে তা ছাপা হল—এ প্রশ্ন কেউ তোলেননি। বেদের ভূতুড়ে ভাষার ভূতুড়ে-তর শব্দের মধ্যে বেশ কিছু ল্যাটিন ও গ্রিক-মূলক শব্দের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—পাওয়া যাচ্ছে আইরিশ-মূলক কারোতর শব্দেরও সন্ধান। প্রশ্ন হল আধুনিক কালে বানিয়ে নেওয়া ল্যাটিন শব্দ সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ওই বৈদিক ভাষায় এল কি করে? প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যাক।

এক, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ( ১৭৭১ ) প্রথম সংস্করণের গ্রন্থটিতে ল্যাটিন ভাষা সম্পর্কে মামুলি এবং অসম্পূর্ণ কিছু তথ্যই রাখা হয়েছিল। বুঝতে কষ্ট হয়না তখনও পর্যন্ত ভাষাটির উদ্ভাবনার কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি। হয়েছিল আরও বেশ কিছু বছর পরে।

দুই, বইটিতে ভারত-সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রাখা হলেও সংস্কৃত ভাষার নামগন্ধ কিছুই ছিল না। বুঝতে কষ্ট হয়না সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন কালে প্রচলিত থাকার গল্পত' দূরের কথা—ওই ভাষার নামই তখনও পর্যন্ত ওই কোষগ্রন্থের সম্পাদক বা নিবন্ধলেখক শোনেননি। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় সংস্কৃতের উদ্ভাবনার কিছু আগেই ওই ল্যাটিন ভাষা বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল আর তা নেওয়া হয়েছিল বলেই সংস্কৃতে ল্যাটিন শব্দের আদলে বানানো শব্দ রাখা সম্ভব হয়েছিল।

প্রশ্ন আরও আসছে। তবে কি ল্যাটিন ভাষা বানিয়ে নেওয়ার পরে ওই বেদ লেখা হয়েছিল? তাইত আসছে। ল্যাটিন alvus calvus, eurus; venus, vir থেকে উল্ব, কুল্ব, উরূ, বনস্, বীর শব্দগুলো বানিয়ে ঋগ্বেদে রাখা হয়েছিল। রাখা হয়েছিল একই অর্থে। ল্যাটিন mox-কে 'মক্ষু' সাজিয়ে নিয়ে ওই বেদে (6, 45, 14) একই অর্থে রাখা হয়েছিল।

বাঙলা-মূলক সংস্কৃত কোকিল শব্দের সঙ্গে ল্যাটিনের cuculus-এর কিছু মিল আছে। এসব শব্দ ল্যাটিন ভাষার অর্বাচীনত্বের প্রমাণ হিসাবে কাজ করে। ইংরিজি eat থেকে ল্যাটিন edo ও সংস্কৃত অদ্ ধাতু—ইংরিজি sit থেকে ল্যাটিন sedeo ও বৈদিক সীদ ধাতু বানানোর আয়োজন দেখে বুঝতে কষ্ট হয়না ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির কাজে নেপথ্যে ইংরেজি ভাষা-ভাষীদেরও কর্মতৎপরতা ছিল।

প্রসঙ্গ থেকে একটু দূরে সরে এসেছি। ফেরা যাক। বেদ-সম্পর্কে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের নামের তালিকায় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামও ছিল। প্রশ্ন আসছেই।

এক, বিদ্যাসাগর মহাশয় বৈদিক ভাষা শিখলেন কবে? তাঁর লেখাজোখায় ওই বৈদিক ভাষা সম্পর্কে একটি কথাও তিনি লেখেননি কেন? তিনি সংস্কৃত ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন। সে ভাষায় কাব্য রচনার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তবে তিনি ওই বৈদিক ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন—তথ্যদৃষ্টে একথা মেনে নিতে কষ্ট হয়।

দুই, বৈদিক ভাষা যদি তিনি জানতেনই তবে সেকথা তিনি গোপন রাখতে গেলেন কেন? তবে কি তাঁকে সেসব গোপন রাখতে কেউ বাধ্য করেছিলেন? তবে কি স্বীকার না করলেও ওই বৈদিক ভাষা তিনি সত্যিই জানতেন?

তিন, বৈদিক ভাষা যদি তিনি নাই জানতেন তবে তাঁকে ওই ভাষায় অভিজ্ঞ বলে জানানোর দরকারটা পড়ল কেন? তবে কি ধাঁধা-মার্কা ভাষায় লেখা বেদের কিছু অংশ তিনি নিজেই লিখেছিলেন? কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

বৈদিক ভাষাভিজ্ঞ হোন বা না হোন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ওই ঋগ্বেদের বাঙলা অনুবাদ করার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন তা জানা যাচ্ছে ওই বাঙলা ঋগ্বেদের ভূমিকায়। রমেশ চন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় ওই অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। সে অনুবাদ যে দত্ত মহাশয় নিজে করেননি তা বইটির ভাষাগত গুণমান বিচার করলে বুঝতে কষ্ট হয়না। ভাষা দেখে লেখককে সনাক্ত করে নেওয়া যায়।

বাঙলা ঋগ্বেদের ভাষার মান খুব উঁচু ছিল। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ওই ধরণের ভাষায় লেখার ক্ষমতা একজনেরই ছিল আর তা ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই। বাঙলা ঋগ্বেদের অংশবিশেষ নয়—পুরো বইটির ভাষার মান একই রকম উন্নত ছিল। একজনের লেখা না হলে ভাষার মান সমান থাকার কথা নয়। আসলে পুরো বইটি বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই লেখা। প্রশ্ন আসছেই। অনুবাদের কাজটা পুরোপুরি নিজে করেও বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন তা স্বীকার

করেননি? তবে কি তাঁকেও মন্ত্রগুপ্তির জালে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল? তবে কি ব্রিটিশ সরকারের চাপে তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন। আর তা করেছিলেন বলেই কি তিনি সব কিছু চেপে গিয়েছিলেন? তাঁর নাম জড়িয়ে বাঙলা বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগের যে সংস্করণগুলো তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল তার বেশ কিছু অংশ যে তাঁর নিজের লেখা নয়—একথা গোপন রাখতে কি তিনি বাধ্য হয়েছিলেন? আর সেইজন্যই কি তিনি তা জানাননি? আসলে ব্রিটিশ সরকারের আঁতেলি কর্মকাণ্ডে তিনি সহযোগিতা করে-ছিলেন কিংবা করতে বাধ্য হয়েছিলেন এইটাই রূঢ় সত্য। তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি সরকারী চাকরী করতেন। সহ-যোগিতা না করে তাঁর উপায় ছিলনা। যেমন উপায় ছিলনা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতদেরও। উনিশ শতকের তথাকথিত রেনেসাঁস এবং সংস্কার আন্দোলনের কর্ম-কর্তাদের কেউই মনেপ্রাণে ব্রিটিশ-বিরোধী ছিলেন না।

প্রসঙ্গতঃ, দেশের এক শ্রেণীর মানুষকে রাজনীতির মঞ্চে এনে তাঁদের দিয়ে এজেন্ট বানানোর খেলা উনিশ শতকের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল। তার আগে আঁতেলি ইন্টেলিজেন্সের খেলার জোরটাই ছিল বেশি।

## স্থাননামকে প্রাচীন সাজানোর খেলা

ইতিহাসে ঠাঁই পাওয়া স্থাননামগুলোর জন্মের ইতিহাসটাও বেশ মজার। ইতিহাসসংশ্লিষ্ট জায়গার নাম, পাহাড়-পর্বতের নাম, নদীনালার নাম—এককথায় ভৌগোলিক নামগুলোকে প্রাচীন সাজানোর দরকার পড়েছিল। নামগুলোকে প্রাচীন গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত কিংবা প্রাচীন চীনা ভাষায় কি বলা হত—তা জানানোর ব্যবস্থা ইতিহাসের বইয়ে বেশ যত্ন করেই রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে ওগুলোকে আদ্যিকালের বলে চালাতে। ভাষাগুলো প্রাচীন হলে নামগুলোও প্রাচীন না হয়ে যায়না। নেপথ্যে থাকা পণ্ডিতেরা সেইজন্যই ওইসব ভাষায় নাম বানানোর খেলা খেলেছিলেন। খেলাটা না বোঝার কথা নয়। একই খেলা ইউরোপেও হয়েছে—হয়েছে এসিয়ার নানান দেশেই। ইউরোপে হয়েছে নানান ভাষার স্থাননামের ল্যাটিন ও প্রাচীন গ্রিক রূপ বানানোর আয়োজন। নামগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে নিয়ে শেষে um, ia, ie ইত্যাদি অর্থহীন অংশ জোড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতে হয়েছে ওইসব নামের সংস্কৃত ঠাটের রূপ বানিয়ে তার ব্যুৎপত্তি-রহস্যের গল্প বানানোর আয়োজন। চিনা ভাষায় ওইসব নাম লেখার ব্যবস্থা আর এক কায়দায় করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে।

মজার কথা হল : প্রাচীন সাজানো ওইসব নামের বেশির ভাগই কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত স্থাননামের আধারেই বানানো হয়েছে। কল্পিত নাম চাপানো হয়েছে খুবই কম। নতুন নামকে পুরনো বলে চালাতে গিয়ে নেপথ্যশিল্পীরা নানান গোলমাল পাকিয়ে বসেছেন। এমন সব জায়গাকে প্রাচীন বলে চালানো হয়েছে যা মোটেই প্রাচীন নয়। আধুনিক নামকে প্রাচীন সাজাতে গিয়ে কিছু বুদ্ধির খেলাও যে তাঁরা খেলেননি তা নয় তবে শেষরক্ষা তাঁরা করতে পারেননি। ধরা পড়ে গিয়েছেন। চালাকির দ্বারা মহান কাজ ত দূরের কথা—কোনও কাজই হয়না। হয় পণ্ডশ্রম।

বাচস্পতিবাবুদের কিছু পণ্ডশ্রমের নমুনা দেওয়া যাক।

স্থাননাম (এমনকি শব্দের মধ্যেও) মাচ, মিচ কিছু একটা পেয়ে গেলেই বাঙালী পণ্ডিতেরা মাছের গন্ধ আবিষ্কার করতেন। রাজপুতানার (বর্তমানে রাজস্থানের) মাচেড়ি-কে মৎস্য—বাঙলা মিছরি-কে মৎস্যণ্ডী বলে তাঁরা চালিয়ে দিতেন—প্রাচীন সংস্কৃত স্থাননাম বা শব্দ বলে জানাতেন। মাচেড়ি-কে এখনও সবাই ওই নামেই জানে।

পঞ্জাবের গুরদাসপুর এমন কিছু প্রাচীন সহর নয়। এই নামের আধারে এক প্রাচীন জনপদের সংস্কৃত নাম রাখার ব্যবস্থা হল। গুরদাসপুর→গুর্‌দা→গুর্তা→গর্ত→ত্রিগর্ত। গর্ত-শব্দটা খাঁটি বাঙলা। নেপথ্যে থাকা বাঙালী পণ্ডিত ওই গুরদাসপুর থেকে গর্ত-সমৃদ্ধ নাম বানিয়ে প্রাচীন (?) কেতাবে রাখলেন।

আসামের (বর্তমানে অসমের) গৌহাটীর সংস্কৃত কি করা যায়? সমস্যা দেখা দিল। এমন বেয়াড়া উচ্চারণের নামকে সাজিয়ে গুছিয়ে সংস্কৃত নাম বানাতে গেলে মুশকিল ত হবেই। গব্যুতি বলে চালিয়ে দেওয়া যেত তবে তা করা যায়নি। কারণ রাজস্থানী-মূলক গব্যুতি-শব্দটা সংস্কৃতে রাখার ব্যবস্থা আগেই হয়ে গিয়েছিল। কি করা যায়? আগের নামটা মুল নামের কাটছাঁট করে পরে কিছু জুড়ে দিয়ে বানানো হয়েছিল। গৌহাটীর ক্ষেত্রে আগে ও পরে নতুন কিছু ধ্বনি জুড়ে দিয়ে অর্থহীন এক নামকরণের আয়োজন হল। গৌহাটী→গ্‌গতি→গ্‌যতি→গ্‌জ্যোতি →প্রা-গ্‌জ্যোতি-ষ। আগে কিংবা পরে ধ্বনি বা শব্দাংশ জুড়ে নাম বানানোর এই খেলাটা দিল্লীর 'হথণা'-কে নিয়েও হয়েছিল। হথণা→হস্ত-না→হস্তি-না→হস্তি-না-পুর→হস্তিনাপুর। বাঙলা বাঘনাপাড়া, ছাদনাতলা-র অনুকরণে যে ওই হস্তিনাপুরের রূপকল্পনা হয়েছিল এবং সে মতলব যে নেপথ্যে থাকা কোনও বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব—তা কি বলার দরকার আছে? হথণা-কে স্থানীয় লোকেরা

এখনও ওই নামেই জানে। এমনকি রাজস্থানের বাগড়ী ভাষাতেও ওই নামের চল আছে।

উত্তর প্রদেশের আগ্রা, নিমসার কিংবা বুঁদাও-এর ধারে কাছে কোনও বন নেই। তা না থাক। সংস্কৃত সাজাতে গিয়ে ওগুলোকে অগ্রেবন, নৈমিষারণ্য, ও বৃন্দাবন বানিয়ে আদ্যিকালের কেতাবে রাখা হল। গল্পের কৃষ্ণ বা রাধার নামে নয় তৃতীয় জায়গাটার নাম বানানো হল গল্পের বৃন্দাদূতীর নামে। বুঁদাও থেকে আর কী-বা বানানো যায়! সংস্কৃত সাজানোর ঠেলায় জায়গাগুলো ত বটেই এমনকি মহাভারতটাও প্রাচীন সেজে বসল। মর্হাটা (→সংস্কৃতে 'মহারাষ্ট্র' সাজিয়ে নেওয়া) মুলুকের নশিখ/নাশিক নামের সঙ্গে নাকের কোনও সম্পর্ক ছিলনা—ছিল শিখরের। নশিখ-কে নাসিক সাজিয়ে এবং সেই নাম রাখার কারণ জানাতে গিয়ে শূর্পনখার নাক কাটার গল্প তৈরি করে রামায়ণে রাখা হল। নামকরণের ঠেলায় জায়গাটা প্রাচীন সেজে বসল। প্রাচীন সেজে বসল রামায়ণটাও।

ভুইলা-র সংস্কৃতায়নের খেলাটাও বেশ মজার। ভুইলা→উইলা →কপিলা→কপিল পর্যন্ত বানিয়ে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি সমস্যা দেখা দিল তার পরে। আর এক গল্প বানানোর দরকার পড়ল। বলা হল দার্শনিক কপিলেরও বাস্তুভিটা ওখানেই ছিল। কপিলের বাস্তুর ব্যবস্থা হয়ে গেল। নতুন উদ্যমে কপিল+বাস্তু→ কপিলবাস্তু→কপিলাবস্তু নামটাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল। ভুইলা প্রাচীন সেজে বসল। প্রাচীন সেজে বসলেন বুদ্ধ-ও। কালক্রমে তিনি 'বুদ্ধদেব' হলেন। তাঁর পিতৃদেবের নামটা তমলুক থেকে নিয়ে যাওয়া হল। বলে রাখা ভালো মরাঠি-মূলক 'শুদ্ধোদন' নামটা তমলুকে একটু বেশি মাত্রায় চালু আছে। ভুইলায় ওই নামের চল নেই।

মহোবা স্থাননামকে সংস্কৃত সাজাতে গিয়ে বাচস্পতিবাবু হিম-সিম খেয়ে গেলেন। মহোবা→মহো-বা→মহো-ব→মহো-ৎস-ব→ মহোৎসব→মহোৎসবপুর। রসসৃষ্টির উৎস তাঁদের কোনদিনই

শুকোয়নি। কাশ্মীরী প্রুঞ্ছ→পুংছ→পর্ণোৎসব বানাতে গিয়ে সেই উৎসটাকে কাজে লাগিয়ে শব্দসৃষ্টির উৎসবে তাঁরা মেতে উঠেছিলেন।

বিদেশী স্থাননাম ও ব্যক্তিনাম লেখার ব্যাপারে চিনা ভাষায় যে অন্য কায়দার খেলা শুরু হয়েছিল—এই কথাই পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। সে ভাষায় ভাবলিপি চালু থাকাতে বিদেশী কোনও নামই লেখার সুযোগ ছিলনা। উচ্চারণ প্রকাশ করে নাম লেখার ব্যবস্থা ওই লিপিতে না থাকার দরুন বিদেশী স্থাননাম ও ব্যক্তি-নামের অনুবাদ করে নেওয়া শব্দ বা শব্দবন্ধ কিংবা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ওই সব নামের উচ্চারণের কাছাকাছি চিনা শব্দ দিয়েই তা প্রকাশ করা হত—অন্তত: পণ্ডিতেরা এই কথাই জানিয়ে আসছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার Cape of good Hope-কে তার অনুবাদ করা নাম উত্তমাশা অন্তরীপ বলে বাঙলা ভাষায় লেখা ভূগোলে জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছে Pacific Ocean-কে প্রশান্ত মহাসাগর বলে—মোটামুটি অনুবাদ করা নাম হিসাবেই। এই রকমই একটা ব্যবস্থা যে চিনা ভাষায় চালু ছিল—এইটাই তাঁরা বলতে চেয়েছেন। বিকল্প একটা ব্যবস্থাও যে চালু ছিল তাও জানানো হয়েছে। Atlantic Ocean-কে অতলান্তিক মহাসাগর বা Scandinavia-কে স্কন্দনাভি বলে চালানোর একটা চেষ্টা হয়েছিল। বিদেশী নামের উচ্চারণের কাছাকাছি শব্দ ব্যবহার করেই তা হয়েছিল। চীনদেশে যে ওই রকম একটা ব্যবস্থাও চালু ছিল—এই কথাই তাঁরা জানাতে চেয়েছেন। ফা হিয়েন, ইৎ সিং, হিউ এন সাং-দের লেখা বলে প্রচার করা চিনা কেতাবে ওই দ্বিতীয় কায়দাটাই অনুসরণ করা হয়েছে।

বিদেশী ব্যক্তিনামের চিনা অনুবাদ করা নাম সম্পর্কে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কীর্তিবাসী রামায়ণ-এর এক ভূমিকায় যা লিখেছিলেন তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু রাখছি।

'চীনারা ভারতীয় (সংস্কৃত) নামেরও চীনা অনুবাদ করিত; এবং তাহাদের এই অনুবাদ অনেক সময় আমাদের কাছে সুপরিচিত

সংস্কৃত নামের আধারে না হইয়া, অন্য অনুরূপ ও অজ্ঞাত নামেরই অনুবাদ হইত। তদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে এই সব নামের অন্য বিকল্প রূপও প্রচলিত ছিল। চীনারা ধৃতরাষ্ট্র না বলিয়া ( বা বলিবার চেষ্টা না করিয়া ) অনুবাদ করিত 'তী কুও' ( Tu Kuo অর্থাৎ Hold Kingdom ); তথাগত = "ঝুলাই" ( Ju lai অর্থাৎ That way gone ); অশ্বঘোষ = মা হেঙ্ ( Ma heng = Horse Neigh ); তদ্রূপ "দশরথ" এই নামের অন্য কোনও প্রচলিত রূপ "দশরত" ধরিয়া তাহারা অনুবাদ করিয়াছে Shih—hsi "শ্যুঃ শী" = Ten pleasures ; "দশরথ" = Ten choriots-এর অনুবাদ হয় Shih choe "শ্যুঃ জ্যো"। সুতরাং যে প্রাচীন রামায়ণ কথা প্রথম চীনা ভাষায় অনুদিত হয় তাহাতে "দশরত" নামটিই ছিল—"দশরথ" নহে।'

পণ্ডিতদের দৃষ্টিটাকে অর্থহীন ও গুরুত্বহীন তথ্য দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া উদ্ধৃতিটা আর কিছুই নয়। রামায়ণের প্রাচীন চিনা অনুবাদ আদৌ ছিল কিনা কিংবা থাকা সম্ভব ছিল কিনা—এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা না করে দশরথের আদি নাম দশরত ছিল—না দশরথ ছিল—দশবিশখানা 'স্ত্রী'—পুষে রাখা দশরথের উপযুক্ত নাম দশরত হওয়ার কথা কিনা—এই উদ্ভট প্রশ্নে ঘুরপাক খাওয়ানোর ব্যবস্থাই করেছিলেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বিভ্রান্তি-টাকে পাকাপোক্তভাবে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল কিনা তা বলা যায় না। তবে তিনি যে অন্যের লেখা পড়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন এইটাই মনে করে নিতে হয়।

আসলে বিদেশী স্থাননাম বা ব্যক্তিনামের অনুবাদ করা নাম রাখা কিংবা তার ধারে কাছের উচ্চারণের চিনা শব্দ দিয়ে তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা—কোনওটারই চল ওই চিনা ভাষায় নেই—কোনও-কালে ছিলও না। থাকার প্রশ্নই ওঠেনি। কারণ স্থাননাম বা ব্যক্তিনামের অনুবাদ করে নাম রাখার কথাটাই আজগুবি। ওইসব নামের অর্থ খোঁজার কোনও মানেই হয়না। স্থানবিশেষের বা

ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য জানানোর জন্য ওইসবের নাম রাখা হয়না। নাম রাখা হয় অন্য জায়গা বা অন্যদের থেকে আলাদা করার জন্য। নিজের রাজ্যটাকে বাড়িয়ে নিয়েছিলেন এমন এক রাজার নাম 'রাজ্যবর্ধন' রাখা হয়েছিল। প্রচণ্ড বুদ্ধিমান এক প্রধান মন্ত্রীর নাম রাখা হয়েছিল 'চাণক্য' কারণ গুজরাতি ভাষায় চাণক্য মানেই চালাক।

ইতিহাসের চরিত্রগুলোকে সার্থকনামা করার পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই ধরণের নাম রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ওসব ইতিহাসেই মানিয়ে গেছে, বাস্তবে ও বস্তু অচল। অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করলেও এখন কারুরই নাম অন্ধকারবর্ধন হয়না। দ্বিতীয়তঃ, চিনা ভাবলিপিতে প্রায় দশহাজারের মত অক্ষর থাকলেও সেসব অক্ষরের মাধ্যমে উচ্চারণ প্রকাশ করার ক্ষমতা খুবই কম। নানান চিনা উপভাষার কোনওটাতে চারশ' পাঁচ, কোনওটাতে চারশ' কুড়ি—কোনওটাতে চারশ' পঁয়ত্রিশটি একস্বর ধ্বনি প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। এর বেশি ধ্বনি প্রকাশ করার ক্ষমতা ওই লিপির নেই।

এই অবস্থায় বিদেশী নামের যথাযথ ত' দূরের কথা কাছাকাছি উচ্চারণের শব্দও সে লিপিতে লেখা যায় না। আর তা যায় না বলেই অধিকতর উচ্চারণ প্রকাশক্ষম এক নতুন লিপির প্রবর্তনের চেষ্টা সেদেশে চলেছে। জাপানী ভাষায় কাতাকানা বা হিরাগানা সিলেবারি লিপির মাধ্যমে উচ্চারণ প্রকাশ করার ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। তা হলেও Platonic love ওই সিলেবারিতে পুরাতোনিক্ কুরাবু হয়ে বসে। হয়ে বসে সঠিক উচ্চারণ প্রকাশ করার ক্ষমতার অভাবে।

আসলে বিদেশী নাম প্রকাশ করতে গিয়ে চিনা লিপিতে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার মধ্যে কোনও নিয়মতান্ত্রিকতা নেই। তা পুরোটাই মনগড়া। সুব্রহ্মণ্যম্-কে ইংরিজিতে Submarine কিংবা কম্পাউণ্ডার ও ডিস্‌পেনসারি-কে মেদিনীপুর জেলার একটি উপভাষায় কুরুপাণ্ডব ও ডিপডোলসানি বলে চালানোর মত মনগড়া

ব্যবস্থাই চিনা লিপিতে চালু আছে। আলেকজাণ্ডার-কে সংস্কৃতে অলিকসুন্দর বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছে। চিনা লিপিতে তা করার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না।

## প্রাচীন ভাষা—একটি মিথের নাম

প্রাচীন ভাষা বলে কিছু ছিলনা। নানান ভাষার প্রাচীন রূপ কি ছিল তা জানার কোনও উপায় আজ আর নেই। কোনও কোনও ভাষাকে প্রাচীন বলে মেনে নিতে গেলে বিরাট সংখ্যক ভাষাকে যে অপ্রাচীন বলে মানতে হয় আর তা মানতে গেলে মানব সমাজের বৃহত্তর অংশ যে ওই প্রাচীনকালে ভাষাগত ভ্যাকুয়াম বা শূন্যাবস্থার মধ্যে অবস্থান করতেন—এই প্রচণ্ড মিথ্যাকে স্বীকার করে নিতে হয়। মানুষ ছিল কিন্তু তার ভাষা ছিলনা—এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। ভাষা একান্তভাবেই মানুষের নিজস্ব। বোবা ছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ভাষা আছে। মনুষ্যেতর কোনও প্রাণীর বা সত্তার তা সে জীবজন্তুই হোক বা বহু বিজ্ঞাপিত দেবদেবীই হোন—অন্য কিছুরই ভাষা নেই—থাকতেই পারেনা। পণ্ডিতেরা কোনও ভাষাকে দেবভাষা বলে চালানোর যত চেষ্টাই করুন না কেন—কোনও কোনও ভাষাকে আদ্যিকালের বা প্রাচীন ভাষা বলে জানানোর যত কসরৎ-ই করুন না কেন সত্য প্রকাশ হয়েই পড়েছে। দেবভাষা হয়না। প্রাচীন ভাষা হয়না। হয় ওদুটোর মুখোস।

আসলে ওই মুখোসের আলোচনা করেই শ' আড়াই বছর ধরে পণ্ডিতেরা মানুষকে বোকা বানিয়ে আসছেন। ঈশ্বর নামক মনুষ্যসৃষ্ট এক মতলবের 'মুখে' 'ভাষা' গুঁজে দেওয়ার খেলায় যেসব 'দৈববাণী' বানানো হয়েছে—দুনিয়ার 'দেবশিশু'-রা যেসব বাণীর চর্বিতচর্বন করে 'মহাপুরুষ' সেজেছেন—তা সবই ভাঁওতাবাজি। ঈশ্বরের ভাষা, পাথরের হাসি, হাওয়ার সমবেদনা হয়না।

আসলে প্রাচীন ভাষা একটি মিথ-এর নাম। সব ভাষারই প্রাচীন রূপ ছিল। কালক্রমে ভাষার রূপ বদলে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে ভাষার খোল নলচেও পাল্টে গেছে—এ-ও ঘটনা। আসল সত্য হচ্ছে এই : সব ভাষাই প্রাচীন। ইডিস. আফ্রিকান কিংবা নানান ভাষার মিশ্রণে যেসব ভাষার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে বাদ দিলে সব ভাষাই সমান প্রাচীন। তামিল ভাষাটাকে যাঁরা দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে পুরনো ভাষা বলে ভেবে বসেছেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যাই বলুন পরোক্ষভাবে পরস্পরবিরোধী তিন রকমের বক্তব্য বলে বসেছেন।

এক, অতি প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতের অতামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে কোনও ভাষারই চল ছিলনা।

দুই, পুরো দক্ষিণ ভারতেই তখন একমাত্র ওই তামিল ভাষারই চল ছিল।

তিন, অতামিল দক্ষিণ ভারতীয় সব ভাষাই তামিল ভাষার কালানুক্রমিক বিকৃতি বা সুকৃতির ফলে পরবর্তীকালেই জন্মেছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তব্যের সপক্ষে কোনও প্রমাণই নেই বলে প্রথম বক্তব্যকেই মেনে নিতে হয়। আর তা মানতে গেলেই অবাস্তব একটি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। অতামিল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষেরা সেকালে কোনও ভাষাতেই কথা বলতেন না—এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর তা নয় বলেই ওই তামিল ভাষাকে ওই অঞ্চলের প্রাচীনতম ভাষা বলে মেনে নেওয়া যায় না।

আর ওই একই যুক্তিতে দুনিয়ার কোনও ভাষাকেই প্রাচীন বা প্রাচীনতম ভাষা বলে স্বীকার করা যায় না।

আসলে মানুষের সঙ্গে ভাষার এক কল্পিত মিলের গল্প বানিয়ে নিয়েছিলেন ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা। বানিয়ে নিয়েছিলেন ইতিহাস বানানোর নেপথ্যশিল্পীদের পরামর্শে। বানিয়ে নিয়েছিলেন বংশানুক্রমে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সংখ্যাবৃদ্ধির আজগুবি গল্পটা। মানুষের নাতিপুতি থাকলে ভাষার কি আর

তা না থেকে পারে? ভাষার নাতিপুতির গল্প লিখতে গিয়েই প্রাচীন প্রাচীনতর, প্রাচীনতম নানান সব ভাষা ও সেগুলোর নাম তাঁদের বানাতে হয়েছিল। যা আদৌ ছিল না তা ছিল বলে চালাতে গিয়ে ওই প্রাচীন গ্রিক, ওই ল্যাটিন, ওই হিব্রু (মজার কথা হল এ-ভাষায় সবেধন নীলমণি একখানাই কেতাব লেখানো হয়েছিল।) এবং ওই সংস্কৃত ভাষা বানানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাতিপুতির গল্পও বানিয়ে রাখতে হয়েছিল। নানান ভূতুড়ে নামের গ্রিক, ভালগার ল্যাটিন (সেটা আবার কি বস্তু? সব ভাষাই যে জন্মসূত্রে ভাল-গার। তাহলে?) পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ইত্যাদি কম ভাষা তাঁদের বানাতে হয়নি। আসলে পণ্ডিতদের দিয়ে তৈরি করা কয়েকটি ভাষাকে প্রাচীনতম ভাষা বলে চালাতে গিয়েই ওই ভাষাগত নাতিপুতির উদ্ভাবনার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রয়োজন হয়েছিল আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের দিয়ে ওইসব 'ভাষা' বানিয়ে নেওয়ার। কালানুক্রমিক ইতিহাসের বানিয়ে রাখা লিখিত সাক্ষ্য-গুলোর পারম্পর্য রক্ষার কাজে ভাষার নাতিপুতি থাকার কিংবা ক্রমপরিবর্তনের গল্পটা ভালোই সাহায্য করেছিল।

# সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্পদের বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্পদের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে অনেক পণ্ডিতই গবেষণা করেছেন। তবে ওই প্রাচুর্যের পিছনে কোনও রহস্য ছিল কিনা কিংবা সেই বৈচিত্র্যের আসল কারণ কি ছিল তা জানার কোনও চেষ্টাই তাঁরা করেননি। প্রাচীনকালের কোনও ভাষায় যে লক্ষাধিক শব্দ থাকার কথা নয়—তা থাকাটা যে সন্দেহ-জনক—বৈচিত্র্য বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা যে নানান ভাষার বৈচিত্র্যের যোগফল—এইটাই তাঁরা বোঝেননি। বোঝার চেষ্টা করেননি।

আসলে নানান ভাষার শব্দ এনে হাজির করতে গিয়ে ওই ভাষায় সমার্থক শব্দের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছিল। জীবন্ত কোনও ভাষায় যে কোনও শব্দের ছত্রিশ গণ্ডা সমার্থক শব্দ থাকে না—থাকতে পারেনা—এই সোজা কথাটাকে তাঁরা গুরুত্ব দেননি। সংস্কৃত সমার্থক শব্দগুলোর কোনওটা মরাঠী-মুলক ত' কোনওটা ওড়িয়া-মুলক। কোনওটা হিন্দীমুলুকে—কোনওটা গুজরাতিভাষী অঞ্চলে চালু আছে। কোনও কোনও শব্দ এশিয়া ও ইউরোপের বেশ কয়েকটি জীবন্ত ভাষায় (এমনকি মৃতভাষাতেও) প্রচলিত আছে বা ছিল। অন্ততঃ পণ্ডিতদের দেওয়া তথ্য দেখে সেই সিদ্ধান্তই নিতে হয়। এককথায় নানান ভাষার শব্দ মিলিয়ে মিশিয়ে যে ওই ভাষা বানানো হয়েছিল আর সেইজন্যই যে তার সমার্থক শব্দ ত' বটেই অন্য ধরনের শব্দ সংখ্যারও সন্দেহজনক বৃদ্ধি ঘটেছে—ফুলে ফেঁপে উঠেছে—এইটাই তাঁরা বোঝেননি। সে ভাষার শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত ব্যুৎপত্তির গল্প বানানোর কসরৎ করলেও তার চরিত্র লক্ষণ বিশ্লেষণ করে তার শ্রেণীবিভাগ করা কিংবা নানান উৎস থেকে সে ভাষায় শব্দ এসে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা মাথা খাটাননি।

উল্টে সবই ভগবানের সৃষ্টি বলে চালিয়ে দেওয়ার উৎকট চেষ্টাই তাঁরা করেছেন। তাঁরা অন্যসব জীবন্ত ভাষার শব্দের চরিত্রগত

পার্থক্য বিচার করে নানান শ্রেণীতে ভাগ করার ব্যবস্থা করলেও সংস্কৃত ইত্যাদি মৃতভাষার ক্ষেত্রে তা করেননি। করার বিপদ ছিল। রহস্যটা ধরা পড়ে যেত। আসলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য তাঁরা এমনভাবে তাঁদের বক্তব্যটাকে সাজিয়েছেন যাতে মনে হয় ওইসব ভাষার সব শব্দই বুঝি এক জাতের। নানান শ্রেণীতে ভাগ করার প্রশ্নটাই বুঝি অবান্তর। আসলে তা নয়।

সংস্কৃত ভাষার কথাই ধরা যাক। এ ভাষায় ঠাঁই পাওয়া শব্দগুলোকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, নব্য সংস্কৃত তদ্ভব, দুই, অসংস্কৃত তৎসম, তিন, সংস্কৃত তৎসম, চার, পণ্ডিতি শব্দ।

এক, প্রথমে আসছে 'নব্য সংস্কৃত তদ্ভব' শব্দের কথা। এ-জাতের শব্দগুলো সংস্কৃত অভিধানে স্থান করে নিলেও ভারতের কোনও ভাষায় চালু হয়নি। শুধু অভিধানের কলেবরই বাড়িয়েছে। নিষ্প্রাণ, কৃত্রিমতাদোষদুষ্ট ও আড়ষ্টমার্কা এই শ্রেণীর শব্দ যে কোনও ভাষায় চালু হয়নি তার কারণ কৃত্রিম প্রকৃতির শব্দকে ধাতস্থ করে নেওয়া জীবন্ত কোনও ভাষার স্বভাবধর্ম নয়। এ-জাতের সব শব্দই বিচিত্র চরিত্রের। সবই পণ্ডিতদের তৈরি করে নেওয়া। ভারতের ও বহির্ভারতের নানান ভাষায় চালু থাকা শব্দকে ঘসে-মেজে বানিয়ে নেওয়া এসব শব্দকে 'নব্য' বলার কারণ ওসবই আধুনিককালে বানিয়ে নেওয়া। ঐতিহ্যের বালাই ওগুলোর নেই। ওগুলোকে 'সংস্কৃত' বলার কারণ দেশী-বিদেশী শব্দকে সংস্কার করে নিয়েই ওসব বানানো হয়েছে। ওগুলোকে 'তদ্ভব' বলার কারণ নানান ভাষায় চালু শব্দ নেপথ্যশিল্পীদের কৃপায় বা সংস্কারের ঠেলায় ওই রকমই 'হয়ে বসেছে'।

'নব্য সংস্কৃত তদ্ভব' শব্দগুলোকে দেশী ও বিদেশী দুই উপশাখায় ভাগ করা যায়।

(A) দেশী ভাষার শব্দের আদলে তৈরি শব্দগুলো বাঙলা, ওড়িয়া, মরাঠী, গুজরাতি, হিন্দী ইত্যাদি ভারতীয় ভাষার শব্দ

থেকেই বানানো। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যাক :

(ক) কর্ণকীট / কর্ণজলৌকা / কারস্করাটিকা, কর্ণাকর্ণি, কল্ল, কালিকা (=লেখার কালি), কিঞ্চিলুক / কিঞ্চুলক / কিঞ্চুলুক, কুঞ্চিকা, কুল্য, কুবল, কৃকলাস—এইসব শব্দ যে খাঁটি বাঙলা কেন্নো, কানাকানি, কালা, কালি, কেঁচো, কুঁচ / কুচে মাছ / খুঁচি, কুলো, কুল ও কাঁকলাস-কে সাজিয়ে গুছিয়ে সংস্কৃত বলে চালানো হয়েছে তা কি বুঝতে কষ্ট হয় ?

(খ) কচ্ছ, কচ্ছু, কপিত্থ /কবিত্থ, কফোণি, কর্কারু, কর্ণিকার ও ও কুহেডিকা—সংস্কৃত বলে চালানো এইসব শব্দ যে খাঁটি ওড়িয়া কছা, কাছু, কইথ, কহুণি, কখারু, কণিঅর ও কুহুডি-কে কিছুটা ঘসে মেজে বানানো হয়েছে তা কি বলার দরকার আছে ?

(গ) কঙ্গু / ক্বঙ্গু, কারবেল্ল, কুরণ্টক, কুলাল, কুল্য, কূর্প / কূর্পর, কোদ্রব ও ক্ষপণক-মার্কা শব্দগুলোকে পণ্ডিতেরা খাঁটি সংস্কৃত বলে চালাতে যত চেষ্টাই করুননা কেন—ওগুলো যে মরাঠী কাংগ / কাংগু কারলে / কারলী, কোরাংটা / কোর্হাণ্টা / কোরাংটী / কোর্হাংটী, কল্লাল / কুল্লাল, কালরা, কোপর / কোংপর, কোদ্রু ও খরণা-শব্দকে সংস্কার করেই বানিয়ে নেওয়া হয়েছে তা বুঝতে কি খুব একটা অসুবিধা হয় ?

(ঘ) কণ্ডিকা, কদর, কর্বুর, কস্তীর, কুক্কুট, কুঞ্চিকা (=চাবি), কুট্টণী, কূচ—সংস্কৃত বলে প্রচার করা এইসব শব্দ যে গুজরাতি কডী, কাথো, কাবরুং / কাবরিয়ুং, কথীর, কূকডো / কূকডী, কূংচী, কূটণী, ও কূচো / কূচডো-কে 'শডোস্কার' করেই বানানো হয়েছে—একথা বুঝতে কি খুব একটা পাণ্ডিত্যের দরকার হয় ?

(ঙ) কঞ্চুক (=খোলস), করমর্দ, কলাচি, কলিকা, কালেয়ক, কুলত্থ ও কেদারিকা—সংস্কৃত অভিধানে ঠাঁই পাওয়া এইসব শব্দ যে আসলে হিন্দীর কেংচুলী, করৌংদা, কলাই, কলী, কলেজা, কুলথ / কুলথী ও কিআরী শব্দের সংস্কৃত ছদ্মবেশ তা কি বুঝতে কষ্ট হয় ?

(চ) করবাল, করীর, কানন, কুণি, কুন্তল, কুরুবিন্দ, কুবলয়, কেয়ূর—শব্দগুলো দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা থেকেই চুরি করা হয়েছে।

(ছ) কচ্ছটিকা, কবয়ী যে মৈথিলী থেকে--কশিকা, কিরাট যে পঞ্জাবী থেকে, কুতপ যে নেপালী থেকে, কুল্মাশ যে কাশ্মীরী থেকে, কট যে অসমীয়া থেকে, ক্রোষ্টী যে সিংহলী ভাষা থেকে এনে সংস্কৃতে রাখা হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়।

(B) বহির্ভারতে প্রচলিত ভাষা থেকেও প্রচুর শব্দ আনা হয়েছে।

(ক) আরবী, ফারসী ও তুর্কীভাষা থেকে আনা শব্দকেও ঘসে মেজে সংস্কৃত বলে চালানো হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

কঞ্চিকা, কুজ, কোষ্ঠপাল-এগুলো ফারসীমূলক। কলাপাল, কোহল, ক্ষদ্মা (বৈদিক)--এগুলো সবই আরবীমূলক। তোষক শব্দটা তুর্কীমূলক।

(খ) ইউরোপের নানান ভাষা থেকে বেশ কিছু শব্দ এনে ঘসে মেজে নেওয়া হয়েছিল।

কর্কট (circuit), কর্তনী, কবরী, কাঞ্জিকা, কারোতর (বৈদিক), কিম্পল, কুন্ত, কুল্ব, কৃপাস, ক্রমেল, ক্রবিষ, ক্রবা, ক্রিয়, বুধ্ন ইত্যাদি শব্দগুলো পোর্তুগিজ, আইরিশ, ল্যাটিন, গ্রিক, ফারসী, জার্মান ইত্যাদি ভাষা থেকেই আনা হয়েছে।

দুই, ভারতের নানান ভাষার অনেক শব্দ সংস্কার না করে অবিকৃতভাবেই সংস্কৃত ভাষায় রাখা হয়েছে।

ফারসীমূলক কচ্ছপ, কাক কাগ কিয়ৎকাল (মেদিনীপুরে চালু), কুকুর, কোল কোকিল ইত্যাদি বাঙলা শব্দ।

ককুদ, কদাচ, কুণ্ঠা, কুম্ভার, কোলি ইত্যাদি ওড়িয়া শব্দ

করোটি, কল্মশ, কিল্মিশ, কুরঙ্গ, কুহর, কুবীবল, কোদণ্ড ইত্যাদি মরাঠী শব্দ।

কঙ্কাল, কঞ্চুষ (হিন্দীতে স), কিশলয় (হিন্দীতে স), কিংবদন্তী, কীল, কুক্কুর, কুংজ ইত্যাদি হিন্দী শব্দ।

কটক, কঠ, কণ, কম্বু, কলরব, কুতুহল কূজন, কৃতঘ্ন, কেশ, কোলাহল ইত্যাদি গুজরাতি শব্দ। এগুলো পণ্ডিতদের দিয়ে তৈরী করে নেওয়া নয়। এ-ধরণের শব্দগুলো বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে লোকচল শব্দ হিসাবে চালু আছে। অন্যত্র তথাকথিত সাহিত্যিক শব্দ হিসাবেই এগুলো চলে।

এছাড়া বেশির ভাগ শব্দ একই সঙ্গে ভারতের নানান ভাষায় চালু আছে। কোনওটা মরাঠী, গুজরাতি ও ওড়িয়াভাষী অঞ্চলে—কোনওটা গুজরাতি ও হিন্দীতে—কোনওটা বাঙলা ও অসমীয়ায় চালু আছে। মজার কথা হল নানান ভাষার অভিধানে এ-ধরণের শব্দকে সংস্কৃত বলেই চালানো হয়েছে।

এ ধরনের কয়েকটি শব্দের নমুনা দিয়েই ব্যাপারটা বোঝানো যাক :—

কপট, কমল, কলহ, কলি, কান্তি, কিরণ, কিরীট, কিশোর, কীর, কীর্তন, কীর্তি, কুঞ্জ, কুটিল, কুসুম, কূট, কূর্ম, কৃত্রিম, কৃপণ, কেশর, কেতন, কোটর, কৌশল ইত্যাদি শব্দগুলোকে সংস্কার করার দরকার পড়েনি। এগুলো অবিকৃতভাবেই সংস্কৃত ভাষায় ঠাঁই পেয়েছে, আর সেইজন্যই এগুলোকে 'অসংস্কৃত তৎসম শব্দ' বলতে হয়। এসবই স্বাভাবিক শব্দ—পণ্ডিতেরা এগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করেননি। আসলে কোনও বিশেষ একটি ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসাবে এগুলোর চল নেই। একই সঙ্গে অনেক ভাষায় চালু থাকাতে এগুলোকে সংস্কৃত বলে চালাতে পণ্ডিতেরা সুবিধা পেয়ে গেছেন। এমন কি যেসব ভাষায় ওইসব শব্দ ভালোই চলে সেসব ভাষার অভিধানেও ওগুলোকে সংস্কৃত বলেই জানানো হয়।

নানান ভাষায় চালু এইসব শব্দ সব ভাষায় যে একই অর্থে চলে তা-ও নয়; মরাঠি আক্ষেপ=আপত্তি, আমিষ=ঘুষ, আহ্বান=Challenge, কদর্য=কৃপণ, চেষ্টা=অঙ্গভঙ্গী। শুধু মরাঠি ভাষী অঞ্চলেই শব্দগুলো বিচিত্র অর্থে চালু আছে। অন্যত্র নয়। প্রাচীন

কোনও ভাষায় ওইসব অর্থে শব্দগুলো চালু ছিল একথা মানা যায় না।

**তিন,** ভারতের নানার ভাষার বেশ কিছু শব্দকে সংস্কার করে নতুন নতুন শব্দ না বানিয়ে ওইসব ভাষারই অন্য অর্থযুক্ত প্রচলিত শব্দ দিয়েই তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসব শব্দকে 'সংস্কৃত তৎসম' বলতে হয়। এগুলো একাধারে সংস্কার করা শব্দও বটে আবার ঘটনাচক্রে তৎসম-ও বটে। সংস্কার করা না হলে এগুলোর রূপ বদলানোর প্রশ্ন উঠত না। তাই ওগুলো 'সংস্কৃত' এবং পরিবর্তে অন্য কিছু শব্দ অবিকৃতভাবে রাখা হয়েছে বলে 'তৎসম'। উদাহরণ দেওয়া যাক:

(বাঙ্গলা) আঙ্গুনি→অর্জুন, আঁটি→অস্থি; আমলা→অম্লান; উঠান→উত্থান; এলো (চুল)→আকুল; (দরজার) কড়া→কটক; কাতলা (মাছ)→কাতর; ক্যাতরা→কীর্তি; খুদ→ক্ষুদ্র;

পাব্দা (মাছ)→পর্বত; ধুতরো→ধূর্ত; ময়না (পাখী)→মদন; মসনে→মসৃণ; হিংসে→হংস।

(হিন্দী) উধার→উদ্ধার; কায়র→কাতর; কিরকিরা→কিরণ; কোয়লা→কোকিল; বধ্না→বর্ধন; রসোই (ঘর)→রসবতী।

(ওড়িয়া) কুন্দাযন্ত্র (turners lathe)→কুন্দ (ওই অর্থযুক্ত শব্দটি যে কত প্রাচীন তা বুঝতে কষ্ট হয় না।); নেত (=ওড়না)→নেত্র।

(গুজরাতি) নেতরূং→নেত্র, অসমিয়া কাঁড়→কাণ্ড।

কিঞ্চিৎ রসসৃষ্টির তাগিদেই এই ধরণের যথার্থ সংস্কৃত তৎসম শব্দগুলো বানানো হয়েছিল। কোনও ভাষাতেই ওইসব বিচিত্র অর্থে শব্দগুলোর চল নেই। হিন্দীভাষী কোনও ভোজনরসিকও খাবারের উৎস ভেবে রান্নাঘরকে রসবতী বলে বসেন না।

**চার,** নানান বিভ্রান্তিকর তথ্যকে প্রামাণ্য বলে চালাতে এবং নানান প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে বেশ কিছু তত্ত্বসমৃদ্ধ শব্দ বানানোর একটা খেলাও হয়েছিল। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক:

পজ্জ=শূদ্র। ব্রহ্মার পা থেকে জন্মেছিলেন বলেই ওঁদের ওই নাম! উরব্য / উরুজ / উরুজন্মন্=বৈশ্য। ওই ব্রহ্মার উরু থেকে জন্মেছিলেন বলেই এঁদের ওই পরিচিতি! শিরজ=চুল; ব্রহ্মার মাথা থেকে জন্মেও কেন যে ব্রাহ্মণদের ওই নাম হয়নি—এইটাই আশ্চর্যের। বাহুজ=ক্ষত্রিয়। পজ্জ, উরুজ, শিরজ ও বাহুজ-মার্কা সব শব্দই পণ্ডিতি শব্দ। একশ্রেণীর পণ্ডিতদের ঠকানোর জন্য আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের বানানো কীর্তি এগুলো।

এ-ধরনের শব্দের সন্ধান পেয়ে পণ্ডিতেরা অনেক তত্ত্বই তৈরী করে বসেছেন। প্রাচীন যুগে ভারতে বর্ণাশ্রম-প্রথার কিংবা—বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল কিনা—স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল কিনা—স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা কি ছিল—ক্রীতদাসপ্রথা ছিল কিনা—সবই তাঁরা আবিষ্কার করে বসেছেন ওই জাতের পণ্ডিতি শব্দের বিশ্লেষণ করে। এসব 'শব্দ' কোনও ভাষায় ঠাঁই পায়নি। কিছু ঐতিহাসিক, ধর্মজীবি ও রাজনীতি-ব্যবসায়ী বস্তাপচা তত্ত্বের সমর্থনে ওইসব শব্দকেই প্রমাণ হিসাবে হাজির করেন। আসলে ওই সংস্কৃত ভাষায় জালজালিয়াতি জোচ্চুরি করার জন্যই বিভ্রান্তি সৃষ্টির উপযোগী ওইসব শব্দব্রহ্ম বানানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ঘটনা হচ্ছে এই।

নানান ভাষা থেকে শব্দ চুরি করেই নেপথ্যশিল্পীরা ক্ষান্ত হননি। ওগুলোকে নিজের বলে চালানোর জন্য ওগুলোর ধাতু প্রত্যয়গত ব্যুৎপত্তির গল্পও তাঁদের বানাতে হয়েছিল। আর তা করতে গিয়েই তাঁর ধরা পড়ে গিয়েছেন। প্রাচীনকালে যে হাজার হাজার মাইল দূরের দেশের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থাই ছিলনা এবং বিদেশী শব্দের যে বিদেশী কায়দায় জন্মানোরই কথা—সংস্কৃত সব ভূতুড়ে ধাতু থেকে ওগুলোর জন্মানোর কথাটা যে আজগুবি এইটাই তারা বলেননি। ওই উদ্ভট গল্প লিখতে গিয়েই তাঁরা ধরা পড়ে গিয়েছেন। মিথ্যা বেশিদিন বাঁচে না।

# এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় শব্দ এসে যায়

মরাঠী ভাষা থেকে একুণে মাত্র চারটে আর গুজরাতি ভাষা থেকে কুল্যে কেবল পাঁচটা শব্দ যে বাঙলা ভাষায় এসে গেছে— এ-কথা পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। তাঁরা যাই বলুন না কেন ঘটনা কিন্তু তা নয়। ভাষাদুটো থেকে বাঙলা ভাষায় শব্দ এসেছে অনেক বেশি।

তথাকথিত সাহিত্যিক বাঙলায় এসে যাওয়া শব্দের ত কথাই নেই—বাঙলা চলতি ভাষায় শয়ে শয়ে মরাঠী বা গুজরাতি শব্দ এসে গেছে। এসে গেছে ভারতের নানান ভাষা থেকেই প্রচুর শব্দ। আর সেইটাই স্বাভাবিক। ভাষাভাষী অঞ্চলের সীমানা দিয়ে এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় এসেই যায়। ব্যাপারটাকে আটকানো যায় না।

বাইরে থেকে আসা শব্দকে নিজের করে নেওয়ার ক্ষমতা সব ভাষাতেই থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই এক ভাষার শব্দ প্রতিবেশীত বটেই এমনকি প্রতিবেশীর প্রতিবেশী ক্রমে দূরে দূরান্তরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। মরাঠী-গুজরাতি-মূলক শব্দ অসমীয়া ভাষায় কম নেই। বাঙলাভাষী অঞ্চল পেরিয়ে আসামে সেসব শব্দের চলন থাকলেও সেগুলো কিন্তু বাঙলা ভাষায় চলেনি। কোঁকনি-মূলক প্রতায় চাটিগাঁর ভাষাতেও এসে গেছে। হিন্দী-মূলক বেশ কিছু শব্দ পশ্চিম বাঙলায় চলেনি—চলেছে পুব বাঙলায়—এমন নজিরও আছে।

এমন অনেক আরবী ফারসী শব্দ আছে যা বাঙলা ভাষায় ভাল চললেও হিন্দীমুলুকে চলেনি। বাইরে থেকে এসে যাওয়া শব্দকে নিজের করে নেওয়ার এই ব্যাপারটা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের খেয়ালখুসিতে হয় না। হয় ভাষাভাষীদের সমষ্টিগত ইচ্ছায়। আর এ ব্যাপারে পণ্ডিতদেরও অন্য কিছু করার থাকে না।

আসলে 'সাহিত্যিক বাঙলা'র তথাকথিত তৎসম শব্দের শতকরা একশ ভাগ যে সোজাসুজি সংস্কৃত থেকেই অবিকৃতভাবে বাঙলায় এসে হাজির হয়েছে—এই জলজ্যান্ত মিথ্যাটাকে তত্ত্ব হিসাবে খাড়া করতে গিয়েই পণ্ডিতেরা মারাত্মক এক ভুল করে বসেছেন। বাঙলা চলতি ভাষার তথাকথিত তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দগুলোত' বটেই এমনকি খাঁটি বাঙলা শব্দের বেশ কিছু যে ওই সংস্কৃত থেকেই ঘোরাপথে—প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ট নামের সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে বাঙলা ভাষায় ঠাই পেয়েছে—এই কাহিনীটাকেও তাঁরা তত্ত্বের মর্যাদা দিয়ে বসেছেন। আর সেইজন্যই অন্য সব ভারতীয় ভাষা থেকে বাঙলায় এসে যাওয়া শব্দের সংখ্যা ভীষণভাবে কমিয়ে দেখানো হয়েছে। এই ধরনের ব্যাপার শুধু বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেই ঘটেনি—ঘটেছে উত্তর ভারতের অনাদিবাসী সব ভাষার ক্ষেত্রেই। সংস্কৃত ভাষার কন্যা-পরিচয়ধন্যা ওইসব ভাষাভাষী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত থেকেই তাঁদের ভাষার বেশির ভাগ শব্দের সৃষ্টির গল্পটাকে তত্ত্ব হিসাবে মেনে নিয়েছেন। না মেনে উপায় ছিল না। পাণ্ডিত্যের আসরে নাম করতে গেলে ওই মিথ্যাটাকে যে মেনে নিতেই হয়।

খাঁটি বাঙলা শব্দকে ঘসে মেজেও প্রচুর সংস্কৃত শব্দ বানানো হয়েছিল। পণ্ডিতেরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যুৎপত্তি-নির্দেশক তীরচিহ্নগুলোর মুখগুলোকে উল্টোদিকে রেখে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে আসছেন : ক্লান্তি নেই।

অম্বল>অম্ল ; অঘ্রান>অগ্রহায়ণ।

আঁচ করা>অঞ্চ্ ধাতু ; আঁটি>অষ্টি ; আলজিভ> অলিজিহ্বা।

ইকড় ( আঞ্চলিক শব্দ )>ইৎকট ; ইচা ( আঞ্চলিক শব্দ )> ইঞ্চাক।

উচ্চিংড়ে>উচ্চিঙ্গট ; উনান>উদ্ধ্মান ; উলু>হুলুং ; উস্কো> উচ্ছুষ্ক।

এঁকে বেঁকে চলছে>অঙ্কুয়তি ; এলো>আলুলায়িত ; এইটুকু> ইয়ত্তক ( টুকু=তক ) ( বৈাদক )

ওগো—অঘো ; ওলো—হলা।

খই>খদী / খদিকা ; খুঁচি>কুঞ্চি খোঁড়া>খোড় ; খলসে ( মাছ )>কুলেশয় ; খোস>খস।

গুঁড়ো করা>গুণ্ড ধাতু ; গোছা>গুৎস ; গুঁড়ো>গুণ্ড ; গেঁয়ো>গ্রায়।

ঘাড়>ঘাট / ঘাটা ; ঘামাচি>ঘর্মচর্চিকা ; ঘুঁটে>ঘুন্টিক ; ঘেঁচু>ঘেঞ্চুলিকা।

চড়াই ( পাখী )>চটক ; চিংড়ি→চিঙ্গট ; চিকা (আঞ্চলিক)> চিক্ক, চুল>চূল, চোপা>চ্যুপ / চুব্র।

ছুঁচো>চুঞ্চ। জারুল>জাটলি। ঝিঁঝি>ঝিঞ্চি।

টগর ( ফুল )>তগর, টুনটুনি>টুণ্টুক, ট্যারা>টগর / টেরক, টিপ টিপ করে পড়া>স্তিপ্ ধাতু।

ডাঁট>দণ্ড, ডাঁটা>দণ্ড, ডিম>ডিম্ব, ড্যালা>দল।

ঢাক>ঢক্কা, ঢোঁড়া>ডুণ্ডু, ঢ্যাড়স>টিণ্ডিশ / ডিণ্ডিশ।

তেলাপোকা>তৈলপায়িকা (বলে রাখা ভাল এই প্রাণীটির এদেশে শুভাগমন খুব একটা প্রাচীনকালে ঘটেনি। আমেরিকা আবিষ্কারের বেশ কয়েক শ' বছর পরেই এর আবির্ভাব ঘটেছিল।)

দিঘি=দীর্ঘিকা।

ধুয়ো>ধ্রুব, ধুতরো>ধুস্তুর (পণ্ডিতেরা শব্দটিকে প্রাচীন বলেই চালিয়ে যাচ্ছেন। গাছটা এদেশী নয়। আমেরিকা থেকে এসেছে সাম্প্রতিককালেই।

ন্যাকড়া>নক্তক, ন্যাকার>ন্যক্কার, ন্যাংটো>নগ্নাট, ন্যাতা>নক্তক।

পাচন (বাড়ি)>প্রাজন, পিচুটি>পিঞ্জট / পিঞ্জেট (মেদিনীপুরের আঞ্চলিক পেউর্জড়া শব্দের প্রভাবে 'পিচুটি'র যে একটু বেশি বিকৃতি ঘটে গিয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হয়। (আসলে সংস্কৃত ভাষা শিল্পীদের মধ্যে ওই জেলার পণ্ডিত কিঞ্চিৎ বেশিই ছিলেন।)

পুঁই (শাক)>পুতিকা, পোঁছা>প্রোঞ্ছন।

ফড়িং>ফড়িঙ্গা, ফলনা (আঞ্চলিক শব্দ)>ফলোনি, ফেউ>ফেরু।

বাঁট>বণ্ঠ, বেঁটে>বণ্ঠ, বোয়াল (মাছ)>বদাল।

ভাঁড়>ভণ্ড, ভিমরুল>ভৃঙ্গরোল, ভুঁড়ি>ফণ্ড।

মড়ক>মরক; মাছি>মাচিকা, মুড়ো>মুর্দ্ধন, মোচা>মোচ / মৌচ।

যত>যতি, যথাযথ>যথাতথ, যে>যঃ।

রোদ>রৌদ্র।

লাফানো>লম্ফনম, লেগে থাকা>লগ ধাতু।

শিয়ালকাঁটা>শৃগালকণ্টক (এটিও আমেরিকা থেকে এসেছে। সংস্কৃত ভাষার অর্বাচীনত্বের প্রমাণ এই শেয়ালকাঁটার 'তেল' এক কালে সরষের তেলে ভেজাল দেওয়া হত। সংস্কৃত-ভাষাধৃত বচনগুলো জ্ঞানরাজ্যে এখনও ভেজালের কাজ করে যাচ্ছে দোর্দণ্ড

প্রতাপে। ভেজাল-বিরোধী অভিযান করার মানুষ এখনও দুর্লভ।
শুধু>শুদ্ধ।

সঙ্গড়া>সংস্কারক, সাঁতার>সন্তরণ, সেঁউতি>সেবতী।

হত্তুকি>হরিতকি, হাই>হাফিকা, হাঁচি>হঞ্জিকা; হুঁ>হুম্, হুল>অল, হেঁয়ালি>হেমালিকা।

## সংস্কৃত ভাষার ওড়িয়া ঐতিহ্য

ওড়িয়া ভাষা থেকে শব্দ চুরি করে কম সংস্কৃত শব্দ বানানো হয়নি। এর মধ্যে বেশ কিছু খাঁটি ওড়িয়া শব্দও আছে। তারকা চিহ্নিত শব্দগুলোর সবই খাঁটি ওড়িয়া। বাকি শব্দগুলো প্রতিবেশী দু-একটি ভাষায় উচ্চারণগত কিছু বিকৃতি বা সুকৃতির মধ্য দিয়ে চালু আছে। এসব শব্দের ওড়িয়া উচ্চারণের সংস্কার করে এবং খাঁটি ওড়িয়া শব্দকে ঘসে মেজে নিয়ে নানান কায়দায় বিচিত্র সব সংস্কৃত শব্দসৃষ্টির খেলা খেলেছিলেন নেপথ্য শিল্পীরা। খেলাটার একটু নমুনা দেওয়া যাক:

মূর্ধণ্য ল-কে ল. লেখা হয়েছে। এই ল-এর উচ্চারণ স্থান একটু ভেতর দিকে। উল্টোপাল্টা শব্দের ল-এর উচ্চারণ মোটামুটিভাবে এই ল.-এর মতো।

অল.তা>অলক্তক, অশী+eighty>অশীতি, *অসরা>আসার।

আবু>অর্বুদ, *আলট>আলাবর্ত।

ইন্দারা>ইন্দ্রাগার (ইন্দারা শব্দটি মূলত হিন্দী হলেও ওড়িয়া উচ্চারণের আধারেই উদ্ভট অর্থবহ ইন্দ্রাগার শব্দটির সৃষ্টি।)

উই>উপজিহ্বিকা/উপদীকা/উপদেহিকা, উকুণি>উৎকুণ।

*ওউ (=চালতা)>অবকা, ওড়শ>উদ্দংশ, ওড়>ওড্র, *ওধ>উদ্র।

খইর>খদির, *খুড়ুতা>খুল্লতাত।

গণ্ঠি>গ্রন্থি, *গুআ>গুবাক, *গোধি=গোধিকা।

*ঘণ্টি>ঘণ্টিকা, *ঘুষুরি>ঘৃষ্টি।

*চউপাড়ী→চতুষ্পাঠী, *চমচটা→চর্মচটক, চাকুণ্ডা→চক্রমর্দ, চাচেরী→চচ্চরী।

*ছেউণ্ড→ছেমণ্ড, *ছেলি.→ছল্লী, *ছেলি→ছেলক।

*জউ→জতু, জামু→জম্বু।

ঝটতি→ঝটিতি, ঝড়ি→ঝটিকা।

টংকা→টঙ্ক, টাকু→তর্কু, *টেক→টঙ্ক।

ঢমণা / ঢামণা ( সাপ )→ধর্মণ।

*তীয়র→তীরর, *তুনী→তুম্বি, তেন্তলি→তিন্তিড়ি।

থাণু→স্থাণু, থোপা→স্তবক।

দাআ→দাত্র, দেউল.→দেবকুল।

*নিআলী→নবমল্লিকা, নিখ→নিষ্ক।

*পেড়ি→পেটিকা, পোই ( শাক )→উপোদকী, পোলুঅ→পলর।

ফরুআ→ফরুবক, ফাস→পাশ।

বাঙ্ক→বঙ্ক, বাতুড়ি→বাতুলি, *বিইঁচি / বিইঞ্চি→বিচচিকা।

*ভঁউরী→ভ্রমরী, ভালিআ→ভল্লাত / ভল্লাতক।

মউড়>মকুট, *মাখনা / মাখুনা→মৎকুণ, মাছরঙ্কা→মৎস্যরঙ্কা।

*যাআঁলা→যামল, *যাউ→যবাগু।

রোহি ( মাছ )>রোহিত। লাঞ্জ>লঞ্জ।

*শঅর / শউর→শবর, শগড়→শকট, শাহাড়া>শাখোটক, শাঙ্কোচ ( মাছ )→শঙ্কোচ, *শিঙ্ঘাণি / শিঙ্ঘণী>শিঙ্ঘণ / শিঙ্ঘাণ, *শিলপুআ>শিলাপুত্র, শুআ>শুক, শুআর>শূপকার / সূপকার, শেউল>শকুল ; শোথ>শ্বরথু ( বৈ )।

সউতুনী>সপত্নী, সিন্ধি ( চোর )>সন্ধি ( চোর ), সুনসুনিআ> সুনিষণ্ণক [ বলে রাখা ভালো শব্দটি বানানোর কাজে বাঙলা সুষনি ( শাক ) শব্দের প্রভাব পড়েছে। ]

*হিড়মিচা / হিড়িমিচা>হিলমোচিকা. হুড়ুকা>হুড়ুক, *হুণ্ডা>হুণ্ড।

## সংস্কৃত ভাষায় মরাঠী ঐতিহ্য

একই কায়দায় মরাঠী ভাষা থেকেও শব্দ চুরির মোচ্ছব শুরু হয়েছিল। তারকা চিহ্নিত শব্দগুলো খাঁটি মরাঠী। বাকি শব্দগুলো দু-একটি প্রতিবেশী ভাষায় কিছু রূপ বদলে আছে।

*অগাংতুক / আগংতুক > আগন্তুক, *অরুতা → অর্হতা, *অশ্মা → অশ্মন্, *অস্বল → অচ্ছভল্ল।

আচ / আচি → অর্চিস্, *আততায়ী / আতত্যায়ী → আততায়িন্, *আপোশন / আপোষ্ণী → আপোশান, *আংস / আস → অক্ষ।

*ইথ্যংভূত → ইত্থম্ভূত। ঈস → ঈষা।

উকর / উকরী → উৎকর, উকলণে → উৎকীলন, উপল / উপলী → উপল, *উসনেং → রশ্মন্ ( বৈ ), উসে → ওপশ ( বৈ )।

উর → উরস্, উহ → উহন।

এডকা → এড / এডক, এথেং → ইত্থম্।

ঐকণেং → অভি-কর্ণ ধাতু।

ওলংবা → অবলম্ব, *ওলা → ওল / ওল্ল, ওসাড → উৎসদ/অবচ্ছদ।

খেডে → খেট।

গাভারা → গর্ভাগার, গারুডী → গারুডিক, গুংফণেং → গুম্ফ্ ধাতু, *গোফা → গুল্ফ।

ঘোউস বা ঘুস ← কশ, ঘোটা → ঘুট।

চিখল → চিখল্ল, চিখল → চিকলীত ( বৈ ), চিংচা → চিঞ্চা, চুটকী → ছোটিকা, ছেল-ধাতু → ক্ষিল্-ধাতু।

জুংভণে → জৃম্ভণ, জেরণেং → জেমন।

ঝগঝগণে → ঝগঝগায় ধাতু, ঝল → ঝলাং।

টাকণখার → টঙ্কন / টঙ্গণ, টাংকী → টঙ্ক। ঠাকুর → ঠক্কুর।

ডাংস → দংশ, ডোণ / ডোণী → দ্রোণী।

ঢব্বু > ঢব্বুকা, ঢিবর / ঢীবর > ধীবর।

*তুপ → তৃপ্র ( বৈ ), তোংড → তুণ্ড, তিখ > তিগ্ম, তিখট > তিগ্ম।

*থরু → ৎসরু, থাউ → স্তাক।

দোণ / দোণী→দ্রোণী, দেবত্তর→দেবত্র।

ধাকটা / ধাকুটা→ধাক / থাক।

নাণে→নাণক, নির্ভংসণে>নির্ভর্ৎসনা, নিজধ্যাস→নিদিধ্যাস।

*পঠার→প্রস্তার, পিংল।→পিঙ্গল, পুল.ণ→পুলিন, *পূ→পূয়, পেণ→পিণ্যাক। ফার>স্ফার।

বিভূত→বিভূতি, বুডবুডা→বুদ্বুদ।

ভাংডে→ভাণ্ড, *ভিংডীপাল→ভিন্দিপাল, ভিসে→ভিষক।

মনশীল.→মনঃশিলা, মরাঠা / মর্হাটা→মহারাষ্ট্র, *মান→মন্থা, মালুংগ>মাতুলঙ্গ / মাতুলিঙ্গ / মাতুলুঙ্গ।

*রউরর / রউররী→রৌরব, *ররংথ / রোরংথ→রোমন্থন, রিংগণ> রিঙ্খণ / রিঙ্গণ, রিংগণী / রিংগী—রিঙ্গণ; রীস→ঋষ্য, রুংঢ→রুণ্ড।

লাডণে>লাড্-ধাতু, লেংড>লণ্ড।

বাম্লল>বামলূর, *রিডা→রীটী। রীটিকা।

শিংগাডা→শৃঙ্গাটক, শেন→শ্যেন।

সরডা→সরট, সাজ.ক>সজ্জক; সিংচনে>সিঞ্চন; সুংঠ>শুণ্ঠী; সূপ>শূর্প।

হিংডণে>হিণ্ডন, হেষা>হ্রেষা।

## সংস্কৃত ভাষার গুজরাতি ঐতিহ্য

গুজরাতি ভাষার প্রচুর শব্দ কিছু সংস্কার করে সংস্কৃত ভাষায় ঠাঁই দেওয়া হয়েছে।

অটৱ→অট্-ধাতু, অথাগ→অস্তাঘ।

আথমৱ→অস্তমন, আদরব>আদর। ঈংধণ>ইন্ধন।

উছংগ>উৎসঙ্গ, উতরাণ>উত্তরায়ণ, উপণবং>উৎপরন; উকরডো>উৎকর।

এরং>এরা (বৈ)।

ওতরংগ>উত্তরঙ্গ, ওপবং>উপ-স্কু-ধাতু, কসোটি>কষপট্টিকা।

খরুং>খলু। গমাণ→গরাদনী, গরোলী>গৃহালিকা।

ঘরোল়ী>গৃহালিকা, ঘারী>ঘার্তিক।

চোখ্‌খুং / চোখুং>চোক্ষ, চোমাস্থং>চতুর্মাস।

জনোই>যজ্ঞোপবীত, জ্নুং>জর্ণ (বৈ)।

ঝমক<যমক, টাংকণুং>টঙ্ক।

তর>তরিক, তরস>তর্ষ, ত্রণ>ত্রীণি।

দাত্তুর>দর্দুর, দেবালি.য়ো>দেবকুলিক, দামণ>দামণী / দারণী। ধীট>ধৃষ্ট।

নব+ninety>নবতি (এটি একটি ইঙ্গ-গুজরাতি শব্দ)।

পণর>প্রণর, পাথরর্ং>প্র-স্ত্‌-ধাতু, পাদর>পত্র, পানী> পার্ষ্ণি, পামা>পামন্‌, পারণুং<পারণ, পিংডী→পিণ্ড।

বাংডু>বণ্ড, বাংধো>বন্ধ (উদাহরণ দেহবন্ধ), বোণী→বর্ধনী।

ভত্রীজো>ভ্রাতৃজ। মাখণ>ম্রক্ষণ।

রণকার>রণৎকার, রডবুং>রটন।

লসণ>লশুন, লোহী>লোহিত।

রাঙী>রাটি / রাটিকা।

শাহুডী>শ্বাবিধ (=শজারু)

সনেপাত>সন্নিপাত, সাথিয়ো→স্বস্তিকা, সাংকডো>সঙ্কট। হোডী→হোড।

## সংস্কৃত ভাষার হিন্দুস্তানী ঐতিহ্য

হিন্দী ভাষার অনেক শব্দের সংস্কার করেও সংস্কৃত শব্দ বানানো হয়েছিল। কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাক।

অংগনা / আংগন>অঙ্গন, আখাডা>অক্ষবাট / অক্ষরবাট।

আঁগন>অঙ্গন, আংত→অন্ত্র, আদরক→আর্দ্রক।

উংচন→উদঞ্চন, উল্লু→উলুক।

করাংচ→কপিকচ্ছ।

খটিআ>খট্টিকা, খাপরা>স্কর্পর / কর্পর / খর্পর, খোপড়া / খোপড়ী >খর্পর, খোদনা>ক্ষোদন।

গাহক>গ্রাহক, গুথনা>গুৎসন।

ঘাম→ঘর্ম, ঘুংডী→ঘুন্টিকা। চপাটি→চর্পটী, চংগের / চংগেরী →চঙ্গেরিকা। ছেনী→ছেদনী।

টাংগ>টঙ্গ, টাংগী>টঙ্গ, টিড্ডী→টিট্টিভ।

ঢুংঢনা—ঢুণ্ঢন (এ শব্দটি উইলসনের ডিক্সনারিতে রাখা হয়নি। বুঝতে কষ্ট হয়না ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দেরও পরে এটির 'সৃষ্টি' হয়েছিল।

তক→দম্ভ (যেমন—জাম্বুদম্ভ), তলার / তালার>তলক, তিত্তর→ তিত্তির, তোড়না>তুড় / ত্রুট্ ধাতু।

থরঙ্গ>স্থপতি। দোহদ→দৌহৃদ।

ধতুরা→ধুস্তূর। নহরনী>নখহরণিকা।

পগ্হা→প্রগ্রহ, পসীনা>প্রস্বিন্ন, পহেরী / পহেলী→প্রহেলিকা / প্রহ্বলিকা, পালা→প্রালেয়, পীরা→পীবর, পূআ। পূআ>পূপ, পুনবাসী>পৌর্ণমাসী। ফাসী→পাশিকা, ফিংগা>ফিঙ্গক।

বত্তী>বর্তিকা, বিস্তারা (=বিছানা)>ব্রিস্তর, বুর>কর্বুর।
(কুমারসম্ভব)

ভট্ঠি>ভ্রাস্ট্রিকা, ভাং>ভঙ্গা, ভোজালি>ভূজপাল। (নেপালীমূলক)

মকড়ী (—মাকড়সা)>মর্কট, মচ্ছড়>মৎসর, মুংডনা>√মুণ্ড্ ধাতু, মেঢা>মেঢ্র, মোচি>মোচিক।

রহঁট>অরঘট্ট। রির>রিরংসা (মহাভারত)।

রিচ্ছ / রীছ>ঋক্ষ, রীঢ় (=মেরুদণ্ড)>রীঢ়ক, রোহী (=বটগাছ) >রোহিণ।

লড্ডু>লড্ডুক, লপ্সী>লপ্সিকা, লাথ>লথি, লাংচ>লঞ্চা, লুট>লুপ্ত, লোতরা>লোত্র / লোপ্ত্র, লৌনা>লবণ।

রতংস>অরতংস, রিদরণা / রিদারণা>বিদরণ / বিদারণ।

সাহী (=শজারু)>স্বাবিধ, সিসা (=কাঁচ)>সিক্ষ্য। সোহাগা>সৌভাগ্য (সোহাগার সঙ্গে ভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও শব্দ বানানোর খেলায় সোহাগার ভাগ্য ফিরে গিয়েছিল।), সৌরী (=পুঁটি মাছ)>সফরী।

হরা>হরিৎ, হরিস>হলীষা।

এইভাবে নানান ভাষার শব্দ আত্মস্থ করতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা বানানোর শিল্পীরা যে কত কায়দায় শব্দকে ভাষায় ঠাঁই দিতে বাধ্য হয়েছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বিরক্তিকর বিবেচনা করে ভারতের অন্য সব ভাষা থেকে চুরি করা শব্দের ফিরিস্তি দিলাম না।

আসলে অন্য ভাষা থেকে শব্দ চুরি করার মধ্যে দোষের কিছুই নেই। ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা বাড়াতে অন্য ভাষা থেকে প্রয়োজন-বোধে শব্দ আনতেই হয়। কারণ এক, কোনও ভাষাই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দুই, শব্দ তৈরি করার ক্ষমতা কোনও মানুষেরই থাকেনা তা তিনি যত বড় পণ্ডিতই হোননা কেন। সাংবাদিকেরা নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে নেন বলে যাঁরা মনে করে বসেন তাঁরা ভুল কথা বলেন। নতুন শব্দবন্ধ বানানোর বেশি তাঁরা কিছুই করতে পারেননা। পারা যায়ও না। এই অবস্থায় অন্য ভাষার শব্দ আত্মসাৎ করে নিয়েই ভাষার শব্দ সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। তা বাড়ানোর আর কোনও উপায় নেই। মজার কথা হল: এসব কথা জীবন্ত ভাষা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। মৃতভাষায় এসব তত্ত্ব চলেনা। চলেনা বলেই সারা দুনিয়ার ভাষা থেকে শব্দচুরির অভিনয় সেরে সেগুলোর ইটিমলজি বানিয়ে নেওয়ার অভিনয়ও করতে হয় ওই মৃত ভাষায়। এই ডবল অভিনয়টা জীবন্ত ভাষায় করার দরকার হয়না। বিদেশী শব্দের ব্যুৎপত্তির গল্প বানানোর দরকার জীবন্ত ভাষায় হয়না।

## প্রাচীন ব্যক্তিনামের রহস্য

প্রাচীন বলে প্রচার করা পুরাণের চরিত্র গুলোর নাম বানানোর খেলাটা বেশ মজার। বিচিত্র উদ্ভট সব নাম বানানো হয়েছে। হয়েছে নামের বন্যা বইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নামেও রাজাদের নাম রাখা হয়েছে। এক রাজার নাম রাখা হয়েছে পায়ু। প্রাচীন কালে কেউ হয়েছেন অশ্বমেঢ্র। আরও কিছু রাজার উদ্ভট নাম দেওয়া যাক: অনাবৃষ্টি, অশ্ব, কচ্ছপ, কুকুর, কৃমি, গণ্ডূষ, ঘৃত, নাভি, মৃদু, লাঙ্গল, বৃষ্টি ইত্যাদি। নামগুলোর সবই ছিল খাঁটি সংস্কৃত। সবই হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে।

নামের ঔদ্ভট্যটাকে পণ্ডিতেরা যে প্রাচীনত্বের চিহ্ন ভেবে বসবেন—এ বিশ্বাস নেপথ্যশিল্পীদের ছিল। আর তা ছিল বলেই ওই ব্যবস্থা। নামের বন্যা বানানোরও দরকার ছিল। অমুক বংশের ছাপ্পান্নজন—তমুক বংশের চৌষট্টিজন রাজার বংশানুক্রমে রাজত্ব করার গল্প লিখে এবং দশ ডজন রাজার নাম বানিয়ে আর কিছু হোক বা না হোক ওঁদের রাজত্বকালটা যে এক ধাক্কায় তিন হাজার বছর বলে চালানোর ব্যবস্থা হয়েছে তা মানতেই হয়। সব পণ্ডিত চৌদ্দ পুরুষের নামের তালিকা পেলেই পঁচিশ দিয়ে গুণ করে বসেন। কারণ মোটামুটি ভাবে পঁচিশ-তিরিশ বছর পরেই যে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ জন্মায় এই তথ্যটাকেই তাঁরা কাজে লাগান। তিরিশ চল্লিশ পুরুষের রাজাদের নামের ফিরিস্তি দেওয়া শুরু হয় বাইবেলে। পরে অন্য সব পুরাণে। পুরাণের রাজাদের ওপর সংস্কৃত নাম চাপানোরও কারণ ছিল। না চাপালে লোকে যে ওই ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ করে বসত।

তথাকথিত ঐতিহাসিক যুগের কল্পিত রাজারাজড়ার নাম বানাতে গিয়ে আর এক ধরনের গোলমাল করে বসেছিলেন নেপথ্য শিল্পীরা। ভারতীয় কায়দায় অমুকবর্ধন তমুকবর্ধন—অমুকদেব

অমুকদেব-মার্কা নাম বানানোর সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় কায়দাতেও বেশ কিছু নাম বানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। আর তাইতেই তাঁরা ধরা পড়ে গিয়েছেন। অসংখ্য সংস্কৃত নাম বানিয়ে নিয়েও নামের আকাল দেখা দিয়েছিল। আর সেইজন্যই চন্দ্রগুপ্ত এক নম্বর, কৃষ্ণচন্দ্র সাত নম্বর, রামচন্দ্র তেরো নম্বর ইত্যাদি নাম রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল বিজাতীয় একটি কায়দা নকল করতে গিয়েই। নামের পিছনে নম্বর 'ফিট' করে রাজা-রাজড়ার নাম রাখার ব্যবস্থা মিথ্যার আন্তর্জাতিকীকরণের খেলায় ইতিহাস বানানোর শিল্পীরা দুনিয়া জুড়েই করে বসেছেন। করেছেন ইজিপ্টে, ইরাকে, থাইল্যাণ্ডে, চিনদেশে, ভারতে, ইরানে সর্বত্রই। ইউরোপ ও আফ্রিকার নানান দেশেও এই খেলা হয়েছে। নম্বরী নামের রেওয়াজ এসব দেশের কোথাও (এমনকি ইউরোপেও) ছিল না। এখনও নেই। আসলে ওই শিল্পীদের জন্মস্থান ইউরোপেই ওই কায়দার জন্ম হয়েছে। জন্ম হয়েছে আধুনিক কালেই। প্রাচীন কালে নয়। চতুর্দশ লুই-কে চতুর্দশতম ধরে নিলে প্রথম লুইকে সাড়ে তিনশ বছর আগেকার রাজা বলে মেনে নিতেই হয়—তা তার প্রমাণ থাক বা না থাক।

আসলে ইতিহাসের গল্পের পারম্পর্য রক্ষার একটা কায়দা হিসাবেই নম্বরী রাজার মতলব বানানো হয়েছিল। আর সেই মতলবটা সারা দুনিয়ায় পাচার করতে গিয়েই মিথ্যার কারবারীরা ধরা পড়ে গিয়েছেন। ভারতের প্রাচীন (?) শিলালিপিতে হর্ষবর্ধন ৩, রামচন্দ্র ৫ এই কায়দায় নম্বরী রাজাদের নাম লেখা হত। ব্যাপারটাকে পণ্ডিতেরা কেন যে সন্দেহ করেননি সেইটাই আশ্চর্যের।

ভারতের নানান ভাষায় প্রচলিত ব্যক্তিনামেরও সংস্কৃত রূপ বানানো হয়েছে। গুজরাতি জরথোস্ত→জরথুষ্ট্র, ভরথরী→ভর্তৃহরি, ওড়িয়া মন্থড়া / মন্থড়ি / মন্থুড়া→মন্থরা; মরাঠী জাংবুবংত→জাম্বুবান; হিন্দী রুইদাস→রোহিতাশ্ব; এই ভাবে নানান ভাষার

কত নামকে যে সংস্কৃত সাজিয়ে প্রাচীন (?) কেতাবে রাখা হয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

মরাঠী ঘটোৎকচ, জরৎকারু, জামদগ্নি, নারদ, মন্দোদরী, বাদরায়ণ, হিড়িম্বারা অবিকৃতভাবে ওইসব কেতাবে ঠাঁই পেয়েছে। আসলে ওই সংস্কৃত ভাষার শব্দব্রহ্মের কত অংশ যে ওড়িয়া ও মরাঠী থেকে আর তার নামব্রহ্মের কত অংশ যে মরাঠী ও গুজরাতি থেকে এনে হাজির করা হয়েছে এ-প্রশ্নে কোনও গবেষণাই হয়নি। হলে যে ওই ভাষার প্রাচীনত্বের মিথটা ধ্বসে পড়ত তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়।

আর কিছুতে না হোক ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে সারা ভারতে যে একাত্মতা গড়ে উঠেছে তার মূলে আছে মরাঠি ও গুজরাতি ব্যক্তিনামের ভারতবিজয়। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা অবশ্য উল্টো কথা বলেছেন। তাঁরা সংস্কৃত ভাষার এসিয়াবিজয়ের কাহিনী বানিয়েছেন। তাঁদের কাছে ভারতের জীবন্ত ভাষাগুলোর চেয়ে ওই সংস্কৃত ভাষার ভূমিকাটাই বড় হয়ে উঠেছে। পাণ্ডিত্যের ছদ্মবেশের আড়ালে তাঁরা এস্টাব্লিশমেন্টের কৃতদাসের ভূমিকা পালন করেছেন।

## হ্যালহেড-এর বাঙলা ব্যাকরণ—প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য

হ্যালহেড-এর লেখা Grammar of the Bengal Language (প্রকাশকাল ১৭৭৮ খ্রীঃ) বইটিতে বাঙলা ভাষার ব্যাকরণগত চরিত্র-লক্ষণ প্রকাশ করার যতনা চেষ্টা হয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে বিশেষ একটি বক্তব্য প্রকাশ করার আগ্রহ। বাঙলা শব্দ-গুলোত বটেই এমনকি তার ক্রিয়াপদগুলোর বেশির ভাগই যে সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাঙলায় এসে গেছে এই বক্তব্যটা প্রচার করার দায়িত্বও হ্যালহেড সাহেব নিয়েছিলেন।

বাঙলা ক্রিয়াপদগুলোর মূল হিসাবে এমন সব সংস্কৃত ধাতুর কথা তিনি জানিয়েছেন যা ওই সংস্কৃত ভাষায় রাখাই হয়নি। ওই জাতের কিছু ধাতু ওই ভাষায় রাখা হলেও আলাদা অর্থেই তা ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যাক:

বাঙলা খসে পড়া, গেদে ঢোকানো বা গাদানো, ঝরা বা ঝরে পড়া (=to ooze out), বসা (=to sit), ভরা (=to fill), ভাসা (=to float), মারা (=to beat)—এই সব ক্রিয়াগুলো যে সংস্কৃত খস্, গদ্, ঝৃ, বস, ভৃ, ভাস্ ও মৃ-ধাতু থেকেই সোজাসুজি বাঙলায় এসে গেছে—এই কথাই তিনি বলেছেন। মজার কথা হল: ওই ভাষায় খস্-ধাতু রাখাই হয়নি। অন্য ধাতুগুলো রাখা হলেও সম্পূর্ণ অন্য অর্থেই সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ওই ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির মতলব-টার জন্ম হলেও কোন্ কোন্ শব্দ বা ধাতু ওই ভাষায় রাখা হবে—কি অর্থে সেগুলোর ব্যবহার হবে—সেসব তখনও ঠিক করা হয়ে ওঠেনি। আসলে হ্যালহেড সাহেব নিজেই ওই মিথ্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। আর নিয়েছিলেন বলেই উৎসাহের আধিক্যে ওই সব কল্পিত ধাতুর গল্প তিনি বানিয়েছিলন।

সতেরো শ' আটাত্তর খ্রীস্টাব্দে চালু থাকা বাঙলা ভাষার যে

নমুনা হ্যালহেড সাহেব ওই ব্যাকরণে দিয়েছেন তা দেখে বলতেই হয় ভাষাটার ছিরিছাঁদ কিছুই তখনও গড়ে ওঠেনি। বানানের কোনও নিয়মশৃঙ্খলা ছিল না। ছিল 'অপরূপ' সব বানান। 'ভাসা' আর তার 'প্রকাষ'-ভঙ্গীও ছিল বিচিত্র। ইংরেজ 'পাসণ্ড'-দের 'ছুশাসন'-এ 'পরাধিন' 'দেষ'-টার 'সঙ্কা-'জনক অবস্থা। 'স্বহায়'-সম্বল সব গেছে। 'নবিন' আর 'বিক্ষাত' সব পণ্ডিত কলকাতার উইলিয়ামের কেল্লায় 'নিমন্ত্রন' রক্ষায় ব্যস্ত। 'পরদুঃখকাতর' 'বিচক্ষন' সাহেব 'মহাসয়'-দের কাছে 'মর্যদা' বিকোচ্ছেন। 'করুনা-প্রত্যাসী' হয়ে তাঁরা গোপনীয় কর্ম-'জজ্ঞে' ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। এঁদেরই 'বিসয়-আসয়' কিছু বাড়ছে। তমলুকের 'ব্রাহ্ম' ঝিনেদার কালিয়ায় 'ভুপতি' সেজে বসছেন। (উদ্ধৃতি-চিহ্নযুক্ত সব শব্দই ওই ব্যাকরণ থেকেই নেওয়া) এই অবস্থায় বাঙলা ভাষায় বানানের ব্যাপারে যে বিশৃঙ্খলা চলছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় প্রমাণীভূত (Standardised) বানানের ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত করা হয়নি। তা হয়েছিল উনিশ শতকে। মজার কথা হল: প্রাচীন যুগে লেখা বলে প্রচার করা প্রাচীন সাহিত্যের পুঁথিপত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য দু-একটি ভুল বানান রাখা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাযথ বানানই ব্যবহার করা হয়েছে।

তথাকথিত ণত্ব-ষত্ব বিধান বা হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বরবর্ণের প্রয়োগ করার নিয়মনীতির কিছুই ওই ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে তৈরি হয়নি।

সংস্কৃত তথা পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ভাষার পুঁথিপত্রে শুদ্ধ বানানের প্রয়োগ দেখে সিদ্ধান্ত নিতেই হয় সবই উনিশ শতকে লেখা। বানানের দিক দিয়ে সর্বমান্য প্রমাণ-রূপ গড়ে তোলারও পরে ওসব বানানো হয়েছিল। ল্যাটিন, প্রাচীন গ্রিক, হিব্রু ইত্যাদি তথাকথিত প্রাচীন ভাষার পুঁথির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হয়েছিল। বুঝতে কষ্ট হয়না ওসব ভাষার বানানের প্রমাণ রূপ ঠিক করার পরেই ওইসব পুঁথি লেখা হয়েছিল। প্রাচীনকালে নয়।

## নানান ধাতুর প্রচলন কি প্রাচীনকালে হয়েছিল ?

সোনা, রূপো লোহা, তামা, পেতল ও ব্রোঞ্জ এই সব ধাতু বা ধাতুসংকরের ব্যবহার যে প্রাচীন কালে হত এ-কথা ইতিহাসের বইয়ে জানানো হয়েছে। এমন কি নামী পণ্ডিতদেরও সকলেই 'তথ্য'-টিকে সত্যি বলেই মেনে নিয়েছেন। 'তাম্রযুগ', 'ব্রোঞ্জযুগ' 'লৌহযুগ'—মার্কা 'ধাতবযুগে'র তথ্য ইতিহাসে কম নেই।

প্রশ্ন হল : সে যুগে সত্যিই কি ওই সবের প্রচলন ছিল ? আর তা ছিল বললেই কি তা মেনে নেওয়া যায় ? ওসবের প্রাচীন প্রচলনের যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যপ্রমাণ কি কেউ দিয়েছেন ? ইতিহাসের পণ্ডিতেরা প্রমাণ না দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন কিছু প্রাচীন (?) কেতাব। বাইবেল, ইলিয়াড, ওডিসি, ইনিড, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি কেতাবেই নাকি সে প্রমাণ মজুত আছে—প্রকারান্তরে এই কথাই তাঁরা বলতে চেয়েছেন। আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত বইগুলোতে নানান ধাতুর প্রসঙ্গ খুঁটিয়ে পড়ে নিয়ে যথারীতি ডবল ভুল করে বসেছেন। বইগুলোকে যেমন তাঁরা প্রাচীন বলে মেনে বসেছেন তেমনি মেনে বসেছেন ধাতুগুলোর প্রাচীন প্রচলনের গল্পগুলোকেও। প্রাচীন বলে প্রচার করা ধ্বংসাবশেষগুলোকে নানান ধাতুর প্রদর্শনী হিসাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন প্রত্নতত্ত্বের নেপথ্যশিল্পীরা। রেখেছেন ওইসব গল্পের চাক্ষুষ প্রমাণ হিসাবে খাড়া করার জন্য।

আসলে প্রমাণ কিছুই ছিলনা। দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনি। তবে তথ্যগত প্রমাণের অভাবে মনগড়া কিছু 'প্রমাণ' রাখার চেষ্টা হয়েছিল। আর সে 'প্রমাণ' বানানোর দায়িত্বটা ইতিহাসকারেরা বিভ্রান্তিসৃষ্টির কাজে ওস্তাদ ভাষাতাত্ত্বিকদের ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন। ও শ্রাডের-প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকেরা নানান ভাষায় ওইসব ধাতুবাচক শব্দের সন্ধান করার নামে ধাতুগুলোর কল্পিত উৎসস্থলের গল্প এবং সেখান থেকে নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী বানিয়ে নিয়ে-

ছিলেন। বলে রাখা ভালো এঁরাও পূর্বোক্ত বইগুলোকে প্রাচীন এবং প্রামাণ্য ভেবে নিয়েই তাঁদের 'তত্ত্ব'-গুলো খাড়া করেছিলেন।

'তত্ত্ব'গুলোও ছিল বেশ মজার। ইটালির 'ব্রিন্দিসি' স্থাননামের মধ্যে bronze-এর brn এবং সাইপ্রাস-দ্বীপনামের মধ্যে copper-এর cpr অংশটুকু দেখেই ব্রোঞ্জ ও তামার উৎপত্তিস্থল হিসাবে ওই ব্রিন্দিসি আর সাইপ্রাসকেই তাঁরা স্বীকার করে বসেছেন। 'ব্রিন্দিসি'-কে 'ব্রুনদিসিউম' সাজিয়ে নিয়ে ল্যাটিন বলে চালানো হয়েছে।

ইলিয়াড-এ খালকোস-শব্দটা ২৭৯ বার আর সিদেরোস-শব্দটা ২৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে—এই তথ্যটি জানিয়ে যাঁরা ধাতুর প্রাচীন প্রচলনের তত্ত্ব তৈরীর চেষ্টা করেছেন তাঁরা সকলেই পণ্ডশ্রম করেছেন কারণ ওই ইলিয়াডকেতাবটাই আধুনিক একটি জালিয়াতি ; তার ওপরে নির্ভর করে যেসব তত্ত্ব তৈরি হয়েছে সেসবই ডাহা মিথ্যা—আর সেসব তত্ত্ব তৈরির মাধ্যমে যাঁরা পণ্ডিত হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁরা সকলেই মিথ্যার বেসাতি করেছেন।

ভারতের বাচস্পতিবাবুরা স্থাননামের মধ্যে তম বা তাম কিছু একটা পেয়ে গেলেই তার সঙ্গে তামার সম্পর্ক আবিষ্কার করে তাম্রঘটিত বিচিত্র সব স্থাননাম বানিয়ে নিতেন। 'তমলুক'-কে তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত, 'তাম্বান্নে' বা তাম্বাপাম্নি-কে তাম্রপর্ণী, এমনকি 'তম্বরবরী'কেও তাম্রপর্ণী সাজিয়ে নিয়ে সংস্কৃত বলে চালানো হত। পরবর্তীকালে তমলুক স্থাননামের সঙ্গে তামার সম্পর্ক থাকার গল্পের একটা 'প্রমাণ'-ও হাজির করা হয়েছে। তমলুকের কাছাকাছি একটি গ্রামে মাটির তলায় এগারো খানা তামার পাত পাওয়া গিয়েছিল।

পত্রপত্রিকায় সে খবর প্রকাশিতও হয়েছিল। ধারেকাছের গ্রামে যে আরও পাঁচটি তামার পাত থাকার কথা—এই তথ্যটি জানিয়েছিলেন ওই আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের কলকাতা অফিসের এক পণ্ডিত! আসলে ব্যাপারটা কি? ওগুলো বেশ পরিকল্পনা

মাফিক গুঁজে রাখা হয়েছিল—পরোক্ষভাবে এই কথাটাই বলে বসেছিলেন ওই পণ্ডিতটি। আর তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

আসলে গোঁজামালকে প্রাচীন বলে চালানোর মধ্য দিয়ে ধাতুর প্রাচীন প্রচলনের গল্পকথা আর তার ওপর ভিত্তি করে উদ্ভট সব তত্ত্ব তৈরি করে নিতে পণ্ডিতদের কোনও অসুবিধাই হয়নি। মিশরের এক ফারাও তুতান খামেনের সমাধিতে আঠারো ইঞ্চি লম্বা দুটি ধাতব বাঁশি (?) পাওয়া গিয়েছিল। একটি ছিল তামার—অন্যটি রূপোর। দুটোর ওপরেই কিছু সোনার কাজ করা ছিল। অন্ততঃ পণ্ডিতেরা এই প্রচারই করে আসছেন।

গল্পটা যে বেশ ভালোই বানানো হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হয়। ফারাও-নামক প্রচণ্ড রকমের বিজ্ঞাপিত প্রাচীন ব্যক্তিসত্তাটি যে সোনা রূপোর জিনিসপত্র ব্যবহার করতেন—বাঁশি বানানোর উপযোগী শব্দবিজ্ঞানের কলাকৌশল যে সে যুগের মানুষের আয়ত্তে ছিল এবং ইংল্যাণ্ডের 'ইঞ্চ'-নামক দৈর্ঘ এককটির কথাও যে তাঁর অজানা ছিলনা এসব জেনে সত্যিই আনন্দ হয়। তবে তা আরও বেড়ে যায় যখন পণ্ডিতেরা বলেন ফারাও-শব্দটা হিন্দী 'বড়া'-র সমার্থক অর্থাৎ great বা মহান-বাচক। ভারতীয় শব্দটাই দেশান্তরী হয়ে মিশরে গিয়ে 'ফারাও' হয়ে বসেছিল।

প্রাচীন ইজিপ্টের বেশ কিছু ব্যক্তির নাম যে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত অনেক ব্যক্তির ডাকনামের সঙ্গে মিলে গেছে এমন কথাও পণ্ডিতদের কেউ কেউ বলে বসেছেন। সে যাই হোক, ফারাও-এর সমাধিতে পাওয়া গিয়েছিল বলে প্রচার করা স্বর্ণালঙ্কার যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে তা যে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে বিশেষ একটি মার্কিন স্যাকরার দোকানে অর্ডার দিয়ে বানানো হয়েছিল—একথা বছর কয়েক আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে কষ্ট হয় না গোঁজামালকে প্রাচীন বলে চালানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক কিছুকেই প্রাচীন বলা হত যা আদৌ গুঁজে রাখাও হয়নি। মিউজিয়ামটিতে সাজানো গোছানো

গয়নাগুলো সোজাসুজি ওই স্যাকরার দোকান থেকেই পাঠানো হয়েছিল। ওগুলো পিরামিডের বুড়ি যে ছোঁয়নি তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়।

নানান ধাতুর আকরিক থেকে ধাতুকে আলাদা করা সম্পর্কে প্রাচীন কেতাবে কোনও তথ্য না থাকলেও ধাতুকে নমনীয় করে তোলার উদ্ভট সব তথ্য রাখা হয়েছে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি নানান প্রাচীন (?) কেতাবে। যব, মাসকলাই, তিলভস্ম, মধু, ভেড়ার দুধ, গরুর দাঁত আর খুরের চূর্ণ সহযোগে ধাতুকে নমনীয় করে তোলার আজগুবি গল্প বানানো হয়েছে প্রথমোক্ত ওই কেতাবে।

ইতিহাসের কাঁচা মালের পাঁচ আনি তাম্রফলক, ব্রোঞ্জমূর্তি ও প্রত্নমুদ্রার সম্ভার থেকেই পাওয়া যায়। ওগুলোকে প্রাচীন বলে চালানোর জন্যই ধাতু গুলোকে নমনীয় করে তোলার গল্প বানানোর দরকার পড়েছিল। ভঙ্গুর ধাতু দিয়ে যে ওইসব ফলক, মূর্তি বা মুদ্রার কিছুই বানানো যায় না।

প্রাচীনকালে ধাতুর আকরিক সবই পাহাড়পর্বতে পাওয়া যেত। অন্ততঃ ইতিহাসে এই কথাই জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছে পাথর কেটে আকরিক বার করার কাজ করতেন ক্রীতদাসবাহিনী। প্লিনি লিখেছেন :

*"Tunnels are bored into the mountains and carefully explored. The tunnels are called 'arrugiae', a little ways or little streets. They often collapse and bury many workers. When hard minerals occur one seeks to blast them with fire and vinegar. As the resulting steam and smoke often fill the tunnels, the workmen prefer to split the rock into pieces of 150 lbs. or more, and for this purpose they use iron wedges and hammer. These pieces are removed from the galleries that have been hewn out so that an open cavern is formed. So many of these caverns or hollows are made adjacent to

each other in the mountain that finally they collapse with a loud noise and so the mineral in the interior became exposed. Often the eagerly sought gold vein fails to appear and the long sustained and arduous work which had often cost many human lives has been in vain.

প্লিনির ছদ্মনামে ওই কাঁচা ইতিহাস কে লিখেছেন তা জানার উপায় নেই। তবে আধুনিক দিগ্‌গজ এক পণ্ডিত স্বনামেই প্রত্নখনিতত্ত্ব বানিয়ে নিয়েছেন। প্লিনি আগুন আর ভিনিগার দিয়ে পাথরের চাঁই ভাঙার আজগুবি গল্প ফাঁদলেন আর চাঁই ভাঙতে গিয়ে যে সুরঙ্গ তৈরী হত তার নাম রাখলেন 'আরুগিয়াই'। ওই কায়দায় সুরঙ্গ হওয়ার কথা নয়। হওয়ার কথা রঙ্গের। আগুন আর ভিনিগার দিয়ে পাথর ভাঙা যায় না। চাড্ডি ধূম্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই হয়না।

তবে প্লিনি বলে কথা! সারা দুনিয়া যাঁকে প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক ভেবে বসেছেন তার কথা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? নব্য পণ্ডিতও কম যাননি। হাজার হাজার ক্রীতদাসের দশগুণ আঙুলের ছাপ হাজার দুয়েক বছর পরে স্পেনের এক খনির কাদার মধ্যে আবিষ্কার করে তিনি আর এক উদ্ভট তত্ত্ব তৈরি করেছেন। সেসব আঙুলের ছাপ দেখে শুধু যে খনিটিকে তিনি প্রাচীন বলে মেনে নিয়েছেন তাই নয়—ক্রীতদাসদের জীবনযন্ত্রণা—তাঁদের ওপর প্রচণ্ড অবিচারের তথ্য—তথাকথিত রোমক ও কার্থেজীয়দের নৃশংস ভূমিকা—কোনও কিছুই জানতে বা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। এই না হলে পাণ্ডিত্য!

বিশেষ কিছু বস্তুর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে মোটামুটি স্থির নিশ্চয় হওয়ার কিছু প্রমাণ বিজ্ঞানের দৌলতে আজ আমরা পেয়ে গেছি। 'বিশেষ কিছু' কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। কার্বন-ঘটিত যৌগ আছে এমন বস্তু কত প্রাচীন তা কার্বন-ডেটিং-এর কল্যাণে আমরা জেনে নিতে পারি। কার্বন নেই এমন কিছুর প্রাচীনত্ব ওই পরীক্ষায়

করা সম্ভব নয়। নানা রকম রেডিও-অ্যাকটিভ মৌলের হাফলাইফ জানা থাকার সূত্রে ওই জাতীয় মৌল আছে এমন কিছু যৌগ থাকলেই সে বস্তু কতটা পুরনো তা জানা সম্ভব। তা না থাকলে সে পরীক্ষার প্রশ্নই উঠেনা। প্রাচীন কোনও জায়গার—তা সে মাটি চাপাই হোক বা না হোক—কোন ধ্বংসাবশেষে পাওয়া ধাতব পদার্থের কিংবা পাথুরে জিনিষ-পত্রের মধ্যে যে কার্বনঘটিত কিংবা হাফলাইফ জানা রেডিও-অ্যাকটিভ যৌগ থাকবেই—এমনটা আশা করা যায়না।

মজার কথা হল ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে হাজির করা বস্তুর বয়স মাপার দায়িত্বটা প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা কোনও নিরপেক্ষ পণ্ডিতদের ওপরে না দিয়ে চাপিয়ে দেন ওই প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগেরই বিজ্ঞানীদের ওপরে। আর গোলমালটা বাধে সেইজন্যই। মাননীয় (?) মন্ত্রীর চুরি ধরা তাঁর সচিবের কাজ নয়। ধরা মানেই চাকরী খোয়ানো। বিভাগীয় তদন্তে সত্যের প্রকাশ ঘটে না। বিভাগীয় সচিব কিংবা বিজ্ঞানীদের 'অফিসিয়াল সিক্রেসি'র নিয়ম কানুন মেনে চলতেই হয়। বলে রাখা ভালো সচিবের চুরি ধরাও মন্ত্রীর কর্ম নয়—তা ধরা মানেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের বিপদ ডেকে আনা। এক্ষেত্রে মাসতুতো ভাই হয়ে থাকাটাই কম বিপদজনক।

নানান ধাতুর প্রাচীন প্রচলনের প্রমাণ দেওয়ার কাজে নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীদের সাহায্য নেওয়া হয়নি কেন? তবে কি তাঁদের কাজে লাগানোর বিপদ ছিল? ধাতুনিষ্কাষণ বিদ্যার জন্ম যে প্রাচীন কালেই হয়ে গিয়েছিল—এই উদ্ভট কথাটাকে বিজ্ঞানীরা আমল দেবেন না—একথা জেনেই কি তাঁদের ওপরে ওই দায়িত্বটা চাপানো হয়নি?

আর একটা কথা। ভাষাতাত্ত্বিকদের ধাতুবিদ্যার দৌড় ত ইটিমলজি বা শব্দব্যুৎপত্তিতত্ত্ব পর্যন্ত। শব্দ থেকে টেনে হিঁচড়ে ধাতু বার করার অভিনয় করতে গিয়ে কল্পিত সব ধাতু গুঁজে দিতেই যে তাঁরা ওস্তাদ ছিলেন। আকরিক থেকে ধাতু বার করার তত্ত্ব

সম্পর্কে তাঁরা ত' কিছুই জানতেন না। তাঁদের ওপরে ওই দায়িত্বটা চাপানো হল কেন? রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কে যাঁর কোনও ধারণা নেই তাঁর কাছ থেকে কেউ মেটালার্জির তত্ত্ব জানতে চায়না। তবু তা চাওয়া হয়েছিল কেন? আসলে নানান বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ওই সব ভাষাতাত্ত্বিকদের কাজে লাগানো হয়েছিল। ঘটনা হচ্ছে এই। মিথ্যার কারবারীদের সাকরেদ হিসাবে কম ভাষাতাত্ত্বিক ভাড়া খাটেননি। আর তাঁদের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য সম্পর্কেও কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

প্রাচীন যুগে মাটি খুঁড়লেই তাল তাল সোনা পাওয়া যেত কিংবা সোনার আকরিক থেকে সোনা আলাদা করে নেওয়ার জ্ঞান তখনকার মানুষদের ছিল—এমন কিছু মনে করে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। আসলে প্রত্নতাত্ত্বিক-সেজে-বসে-থাকা কিছু নেপথ্য-শিল্পী ধাতুগুলোর ওপরে প্রাচীনত্ব আরোপ করার একটা খেলা খেলেছিলেন। খেলেছিলেন সোনা-রূপোর আভিজাত্য বাড়াতে। খেলেছিলেন সুপ্রাচীন সুসভ্য দেশগুলোর ঐতিহ্যের আভিজাত্যের মুখরোচক গল্প বানাতে। Old is golden-এই নির্জলা মিথ্যাটাকে ইতিহাসের মূলবক্তব্য হিসাবে যাঁরা প্রচার করতে চান তাঁরাই gold is 'olden' বলে চালাবার চেষ্টা করেন। আর তা করেন বলেই কীর্তিবাসী রামায়ণে 'সাতাশি লক্ষ মণ সোনা আছিল সেথায়' ইত্যাদি বাণী রাখার দরকার পড়েছে। প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা বলে প্রচার করা ইতিহাসের কেতাবে খেঁকশেয়ালের সাইজের পিঁপড়েদের গল্প বানিয়ে রাখতে হয়েছে।

ওই সব পিঁপড়ে মাটির তলা থেকে সোনা জোগাড় করে এনে ডাঁই করে রাখত আর সে সোনা যাতে মানুষ চুরি করে না পালায় তা দেখার জন্যই পাহারা দিয়ে রাখত। মজার কথা আরও আছে। সোনা বার করে আনা ওই 'পিঁপড়ে'র প্রসঙ্গ মহাভারতেও (২, ১৮৬০) রাখা হয়েছে। বিচিত্র পিঁপড়ে গুলোর জোগাড় করা বিচিত্রতর সোনার নাম রাখা হয়েছিল 'পিপীলিকা'। গ্রিসের

ইতিহাস, ইলিয়াড, ওডিসি, মহাভারত সবই যে একই মতলবের নানান নাম। একই জায়গায় তৈরি। মিল ত কিছু থাকবেই। সোনা বস্তুটা যে দামী এ-তথ্য পিঁপড়েগুলো জানত বলেই যে তারা আগলে রাখত ওই সোনা!

অতীতের গর্ত থেকে ইতিহাসের কল্পিত উপাদান সংগ্রহ করে নেওয়ার অভিনয় সেরে ইতিহাসের পণ্ডিতেরা ওগুলোকে এতই মূল্যবান ভেবে বসেছেন যে ওগুলোকে আগলে বসে আছেন। তাঁদেরই বানানো ওই 'পিঁপড়ে'-গুলোর মতোই সোনার চেয়ে দামী ওই ইতিহাসটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ওগুলো যেন অনন্তকাল বেঁচে থাকে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের এবং তাঁদেরই বানানো প্রাচীন পিঁপড়েগুলোর কেরামতিটা কেউ সন্দেহের চোখে দেখেননি —এইটাই আশ্চর্যের।

## নেতাজির গল্পটাও ইতিহাসে রাখা হয়েছে

ইতিহাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নামটাকে বাঁচিয়ে রাখার যত চেষ্টাই করা হোক না কেন—দুনিয়া জুড়ে তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের যত প্রচারই চলুক না কেন—অপ্রিয় সত্য যা প্রকাশ হয়ে পড়েছে তা হচ্ছে এই : নেতাজি বলে কেউ ছিলেনই না। আসলে একটা বানানো গল্পের কল্পিত নায়ককে 'নেতাজি' বলে চালানো হয়েছে আর আমরা 'তাঁকে' ইতিহাসের এক পরম বিপ্লবী ভেবে আনন্দ পেয়েছি : ভারতে মাৎসিনি বা গারিবোল্দি না থাকার দুঃখটা আমরা মিটিয়েছি ওই নেতাজিকে দিয়ে। ঘটনা হচ্ছে এই। আসলে সুভাষচন্দ্রের নাম জড়িয়ে ওই নেতাজির নামে একটা বীররসাত্মক আষাঢ়ে গল্প লেখা হয়েছে যার সঙ্গে রক্ত-মাংসের সুভাষচন্দ্রের কোনও সম্পর্কই ছিল না। থাকার প্রশ্নটাই ছিল আজগুবি কারণ সুভাষচন্দ্র ওই একচল্লিশ সালে ভারতের বাইরেই যাননি। বিদেশে গিয়ে তাঁর বিপ্লবী দৌড়ঝাঁপ করার প্রশ্নই ওঠেনি। আর তা প্রমাণ করার জন্যই এই প্রতিবেদন লেখার উদ্যোগ।

মজার কথা হচ্ছে এই : কল্পলোকের ওই নেতাজির সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও প্রচারের ঠেলায় ইতিহাসে পরম গৌরবে ঠাঁই পেয়েছে ওই 'নেতাজি' আর নাম জড়ানোর কল্যাণে ওই সুভাষচন্দ্রও।

লোকে জানে সুভাষচন্দ্র আর নেতাজি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। লোকে জানে উনি ভারত থেকে পালিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন আর বিদেশে গিয়েই উনি 'নেতাজি' হয়েছিলেন। লোকে জানে উনি 'দেশপ্রেমিকোত্তম' 'ইতিহাসপুরুষ'। কেউ কেউ ওঁকে 'আপাদ-মস্তক দেশপ্রেমিক' বলেও মনে করে বসেছেন। (আপাদমস্তক তিনি কি ছিলেন তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য) লোকে জানে তার কারণ সরকারী-বেসরকারী প্রচারমাধ্যম থেকে ওই কথাই জানানো হয়েছে।

প্রচারের বিরাম নেই। নিত্য নতুন উপাখ্যানও কিছু কম বানানো হয়নি। মিথের মজাই এই রকম। বারবার বলতে হয়; বারবার লিখতে হয়। দেখতে হয় মিথটা যাতে বেঁচে থাকে। আসলে মিথের আবেদন ইতিহাসের চেয়েও বেশি। আর বেশি বলেই নানান জাতের মিথ বানানোর ব্যবস্থা হয়। বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়। ইতিহাসের মতোই মিথ-ও বানায় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপোষ্য লেখকের সংখ্যা কম নয়। গোপনীয়তার পরিমণ্ডল রচনা করে—সোজা ভাষায় লুকিয়ে এবং নিজেদের নাম গোপন রেখে এঁরাই মিথ বানিয়ে রাখেন—বাঁচিয়ে রাখেন। নামী লেখকদের কেউ কেউ স্বনামে ওই মিথ লেখার কর্মকাণ্ডে ভাড়া খাটেন। আর এ ব্যাপারে টাকা-পয়সার অভাব হয়না। বাজেট-বহির্ভূত টাকা খরচ করার স্বাধীনতাও এসব ব্যাপারে থাকে। রাজনীতিকদের মিথ, পাণ্ডিত্যের মিথ, ধর্মধ্বজীদের মিথ—মিথে মিথে ছয়লাপ বানানো হয়। মিথ-এর ডালপালা গজায়।

ওই নেতাজির নামে সর্বশেষ যে উপাখ্যানটা বানানো হয়েছে তা বেশ মজার। তিনি এক শ' চৌদ্দ কোটি টাকার একটা তহবিল রেখে গেছেন। ভদ্রলোক কি বার্মা, মালয়, ইন্দোচীনে সার্কাস দেখাতে গিয়েছিলেন? নাকি কালচারাল ট্রুপ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন? এক সাম্রাজ্যবাদের হাতছাড়া হয়ে আর এক সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়ে যাওয়ার আনন্দে ওসব দেশের লোকেরা দানসত্র খুলতে যাবেন কোন দুঃখে? আর অত টাকা? কত গল্পই যে বানানো হয়েছে কে তার হিসেব রাখে।

সুভাষচন্দ্র যে ভারত রাজনীতিতে নিজেকে ভীষণভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন এবং 'ভারতের মুক্তিচিন্তার ছটফটানি' (জয়প্রকাশ নারায়ণ) যে তাঁকে বিদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল এবং তিনি যে বিদেশ-বিভুঁইয়ে বছর চারেক নানান চিত্তাকর্ষক কাজ-কর্ম করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। শুধু আছে বললে ঠিক হবেনা। প্রমাণের ঘটা আছে। মিথ্যার প্রমাণ একটু বেশি করেই

রাখতে হয়। ঘটাটা সেইজন্যই। ইতিহাসের অশোক আর রাজনীতির মানুষ ওই সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের প্রমাণ এখনও এসেই চলেছে। তথাকথিত অশোকের শিলালিপি শ' দেড়েক বছর ধরে—আর ওই সুভাষচন্দ্রের—বিশেষ করে তাঁর 'অন্তর্ধান'-উত্তর কল্পিত কাণ্ডকারখানার সরস প্রমাণপুঞ্জ বছর পঞ্চাশ ধরে বানিয়ে রাখার একটা খেলা খেলেছেন নেপথ্যশিল্পীরা। আর তাঁদের সনাক্ত করাটাও এই প্রতিবেদনের উদ্দিষ্ট।

সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবনের যে কত বিচিত্র কায়দার প্রমাণ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এ ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই। অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতার কাজকর্মের যতনা প্রমাণ রাখা হয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি রাখা হয়েছে এই একটি ভদ্রলোকের কর্মকাণ্ডের প্রমাণ। বিশ্বাস যোগ্যতার অভাব থাকলেও প্রমাণের অভাব রাখা হয়নি।

এক, সুভাষচন্দ্রের সইসাবুদ করা চিঠিপত্র কম নেই। কটক আর কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ী থেকে উদ্ধার করা চিঠি-পত্রের পরিমাণ দেখে মনে হয় ওই দু-বাড়ীর তোষক-বালিশগুলো বুঝিবা চিঠিপত্রেই ঠাসা ছিল। আর সেসবের ভাষা? অখদ্যে বাঙলা—কুৎসিৎ ইংরিজি। যা সুভাষচন্দ্র ত দূরের কথা কোনও শিক্ষিত মানুষের লেখা বলে মনেই হয়না। হাতের লেখা? এক এক চিঠিতে এক এক কায়দার। কোথাও পাকা, কোথাও ডাহা কাঁচা। একজন মানুষের হাতের লেখা যে এত রকমের হতে পারে তা ভাবতেও কষ্ট হয়। দু-চার বছরের তফাতে কারুর হাতের লেখার ভূতুড়ে পরিবর্তন হয় না। আর তা হয়না জেনেই কিনা জানিনা ওইসব চিঠির মধ্য থেকে বেছে নেওয়া কিছু চিঠির ফটোস্টাট কপি বিক্রি করে চলেছেন ওই 'নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো'-নামের জালজালিয়াতি-জোচ্চুরির আড়ৎ-মার্কা প্রতিষ্ঠানটি। রাষ্ট্রায়ত্ত ওই প্রতিষ্ঠানটি মিথ্যাসৃষ্টির কর্মকাণ্ডে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। 'গিনেস বুক অফ রেকর্ডস্'-এ কেন যে এটির নাম রাখা হয়নি সেইটাই আশ্চর্যের।

দুই, তথাকথিত নেতাজির কর্মকাণ্ডের চিত্রবিচিত্র আলোক-চিত্রের অভাব রাখা হয়নি। কোনওটা ধোঁয়াটে—কোনওটা পরবর্তীকালের দানিকেনীয় প্রাগৈতিহাসিক কারসাজি-কেও হার মানায়। এক একটা মুখ এক এক টাইপের। কারুর মুখের সঙ্গে মিল নেই সুভাষচন্দ্রের মুখেরও। কারুর চেহারার সঙ্গে মিল নেই তাঁর গোলগাল টাইপের চেহারার। শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ে ওই নেতাজির ব্রোঞ্জমূর্তি বসানো হয়েছে। মূর্তিটি যিনি তৈরি করেছেন তিনি নিখুঁতভাবেই তা করার চেষ্টা করেছেন। শিল্পীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অবিকল ওই রকমের সবকিছু একটি 'ফটো'-তেও পাওয়া যাচ্ছে। কৈলাস নাথ কাটজু-টাইপের মুখ-ওলা ওই মূর্তিটিকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। বলা হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের মুখের সঙ্গে মূর্তিটির মুখের কোনও মিলই নেই। বলা হয়েছিল ছুটন্ত ঘোড়ার লেজ খাড়া থাকার কথা নয়। সমালোচকেরা ঠিক কথাই বলেছিলেন।

প্রশ্ন আসছেই। এক, লাখ খানেক টাকা খরচ করে ভদ্রলোকের ক্যারিকেচার-মার্কা মূর্তিটা বানানো হল কেন?

দুই, শিল্পীর যখন কোনও দোষ নেই তখন দোষটা কার? তিনি ত একটি ফটো দেখেই মূর্তিটি গড়েছিলেন। ফটোর সঙ্গে মূর্তিটার তেমন কিছু গরমিলও নেই। তাহলে?

তিন, তবে কি ফটোটার মধ্যে কোনও গোলমাল ছিল? তাই বা কি করে হয়? কায়দা করার ইচ্ছা না থাকলে ফটো ত হুবহু সত্যকেই প্রকাশ করে। ঝুলন্ত লেজকে খাড়া করে দেখানোর ক্ষমতা ক্যামেরার থাকতেই পারে না। তাহলে? রহস্যটা কোথায়? আসলে রহস্য বলে কিছুই নেই। যে ফটো দেখে তিনি মূর্তিটা গড়েছিলেন ভূত ঢুকে বসে আছে সেই ফটোটার মধ্যেই। আসলে ওটা যথার্থ ফটো নয়। ফটোর মতো দেখতে হলেও ফটো বলতে যা বোঝায় তা নয়। ওটা একটা হাতে-আঁকা ছবির তুলে রাখা ফটো। আসলে ভুলটা করেছিলেন নাম গোপন রেখে যিনি ছবিটি

এঁকেছিলেন তিনি। আসলে এই ভদ্রলোক সুভাষচন্দ্রের মুখের আদলটাও আনতে পারেননি। তাছাড়া ছুটন্ত ঘোড়ার লেজটা কি অবস্থায় থাকে সে সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না! কাঁচা অঁাকিয়ে হলে এই হয়! ফটোগ্রাফার ভদ্রলোকটিরও কিছু ভূমিকা ছিল। কাঁচা ছবির ফটো তুলতে গিয়ে তিনি কোনও কায়দাই করেন নি। কায়দা তিনি একটাই করেছিলেন। সেটা তাঁর নিজের নাম গোপন রাখার মধ্য দিয়ে। বুঝতে কষ্ট হয়না ওই চিত্রশিল্পীর মতো তিনিও একজন ভাড়াটিয়া শ্রমিক। নেপথ্যে কেউ তাঁদের কাজে লাগিয়েছিলেন। আসলে ফটোঘটিত জালিয়াতিটা তিনি সজ্ঞানেই করেছিলেন। কেউ বোঝেননি সেইটাই আশ্চর্যের।

ব্যাপারটা বিস্তৃতভাবে জানানোর কারণটা বলে নিই। 'নেতাজি'র বেশির ভাগ 'ফটো'-ই এই ধরনের। রাজ্যের কারচুপি-কারসাজি করেই ওই 'নেতাজি'-কে বানানো হয়েছিল। আর সেই জন্যই তাঁর হরেক রকমের মুখ। কোনওটা ককেশয়েড—কোনওটা মঙ্গোলয়েড—চোখের কোণে ছিল এপিক্যান্থিক ফোল্ড যাথাকার জন্য বাঙলায় কুতকুতে চোখ বলা হয়—নিগ্রোবটু একখানা মুখও পাওয়া যাচ্ছে। ফটোর অভাব রাখা হয়নি। কোনওটাতে প্লেন-এ উঠছেন বা প্লেন থেকে নামছেন—বক্তিমে দিচ্ছেন। সে সব ফটো দেখে চক্ষুস্থির হওয়ার জোগাড় হয়। একখানা মানুষের মুখ এত রকমের হতে পারে? আসলে ওগুলোর কোনওটাই ফটো নয়। ফটোর মতো। জালিয়াতি জোচ্চুরি আর কারসাজির তেরোস্পর্শ ঘটেছে ওগুলোতে। ঘটনা হচ্ছে এই। বিস্তৃত আলোচনা 'নেতাজির ফটো' অধ্যায়ে করা যাবে।

তিন, মূর্তিমান 'নেতাজি'-র হাঁটাচলা বক্তিমে দেওয়া—অমুকের সঙ্গে করমর্দন—তমুকের সঙ্গে মোলাকাত করার প্রমাণও হাজির করা হয়েছে 'চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন'-মার্কা চলচ্চিত্র দেখানোর মধ্য দিয়ে। বৎসরান্তে একদিন ত' বটেই—এখন টি. ভি. র কল্যাণে আরও দু-একদিন তা দেখানো হয়। আর সে চলচ্চিত্র নাকি জীবন্ত!

অন্ততঃ ওই 'ব্যুরো'-র তরফ থেকে প্রচারটা সেই রকমই করা হয়। জাবন্ত মানে বইটির নামভূমিকায় নাকি স্বয়ং সুভাষচন্দ্রই ছিলেন। সত্যিই কি তাই? এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 'নেতাজি ইন অ্যাকশন' অধ্যায়ে থাকবে।

চার, নানান রাষ্ট্রের গোপন নথিপত্র ওই নেতাজিব গোপন কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তিতে বোঝাই। ইংরেজ, জার্মান, জাপানী ও গ্রিক লেখকদের লেখা কম বই ছাপা হয়নি। মজার কথা হল এই যে এঁদের সকলেই নানান রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স দপ্তরেরই কর্মী। নিরপেক্ষ পণ্ডিত বলতে যা বোঝায়—এঁদের কেউই তা নন। নানান রাষ্ট্রের তরফ থেকে ওই নেতাজির গল্পটাকে ইতিহাস বলে চালানোর উৎকট আগ্রহটাও লক্ষ্য করার মতো। পূব-পশ্চিম জার্মানী (সম্প্রতি একীভূত), আফগানিস্তান, জাপান, বার্মা (বর্তমানে মায়ানমা), ইউ কে, ইউ. এস. এস. আর (বর্তমানে বহুধা-বিভক্ত)-সব রাষ্ট্রই মদত দিয়েছে ওই ভদ্রলোকের 'ইতিহাস' রচনার কর্মকাণ্ডে। এমনকি ভিয়েৎনাম ও জনগণতন্ত্রী চিন-ও ওই 'ইতিহাস'-কে সত্যি বলে মেনে নিয়েছে। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—মিথ্যার সাক্ষী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রঘটিত মিথ্যাগুলো সগৌরবে বেঁচে থাকে। যে সব রাষ্ট্রের নাম জড়িয়ে ওই গল্পটা লেখা হয়েছে সেসব রাষ্ট্রের একটিও যদি সত্যি কথাটা ফাঁস করে দিত—তা সে রাশিয়াই হোক বা আফগানিস্তানই হোক —তবে ওই গল্পের ফানুসটা কবেই না ফেঁসে যেত। কিন্তু তা হয়নি কারণ তা হয়না। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মন্ত্রগুপ্তির খেলা চললে কোনও রাষ্ট্রই মিথ্যাটাকে ফাঁস করতে পারেনা।

পাঁচ, জীবন্ত প্রমাণও কিছু রাখা হয়েছে। ওই 'নেতাজি'র সহকর্মীদের কেউ কেউ এখনও বেঁচে আছেন। চাক্ষুষভাবে এঁরা 'ওই ভদ্রলোক'কে দেখেছেন বলে দাবী করেন। একসঙ্গে কাজ করেছেন বলে এঁদের গর্ববোধেরও শেষ নেই। বৎসরান্তে অন্ততঃ একদিন এঁরা স্মৃতিচারণার অভিনয় করে আখের গুছিয়ে নেন। এইসব নন্দীভৃঙ্গীদের (ভূতের সঙ্গীসাথীদের আর কী-ই-বা নাম দেওয়া

যায়!) কথা মানতেই হয়। জীবন্ত সাক্ষী বলে কথা। এঁদের কথা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? ঠাটবাট এঁদের কম নয়। মাতব্বরের মতো ঘোরাফেরা করেন। আজ আমেরিকায় সেমিনার অ্যাটেণ্ড করছেন ত' কাল টোকিও'য় উড়ে যাচ্ছেন। পরশু 'বন'-বিহার করতে প্লেনে চাপছেন। এঁরা কি মিথ্যা কথা বলতে পারেন? এঁদের কেউ সি. পি. এম. করছেন। কেউবা নক্সাল আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা সেজে বসেছিলেন। শাহ্ নওয়াজ খাঁ দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হয়ে ছিলেন। তথাকথিত আজাদ হিন্দ ফৌজে থাকার সুবাদে এতদিন মন্ত্রী থাকার কথা নয়। তবে কি তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্যই ওই প্রাইজ পোস্টটা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল? সহকর্মী-পরিচয়ধন্যদের অনেকেই ভালো চাকরী পেয়ে গিয়েছিলেন। ফৌজের যেসব সাধারণ সৈন্য যুদ্ধবন্দী হয়ে পরে মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁরা ত কিছুই পাননি। শুধু ফৌজের অফিসাররাই উপকৃত হলেন কেন? তবে কি কেবল তাঁরাই মিথ্যাটা জানতেন? তাইত আসছে!

ছয়. জোরদার প্রমাণ আরও রাখা হয়েছে। ওই নেতাজির 'বিবাহিতা স্ত্রী' এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর একটি কন্যাও আছেন। স্ত্রী-পরিচয়ধন্যা ভদ্রমহিলা এদেশে না এলেও তাঁর কন্যা বারদুয়েক এদেশে এসে সরকারী সমাদর কুড়িয়েছেন। কন্যাটি যে ওই নেতাজির অর্থাৎ সুভাসচন্দ্র বসুরই—একথা ওই 'বিবাহিতা স্ত্রী' নিজেই স্বীকার করেছেন। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে? তবে অন্য এক গণ্ডগোল পাকিয়েছেন সেঙ্কল নামের ওই 'স্ত্রী' ভদ্রমহিলাটি নিজেই। নিজে মূর্তিমান প্রমাণ হয়েও আরও কিছু বাড়তি প্রমাণ দেওয়ার লোভ তিনি সামলাতে পারেননি। 'সপরিবারে নেতাজি'র একটি ফটোও তিনি হাজির করেছেন। আর তাইতেই তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন। ফটোটিতে যে ভদ্রলোককে নেতাজি বলে চালানো হয়েছে তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কোনও সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না।

সাত, পুলিশের গোপন রিপোর্ট বা ইণ্টেলিজেন্স দপ্তরের টপসিক্রেট-চিহ্নিত কাগজপত্রেরও অভাব রাখা হয়নি। অমুক কমিশন আর তমুক ফ্যাক্ট-ফাইণ্ডিং মিশনের কাছে সে সবই একটু বেশি মাত্রাতেই সরবরাহ করা হয়েছে। এটা কি করে সম্ভব হল? টপসিক্রেট-চিহ্নিত কাগজপত্র যে মন্ত্রীদেরও দেখানোর নিয়ম নেই। তাহলে? বুঝতে কষ্ট হয়না বিভ্রান্তি সৃষ্টির তাগিদে ওসবই বানিয়ে রাখা দু-নম্বরী জিনিষ। নানান রাষ্ট্র থেকে পাঠানো বলে প্রচার করা দলিল দস্তাবেজ আর পুলিশের রিপোর্ট নাড়াচাড়া করে লাভ নেই। তাতে ধুলোময়লাই শুধু উড়বে—সত্য কিছুমাত্র প্রকাশ পাবে না। আর ইণ্টেলিজেন্সের গুপ্তিপাড়ার বাসিন্দারা যে মন্ত্রগুপ্তির বিপদজনক বেড়াজাল টপকে সত্যি কথাটা বাইরে প্রচার করবে তা ভাবাই যায় না। এই যখন অবস্থা তখন সত্যি ব্যাপারটা জানার উপায় কি? উপায় অন্য সব প্রমাণ বিচার বিশ্লেষণ করেই বার করতে হবে। নেতাদের সম্পর্কে পূর্বগঠিত কোনও মোহকে পুষে রেখে তাঁদের বিচার করা যায়না। অন্য সব প্রমাণের অসারতা কিংবা কারসাজি বুঝিয়ে দিয়ে সে সবকে নস্যাৎ করতে হবে। অন্য কোনও পথ নেই।

এবার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। একটা কথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো। পাকা চোর প্রমাণ রেখে চুরি করে না। প্রমাণ লোপাট করার মধ্য দিয়েই তাকে তার কৃতিত্বের প্রমাণ রাখতে হয়। জাল লোক সেজে ভালো অভিনয় করা সহজ ব্যাপার নয়। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় সব সময় থেকেই যায়। যাঁর নকল সাজছেন তাঁর বাচনভঙ্গী কিংবা কণ্ঠস্বর মোটামুটি জানা না থাকলে জাললোকের কথাবার্তা না বলাই ভালো। যাঁর নকল সাজছেন তাঁর ব্যবহার করা ভাষাশৈলী সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে জাললোকের লেখাজোখা না রাখাই উচিত। অস্তিত্বের সপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কিছু গল্প বানিয়ে প্রচার করার মধ্য দিয়েই জাললোকের অপ্রত্যক্ষ অভিনয়টা চালিয়ে যেতে হয়। জাললোক

কোনও গোপন আস্তানায় কিংবা বিদেশে গিয়ে বিয়েথা করেছেন। সন্তানাদি হয়েছে। এই ধরনের গল্প লিখেই জাললোকের অভিনয়টাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। জাললোককে দিয়ে অবিশ্বাস্য কাজকর্ম করিয়ে নেওয়ার—এন্তার বক্তৃতা দেওয়ার কিংবা অফুরন্ত চিঠি লেখানোর ব্যবস্থা করতে গিয়েই মিথ্যার কারবারীরা ধরা পড়ে গিয়েছেন। 'সুভাষচন্দ্র' ও 'রাসবিহারী বসু' নামক দুটি জাল-লোকের নামে জাল বক্তৃতার বয়ান, চিঠিপত্র ও ফটোর প্রমাণের আদিখ্যেতা দেখাতে গিয়েই তাঁরা ভুল করে বসেছেন। পুরো গল্পটাকেই ডুবিয়েছেন। ডুবিয়েছেন সুভাষকে—নেতাজিকে—রাসবিহারীকেও।

## সুভাষচন্দ্রের 'অন্তর্ধান'—আনন্দবাজার পত্রিকার ভূমিকা

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের খবরটা প্রথমে কেবল আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ছাপা হয়েছিল বিশেষ একটি কায়দায়। অনেক খবরই ত' বিশেষ একটি কাগজে প্রথমে বেরোয়। এতে সন্দেহের কি আছে—এ-প্রশ্ন অনেকেই তুলবেন। সত্যিই ত, সেটা সন্দেহেরও নয়—দোষেরও নয়। বরং কৃতিত্বেরই। সন্দেহটা ওই বিশেষ কায়দাটাকে ঘিরেই আসছে। পত্রিকা খবরটা দিতে গিয়ে লিখছেন :

…ইন্টারমিডিয়েট কোর্স পড়িবার সময় তাঁহার (সুভাষচন্দ্রের) মনে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবল প্রেরণা আসে এবং গুরুর সন্ধান করিবার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তিনি হরিদ্বার, বারাণসী, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন।…

উৎস : আনন্দবাজার পত্রিকা

২৭শে জানুয়ারী, ১৯৫১

বুঝতে কষ্ট হয়না। তথাকথিত অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই গল্প তৈরি করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পত্রিকার তর সয়নি। হরিদ্বার পালানোর গল্প শোনানো হল। কিন্তু কেন? পরিকল্পিত গল্পে যে ওই সুভাষচন্দ্রের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ারই কথা। 'গুরুর খোঁজে' না বেড়িয়ে পড়লে পরের গল্পটা যে জমবেনা। তাই ওই ব্যবস্থা। এর আগেও ত' দুজন বিপ্লবীর 'অন্তর্ধান'-এর ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকারই করে দিয়েছিলেন। একজন সশরীরে পণ্ডিচেরি—অন্যজন অশরীরে জাপানে উধাও হয়েছিলেন। অধ্যাত্মবাদের যে প্রচণ্ড প্রভাব। কার ঘাড়ে যে কখন চাপে কে জানে! প্রথম বিপ্লবীর ঘাড়ে যে তা চেপে বসেছিল তা যে সবারই জানা। ওই অরবিন্দের 'বাসুদেব-দর্শন', 'অন্তর্ধান' এবং আধ্যাত্মিক জীবনে 'উত্তরণ'—সবই যে লোকে পরম বিশ্বাসে মেনে নিয়েছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রেও সেই গল্পেরই পুনরাবৃত্তি হল। হ্যাঁ, তিনিও নিশ্চয় ওই পথেই পা দিয়েছেন। না দিয়ে উপায় আছে? অমোঘ যে সে আকর্ষণ!

পরের দিন পত্রিকার সম্পাদক লিখে বসলেন:

"...আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি ভারতবাসীর কোথায় যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। কর্মোন্মত্ত রাজনৈতিক নেতাও সে আকর্ষণ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। আশ্চর্য নয় যে সুভাষচন্দ্রকে আমরা তাহারই জন্য রাজনীতিক্ষেত্র হইতে হারাইলাম।..."

হরিদ্বার পালানোর গল্প লেখার একদিন পরেই 'সুভাষচন্দ্রকে... হারাইলাম'—এই সিদ্ধান্তে সম্পাদক মহাশয় পৌঁছলেন কি করে? তবে কি তিনি সবই জানতেন? বেহদিশ সুভাষচন্দ্র যে কোনওদিন ফিরবেন না—ফেরার প্রশ্নও অবান্তর—এইসব জেনেবুঝেই কি ওই সিদ্ধান্ত? সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দেশের পথে ভদ্রলোক পাড়ি দিয়েছেন —এমন একটা গল্প চালু করে দিলেই চলবে—খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্ব থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে—এইসব ভেবেই কি গল্পটা বানিয়ে রাখা হল? তাইত আসছে। তাই যে আসছে তার প্রমাণ হিসাবে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ওই 'অন্তর্ধান'-এর পরের একবছর

ওই গল্পটাই চালু ছিল। কখনও প্রচার করা হত হরিদ্বারে একজন সাধু ধরা পড়েছেন। কখনও-বা জানানো হত উনি ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র কিনা তা জানার চেষ্টা চলছে—এই ধরনের সব গল্প চালু হয়েছিল। গল্পটা পরেও চালু থাকত যদি না জার্মানীর গোয়েবেল্স্ সাহেবেরা অন্তর্ধান-এর খবরটাকে লুফে নিয়ে ওই আনন্দবাজারী গল্পের চেয়ে অনেক উঁচুদরের একটা গল্প না বানাতেন। গোয়বেল্স্-দের বানানো সেই অপূর্ব গল্পটা ওই সুভাষচন্দ্রের নাম জড়িয়েই বানানো হয়েছিল। বানানো হয়েছিল ওই 'অন্তর্ধান'এর বছর খানেক পরে। সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। আপাততঃ পত্রিকার কথাই বলা যাক। পত্রিকা সুভাষচন্দ্রের হরিদ্বার পালানোর খবরটা দিয়ে বসলেন। কিন্তু প্রমাণ কই? তিনি কি সত্যিই বাড়ি থেকে পালিয়ে-ছিলেন? তিনি কি একাই গিয়েছিলেন নাকি সঙ্গে আর কেউ ছিলেন—এ-সব প্রশ্ন আসছেই। সে-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দাযিত্বও যে এসে পড়ে। তার ব্যবস্থাও হল। এমনই একখানা গল্প বানানো হল যার প্রমাণ রাখতে বানিয়ে রাখতে হল আস্ত একখানা বই। প্রমাণ দিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। তিনি তাঁর আত্মজীবনী An Indian Pilgrim-এ লিখলেন:

"...After I came into contact with this ascetic, the desire to find a guru grew stronger and stronger with me and in the summer vacation of 1914, I quietly left on a pilgrimage with 'another' friend of mine. I borrowed some money from a class friend who was getting a 'Scholarship' and repaid him from my scholarship. Of course, I did not inform anybody at home and simply 'wrote a postcard' when I was far away · At Hardwar, we were joined by another friend. 'In between', we also visited places of historical interest like Delhi and Agra."

এ কোন্ সুভাষচন্দ্রের লেখা ? দু-নম্বরী ? সুভাষচন্দ্র ওই জাতের ইংরিজি লিখতে যাবেন কোন দুঃখে ? ওই বিদ্যে নিয়ে তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষার ইংরিজি-পত্রে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন— এ-কথা বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে ? না কি তা করা উচিত ? আর একটা কথা। ওই বিদ্যে নিয়ে কেউ বইপত্র লেখেনও না। তাহলে ? পুরো বইটাই জাল। ওটা সুভাষচন্দ্রের লেখা নয়। কোনও ভাড়াটে লেখকের কীর্তি ওই বইটা। বাজারী গল্পের প্রমাণ রাখার তাগিদেই বইটা লিখিয়ে রাখা হয়েছিল। হ্যাঁ, গল্পেরও প্রমাণ রাখতে হয় যদি সেই গল্পটাকে ইতিহাস বলে চালানোর দরকার পড়ে। প্রসঙ্গত, ভারতের নামী রাজনীতিকদের নামে লিখে রাখা বইগুলোর তা সে এম. কে গান্ধীর হোক বা জে. এল নেহেরুর হোক—বি. বি. প্যাটেলের কিংবা এস. সি বসুদের নামে লেখা বইগুলোর কোনও টাই তাঁদের কারুরই লেখা নয়। লেখা যে অন্য কারুর তা বুঝতে কষ্ট হয়না। আসলে নেতাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল বানানোর তাগিদে ব্রিটিশ সরকার নেপথ্যে থাকা ভাড়াটে লেখকদের দিয়ে অনেক কিছুই লিখিয়ে রাখতেন। আর সেগুলোকে নেতাদের 'রচিত' বলে চালাতেন। ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাবে। আপাততঃ তথাকথিত An Indian Pilgrim নামক বইটি সম্পর্কে দু-একটা তথ্য দেওয়া যাক। বইটির নামপত্রে দু-দুখানা নাম রাখা হয়েছে।

An Indian Pilgrim

or

Autobiography of Subhash Chandra

1920-1934

চৌদ্দ বছরের জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ে কেউ আত্মজীবনী লেখেনা। আর এমন কিছু ঘটনাবহুল জীবনও ভদ্রলোককে কাটাতে হয়নি যার বৈচিত্র্য বোঝানোর দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে ভুলে ভরা ইংরিজিতে বইটি না লিখলেই তাঁর চলছিল না। আর একটা কথা। বইটা যদি

লেখা হয়েই থাকে তবে তা প্রকাশ করতে বছর পঁচিশ দেরি হওয়ার কারণটাই-বা কি? তবে কি বিভ্রান্তিকর কিছু তথ্য সরবরাহ করার জন্যই বইটা লেখানো হয়েছিল? তাইত আসছে। বাড়ী থেকে পালিয়ে হরিদ্বার-বৃন্দাবন ঘুরে আসার সুবাদে কেউ **Indian Pilgrim** হয়ে যায়না।

পত্রিকা-প্রসঙ্গে ফেরা যাক। পত্রিকা ওই গল্প লিখেই ক্ষান্ত হয়নি। সুভাষচন্দ্রকে জাতে তুলতে তাঁরা মিথ্যার জালে রবীন্দ্রনাথকেও জড়িয়ে নিয়েছেন। কবিগুরু নাকি ১৯৩৯ সালের মে মাসের কোনও একদিন শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্রকে 'প্রত্যক্ষ-বরণ' করে একটি বক্তৃতা দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। বক্তৃতার বয়ানটাও তিনি আগেই লিখে রেখেছিলেন। তবে গান্ধীপন্থীরা আপত্তি জানাতে পারেন এই আশঙ্কায় বক্তৃতাটা পরে তিনি দেননি। অন্ততঃ প্রচারটা সেইরকমই রাখা হয়েছে। মূল্যবান বক্তৃতার বাণী-টা অংশতঃ রাখছি।

"…বাঙ্গালী কবি আমি…গীতায় বলেছে…বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙ্গালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে 'বাণীদূত' পাঠিয়েছিলাম। তার 'বহু বৎসর পরে' 'আর এক অবকাশে' বাংলাদেশের 'অধিনেতা'কে 'প্রত্যক্ষবরণ' করছি। 'দেহে-মনে' তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, 'শক্তিও অবসন্ন'। আজ আমার 'শেষ কর্তব্যরূপে' বাংলা দেশের 'ইচ্ছাকে' কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণশক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের 'সার্থক মুক্তি' 'অগ্রসর হয়ে আসছে' তোমার 'চরম পুরস্কার' বহন করে। …"

বক্তৃতা সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখলেন:

"সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা এই অপ্রকাশিত ভাষণ ১৯৩৯ সালের মে মাসে লিখিত ও মুদ্রিত হয় কিন্তু উহা

প্রচার করা হয় নাই।"—আনন্দবাজার পত্রিকা ( উৎস : সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। )

বুঝতে কষ্ট হয়না একটি জলজ্যান্ত মিথ্যার সাকরেদ হিসাবে পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কি মহান ভূমিকাই না ছিল। না হলে একটা জাল লেখাকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে চালাতে পত্রিকার এত উৎসাহ এল কেন? "মুদ্রিত হয় কিন্তু তখন উহা প্রচার করা হয় নাই"—এই আজগুবি কথাটা কেন লেখা হল? বক্তৃতাটা সাতবছর লুকিয়ে রাখার দরকার-ই-বা পড়ল কেন? আর তা সাত বছর পরে জানানোর দায়িত্বই-বা সন্দেহজনক চরিত্রের এক ভদ্রলোক নিলেন কেন? ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। ৪৬ সালে 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' আপাতদৃষ্টিতে এই ভূতুড়ে নামের বইটা ( আসলে বইটার নামের যথার্থ ব্যঞ্জনাটা কেউ বুঝতে পারেননি—আর সেইটাই রক্ষার ) প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক হিসাবে সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের নাম থাকলেও পুরোটা যে তাঁর লেখা নয় তা বুঝতে কষ্ট হয়না। 'সুভাষচন্দ্র'-অংশটা এক পদের ছিল ত' 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' অংশটা ছিল বিপদের। ডাহা কাঁচা—মেয়েলি। দু-নম্বরী লেখকের ক্ষেত্রেই এই রকমটা হয়। আর একটা কথা। ওটা যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তারও ত কোনও প্রমাণ পাচ্ছিনা। ভাষণটির পাণ্ডু-লিপিটা বেহদিশ হয়ে গেল কিভাবে? তবে কি লেখাটা জাল বলেই তার পাণ্ডুলিপি ছিলনা? তবে কি ওই লেখাটা ১৯৩৯ সালে প্রকাশ করার ব্যাপারে কোনও অসুবিধা দেখা দিয়েছিল? দেখা দিয়েছিল বৈকি। '৩৯ সালে ওটা প্রকাশ হয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথ যে আঁতকে উঠতেন। তাঁর না বলা বাণীর 'বাণীদূত'-নামের ভূতটাকে দেখে যে তাঁর চমকে যাওয়ারই কথা। বক্তৃতার নামে ভূতুড়ে ওই লেখাটা যে রবীন্দ্রনাথের লেখার ক্যারিকেচার তা অপ্রকাশ থাকত না। আসলে নেপথ্যে থাকা ভাড়াটে লেখক লেখাটাতে রাবীন্দ্রিক ঢঙ্ আনার চেষ্টা করলেও সার্থক হননি। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। ভাষা নকল করতেও জানতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে নকল করতে যতটা বিদ্যেবুদ্ধি

বা এলেম থাকার দরকার ততটা ওই নেপথ্যশিল্পীর ছিলনা। আর তাই তাঁর 'শক্তিও অবসন্ন' হয়ে পড়েছিল। 'ইচ্ছাকে পূর্ণশক্তিতে প্রবুদ্ধ' করাটাও ঠিক রবীন্দ্রোচিত হয়ে ওঠেনি। 'সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে''—নিঃসন্দেহে ভয়াবহ ভাষা এবং ঘটনা কারণ সেটা নিয়ে আসছে সুভাষচন্দ্রের 'চরম পুরস্কার'। তবে কি 'চরম পুরস্কার'-এর খবরটাও লেখক জানতেন? তাইত আসছে। ৩৯ সালের রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা জানার কথা নয়—৪৫ সালের 'ওই রবীন্দ্রনাথ'-এর পক্ষেই তা জানা সম্ভব ছিল। বলে রাখা ভালো জাল লেখাটা পত্রিকা গোষ্ঠীর 'দেশ'-এও ছাপা হয়েছিল। ছাপা হয়েছিল 'কালান্তর'-এর পরবর্তী সংস্করণগুলোতে।

বক্তৃতাটির একটি ইংরিজি অনুবাদও করে রাখা হয়েছে। অনুবাদটা একটু দেখা যাক ঃ

"... Long ago at a meeting, I addressed my message to the leader of Bengal who was yet to arrive. After the lapse of many years, I am addressing one who has come into full light of recognition. My days have come to an end. I may not join him in the fight that is to come. I can only bless him and take my leave, knowing that he has made his country's burden of sorrow his own, that his final reward is fast coming in his country's freedom."

উৎস ঃ Netaji-Edited
by Shri Ram Sharma, Agra, 1948

ইংরিজি অনুবাদটা মূলানুগ হয়ে ওঠেনি। আর তা হয়ে ওঠেনি বলেই কিনা জানিনা অনুবাদক ভদ্রলোক নিজের নামটি জানাতে সংকোচ বোধ করেছেন। অনুবাদকের নামটা অপ্রকাশ থেকে গেছে। তবে মজার কথা এই তাঁর এই নাম না জানানোর মধ্যে অন্য কোনও রহস্য আছে কিনা তা খোঁজ করতে গিয়ে পাওয়া গেছে সন্দেহজনক

এক সূত্র। জাল লেখাটির তর্জমার ভাষাটা এত চেনা চেনা মনে হচ্ছে কেন? হুবহু রাজনীতিক সুভাষচন্দ্র আর তাঁর নাম জড়ানো নেতাজির লেখা বলে প্রচার করা ইংরিজির মতো কেন সে ভাষা? তবে কি ওই দুজনের নামের আড়ালে যে নেপথ্যলেখক ছিলেন তিনিই ওই তর্জমা করার দায়িত্বটা পেয়েছিলেন? তাইত আসছে।

অন্তর্ধান-এর গল্পের সৃষ্টিকর্তা আনন্দবাজার পত্রিকার দায়দায়িত্ব গল্পটা লিখেই শেষ হয়নি। অপজাতককে বাঁচিয়ে রাখার দায়ও তাকে নিতে হয়েছে। বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে এনে ওই নেতাজির কাহিনীটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পত্রিকার এত আগ্রহ কেন? আশির দশকে 'মহানিষ্ক্রমণ', 'সৈনিকের স্মৃতি', 'নেতাজির সহধর্মিণী'-মার্কা, খোর বড়ি খাড়া-খাড়া বড়ি খোর-মার্কা বিরক্তিকর কত ভূতের গল্প যে ওই গোষ্ঠীর কাগজে ছাপা হয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। 'নেতাজি—এ পিক্‌টোরিয়াল বায়োগ্রাফি'—বইটাকে পত্রিকা-গোষ্ঠীর আনন্দ পাবলিশার্স ছাপলেন কেন? বইটার একশ আট পাতা থেকে শুরু করে পরের অংশটা যে নির্ভেজাল জালিয়াতি। তাহলে? ওই নেতাজির ওপর কোনও বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকার বেস্ট-সেলার কলমে ঠাঁই পেয়ে যায়। তা সে নারায়ণ সান্যাল প্রমুখের পাকা ভাষায় লেখা ন্যাকামিই হোক কিংবা শৈলেন দে প্রমুখের ন্যাকা ভাষায় লেখা পাকামিই হোক। দুনিয়ার একটি উঁচু দরের বিজ্ঞাপন বার হয়েছিল একটি ফল সম্পর্কে। সে ফলের নাম ছিল আপেল। মাকাল ফল সম্পর্কে সেরা বিজ্ঞাপন দেওয়ার কৃতিত্ব ওই পত্রিকার। পত্রিকার সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত সরকারের ইন্টেলিজেন্স দপ্তরের যোগাযোগের সম্পর্কে যে জনশ্রুতি চালু ছিল তা কি নেহাৎ-ই মিথ্যা? না কি উল্টোটাই সত্যি?

## সুভাষচন্দ্র—সুপরিকল্পিত একটি নাটকের বিপ্রলব্ধ বিদূষক একটি চরিত্র

এমন কিছু আহামরি চরিত্রের লোক ছিলেন না ওই সুভাষচন্দ্র। 'ভারতের কংগ্রেসী নেতাদের অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম'-নামক ব্রিটিশ-প্রযোজিত একটি নাটকের অন্য অনেক চরিত্রের মতোই ওই সুভাষ-ও একটি চরিত্র ছিল। তবে জুৎসই চরিত্র তিনি পাননি। ভালো ভালো চরিত্রগুলো বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের জন্য রাখা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমদানি করা একজন অভিনেতাও ছিলেন। কেউ দ্বিতীয় পুরুষের অভিনেতা ছিলেন ত বেশির ভাগই ছিলেন প্রথম পুরুষের। কেউ 'মহাত্মা'—'বাকিরা' ক্ষুদ্রাত্মা। এবং মজার কথা অভিনেতাবিশেষকে 'মহাত্মা' বলতে বাকি সকলেই অজ্ঞান ছিলেন। ব্যাপারটা অনেকটা এজেন্সি আর সাব-এজেন্সির মতোই ছিল। আত্মার কোনও অনুকরণযোগ্য মহত্ত্বের কিংবা মহানুভবতা কিংবা দানশীলতার পরিচয় না দিয়েও যে 'মহাত্মা' হওয়া যায়—এইটাই আশ্চর্যের। কোন্ বাচস্পতির রসিকতায় মাকাল ফল সংস্কৃতে 'মহাকাল' সেজেছিল জানিনা। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে 'মহাত্মা' আখ্যা দিয়েছিলেন। বিনিময়ে গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব' বলে স্বীকার করেছিলেন। আসলে ইনিও এমন কিছু মহাত্মা ছিলেন না—উনিও সত্যি সত্যি কারুর গুরুদেব হননি। রপ্তানি করা রাজনৈতিক অভিনেতাও কয়েকজন ছিলেন। তবে তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল বিদেশে। একই পরিবারের কেউ ডিউটি পেতেন এদেশে—কেউ বিদেশে। এক পক্ষ বিগড়ে গেলে আর এক পক্ষকে জামিন রাখার জন্য কিনা জানিনা—ব্যবস্থাটা এইরকমই হয়েছিল। অবস্থাপন্ন পরিবার থেকেই এঁদের 'রিক্রুট'-করা হত। 'রায়বাহাদুর'-খেতাবধন্য ব্যক্তিদের পরিবার থেকেও তা করা হত। বলে রাখা ভালো খেতাবটা

এমন কিছু সম্মানের ছিলনা। ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক কিংবা আঁতেলি খেলায় যাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়াতেন তাঁরাই পেতেন ওই খেতাব। বঙ্কিমচন্দ্র রায়বাহাদুর হয়েছিলেন। তবে তারজন্য তাঁকেও কম কথা শুনতে হয়নি। কটকের রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু কোন মহান কর্মের সুবাদে খেতাবটা কুড়িয়েছিলেন তা জানার উপায় নেই।

ভারতের রাজনীতিমঞ্চের নামী এবং সর্বজনপ্রশংসিত নেতাদের সকলেই মূর্তিমান চরিত্র ছিলেন। আর যাঁরা নাটকের কুশীলব সাজতে পারেননি তাঁরা পর্দার আড়ালেই থেকে গেছেন। এঁদের অনেকে সর্বস্ব ত্যাগ করে ঝাঁপ দিয়েছেন স্বাধীনতার সত্যিকারের সহিংস ও বিপদ্‌জনক সংগ্রামে। এঁরা জান দিয়েছেন। প্রাণ দিয়েও এঁদের কেউই মহাত্মা হননি। ইতিহাসে এঁরা শুধু নামের সংখ্যা বাড়িয়েছেন। এঁদের কেউই নেতাপদবাচ্য ছিলেন না। এঁরা জেলে ঢুকে গবেষণা করার অভিনয়ের সুযোগ পাননি। এঁদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল বানানোর দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার নেননি। এঁরা জানতেন না কাদের হাতে এই ভারত নামক ভূখণ্ডটাকে তুলে দেওয়ার চক্রান্তে ওই নাটকের মহড়াটা শুরু হয়েছিল ১৯২০ সালের পর থেকে। কাদের স্বার্থ দেখার অছি হিসাবে ওঁদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল তাও এঁরা জানতেন না। জানতেন ওঁরা মানে অভিনেতারা।

ওঁদের চরিত্রগুলোর বৈচিত্র্যও কিছু কম ছিলনা। কেউ নামে পণ্ডিত—প্রচুর লিখেছেন। কেউ প্রচণ্ড পণ্ডিত—প্রায় কিছুই লেখেননি। নামে পণ্ডিত জেলে ঢুকছেন। জেল ত' নয়—রিসার্চ সেণ্টার। মাত্র পাঁচ মাসে ঢাউস সাইজের কেতাব লিখে সহাস্য স্কলার বেরোচ্ছেন। প্রচণ্ড পণ্ডিত মারা যাওয়ার পরে জানা গেল তিনি একখানাই কেতাব লিখেছিলেন। কেউ জীবনে যা কিছু লিখেছেন সবই জেলে বসে—বাইরে কলম নড়েনি। হাতের লেখাও এমনই হিজিবিজি যে প্রেসে অচল। অগত্যা অস্তিত্বহীন পাণ্ডুলিপির

টাইপ করা নকল দেখেই সে বই ছাপা হল। টাইপ করে দিলেন পণ্ডিতের টাইপিস্ট কন্যা। হিজিবিজি পড়ার ক্ষমতা যে কেবল তাঁরই ছিল। এবং এও বিশ্বাস করতে হবে। কেমিস্ট্রি আর বাটনির ছাত্তর জেলে ঢুকেই লিখতে শুরু করে দিলেন দুনিয়ার ইতিহাস। উল্টো কাণ্ডও কিছু হয়েছিল। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালোই বলতে হয় এমন একজন জেলে ঢুকেই লিখতে শুরু করে দিলেন ভুসিমাল। বিদিগিচ্ছিরি ভাষা—ছিরিছাঁদের বালাই নেই। মজার কথা আরও আছে। ভালো মন্দ যাই লেখানো হোক কোনও বই-ই নেতাদের দিয়ে লেখানো হয়নি। তাঁদের লেখা কোনও বইয়েরই পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। প্রথম থেকেই সেসব বেহদিশ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটাকে যে কেউই সন্দেহ করেননি—এইটাই আশ্চর্যের। প্রাচীন কেতাবের পাণ্ডুলিপিরও বহুবচন হত। 'ডিভাইন কমেডি'-র চারচারটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তার একটি আছে বোম্বাইয়ে। এইসব 'পাণ্ডুলিপি'র বাজারদর শুনলে চমকে যেতে হয়। নেতাদের লেখা বইয়ের একখানাও নেই। পাণ্ডুলিপি জিনিষটা বেশ মজার। দু-চারটে থাকলে তার দাম বাড়ে। না থাকলে বইটার দাম বেড়ে যায়। এক নেতার লেখা বই রাশিয়ায় মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হয়েছে। বলা বাহুল্য বইটার পাণ্ডুলিপি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মিথ্যার কদর করতেও জানতে হয়।

চরিত্র আরও ছিল। নাটের গুরু সত্য বই কিছুই জানতেন না। ধর্ম, রাজনীতি এবং 'সত্য'-নামক উদ্ভট একটি তত্ত্বের ককটেল বানিয়ে ফেরি করে বেড়াতেন। সত্যকে ভগবান ঠাউরেছিলেন। গল্পের যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এই যুধিষ্ঠিরের কিছু মিলও ছিল। পাণ্ডুর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও কুন্তির ওই সন্তানটি 'পাণ্ডব' সেজে বসেছিলেন ব্যাসদেবের রসিকতায়। গান্ধীজি 'জাতির পিতা' সেজে বসেছিলেন—ইন্টেলিজেন্স দপ্তরেরই বানানো অন্য একটি চরিত্রের ভূতুড়ে ইংরিজিতে বলা রেডিও বক্তৃতার কল্যাণে। ওঁদেরই বানানো নাটকের ওই নায়ক চরিত্রের ওপরে জাতীয় পিতৃত্ব আরোপ করার

অর্থহীন রসিকতা ওই দপ্তরেরই কেউ করে থাকবেন।

( সে বক্তৃতার বিবরণ পরে রাখা যাবে। )

মজার মজার চরিত্র আরও বেশ কিছু ছিল। কেউ ছিলেন আধুনিক কৌটিল্য। কেউ অভিনব চাণক্য। মহিলাচরিত্রও বেশ কয়েকটি ছিল। কবিরাজনীতিক—উকিলগিন্নী—এক একটি চরিত্র স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। কেউ আমেরিকা ঘুরে বেড়াচ্ছেন সৎ-মাসীর কাছে সৎ-মায়ের গল্প শোনাতে। ভারতের স্বাধীনতার দাবীর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে। কে যে টাকা যোগাচ্ছেন কে জানে! তবে ভদ্রমহিলাকে পাসপোর্ট দিয়েছিলেন ওই ব্রিটিশ সরকারই। এবং দিয়েছিলেন উদ্দেশ্যটা জেনেই। কেউ বিরোধী ভূমিকায় নেমে কীসব করে বেড়াচ্ছেন। আন্দোলন না বিপ্লব—কীসব নাম। কেউ অস্ট্রিয়া যাচ্ছেন যক্ষার চিকিৎসা করতে। সে চিকিৎসায় নাকি বিশ্রাম নেওয়ার কোনও দরকার পড়েনি। অফুরন্ত ফুরসতে কন্টিনেন্টাল টুর করে বেড়াচ্ছেন ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে। সে ভদ্রলোক নিজেই লিখেছেন—"উনিশ শ' তেত্রিশ থেকে উনিশ শ' ছত্রিশ সালের মধ্যে এই লেখক রাশিয়া ছাড়া প্রায় গোটা ইউরোপেই ঘুরেছেন এবং ভার্সাই চুক্তির পর ইউরোপের অবস্থা সরেজমিনে দেখেছেন।" বিচিত্রতম চরিত্রের এই ভদ্রলোকটির নামটাই বলা হয়নি। ইনি হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। মাতব্বরের মতো সারা ইউরোপ চষে বেড়াতে বেড়াতে সুইজারল্যাণ্ডে রোম্যাঁ রলাঁর সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করে বসেছিলেন। সাক্ষাৎ করেছিলেন ডি ভ্যালেরার সঙ্গে—মুসোলিনির সঙ্গে—ইউরোপের প্রায় তাবৎ রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের সঙ্গে। গল্পের গরু গাছে ওঠে। গল্পের সুভাষ ভিয়েনার হাসপাতালে শুয়ে শুয়েই ইউরোপ-পরিক্রমা করেছিলেন।

ধুরন্ধর ব্রিটিশ সরকার যে কত চরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। কেউ রক্ষণশীল ত কেউ উদারনৈতিক। কেউ গণতন্ত্রী—কেউবা সমাজতন্ত্রী—কেউ নাকি মার্ক্সবাদী ব্র্যাকেটে

গণতন্ত্রী অর্থাৎ মূর্তিমান সোনার পাথরবাটি। কেউ অহিংসাবাদী—কেউ নাকি সহিংসপন্থায় বিশ্বাসী। নানান তরফের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়ার অভিনয় হত। আবার মানিয়ে বুনিয়ে নেওয়ার দৃশ্যও থাকত। এঁরা নিজে থেকে কেউই কিছু করতেন না। করানো হত। বলানো হত। নেতাদের সকলেরই দু-একখানা সেক্রেটারি থাকতেন। নেপথ্যে তাঁরাই নেতাদের বক্তব্য ঠিক করে রাখতেন। চরিত্র অনুযায়ী সংলাপের ব্যবস্থা হত। কেউ পেতেন মহাদেব দেশাই-য়ের মতো এলেমদার সেক্রেটারি—কেউ পেতেন নীরদসি চৌধুরী-মার্কা সবজান্তা টিকটিকি। কি করতে হবে—কি বলতে হবে—কোথায় থামতে হবে—পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি কি নেওয়া হবে—সব কিছুরই ব্যবস্থা করতেন নেপথ্যে থাকা ওই সেক্রেটারিবাহিনী।

সেক্রেটারি 'রাখা'র ব্যাপারটা বেশ মজার। কে যে কাকে রাখতেন সেইটাই ঠিক বোঝা যেতনা। আসলে চরিত্র-অনুযায়ী সেক্রেটারিদের 'ফিট' করা হত—এই কথাটাই সত্যের কিছু কাছাকাছি। রাজনীতির নেতা, ধর্মের সন্ন্যাসী এবং জনমান্য ব্যক্তিদের অনেকেরই দু-একজন সেক্রেটারি থাকতেন। কেউ এদেশী—কেউ খোদ ইংল্যাণ্ডথেকে আমদানি করা—কেউবা আয়ারল্যাণ্ডের। এঁদের কেউ নেতার আইডিয়লজির প্রেমে পড়ে দৌড়ে আসতেন রোমাঁ্যা রলাঁ নামক বুড়ি ছুঁয়ে—কেউ-বা ধর্মীয় তত্ত্বের মোহে। এঁদের মাইনেপত্র কে যোগাতেন তা জানার উপায় থাকত না। তবে অসৎ লোকেরা বলতেন সেসবই ওই ব্রিটিশ সরকারই জোগাতেন। না জুগিয়ে উপায় ছিল না। সর্ত অনুযায়ী রাজনীতির নেতাদের চাকরীবাকরী করার স্বাধীনতা ছিলনা। টাকাটা আসবে কোত্থেকে? আর সাহেব পোষার খরচ? সে ত' প্রায় হাতি পোষার মতোই দাঁড়াত। তবুও সবই চলত। লোকে সন্দেহ করতনা। আর গেরুয়াবিলাসী ইংরিজি-মাধ্যম সাধুসন্ন্যাসীদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। এঁদের মহিমা অসামান্য। রাজনীতির নেতাদের থেকে কোনও অংশে কম নয়। এঁরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দু-চারটে

বাড়ী ঘোরার অভিনয় সেরে রাজারাজড়ার কাছেই কৃপা কুড়োতেন বেশি। কখনও গদ্‌গদচিত্তে বলে বসতেন অমুক রাজার মতো মানুষ দুনিয়ায় দেখিনি—তমুক রাজার মতো সহৃদয় ব্যক্তি ভূভারতে বিরল। ওঁরা যে ব্রিটিশ সরকারের সেবাদাস ছিলেন তা কিন্তু এঁরা জানতেও দেননি—বুঝতেও দেননি। আসলে এঁরা যে কখন কি সুরে কথা বলতেন তা বোঝা দায় হয়ে উঠত। কখনও আমেরিকাকে বিশ্বশান্তির বড়দা বানিয়ে হাততালি কুড়োতেন। কখনও-বা ব্রিটিশরা ভারতকে কি দেয়নি তার হিসাব মেলাতে হিমসিম খেয়ে যেতেন। রেল, রাস্তাঘাট কত কীই যে করে দিয়েছেন সদাশয় ওই ব্রিটিশ সরকার আর সবচেয়ে বড় কাজ ওই সংস্কৃত ভাষাটার আবিষ্কার ওঁরা না করলে আমরা যে কোথায় পড়ে থাকতাম—তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। ভাগ্যিস জোন্‌স্‌ কোলব্রুকেরা এদেশে এসেছিলেন।

সেক্রেটারিরাও কম ধুরন্ধর ছিলেন না। কেউ নেতার আত্ম-জীবনী লিখে দিয়েছেন। সে বইয়ের কিছু অংশ যে ওই নেতার সেক্রেটারিরই লেখা তা-ও জানানো হয়েছে সেই বইয়ের ভূমিকায়। জানানোর কারণ ছিল। যে ভদ্রলোকের নামে বইটি লেখানো হয়েছিল তাঁকে সদাসত্যবাদী বলে জানানোর ইচ্ছাটাও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। অংশতঃ সেক্রেটারির লেখা বলে চালানোর দুটি কারণ ছিল।

এক, স্বীকৃতিটাকে ভদ্রলোকের সততা হিসাবে লোকে মনে করে নেবে। দুই, বাকি বড় অংশ যে তাঁরই লেখা—এ সম্পর্কে কেউই সন্দেহ করবেন না। সন্দেহ কেউ করেনও নি। আসলে মো. ক. গান্ধীর তথাকথিত আত্মজীবনীর পুরোটাই মহাদেব দেশাইয়েরই লেখা। পুরো বইটার ভাষার মান বেশ উঁচুই ছিল। দুজনের লেখা হলে তা হওয়ার কথা নয়। গান্ধীজি নিজে মহাদেব দেশাই-য়ের মৃত্যুদিন উদ্‌যাপন করতেন যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন। কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব তাঁর কোনও দিনই হয়নি।

সেক্রেটারিদের মধ্যে কেউ কেউ নেতার সাক্ষর-যুক্ত চিঠির বয়ান বা নেতার নামে চালানো বইও লিখে দিয়েছেন যার পাতায় পাতায় ওই সেক্রেটারির ভাষাগত মুদ্রাদোষ অপ্রকাশ থাকেনি। ভাষার মজাই ওই রকম। যিনি যেমন ভাষায় লেখেন তিনি তেমনি ভাষাতেই লিখতে থাকবেন—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? মজার কথা হল সে ভাষায় লেখকের দুর্বলতা বা সবলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কারুর কয়েকটি শব্দের ওপর কেন জানিনা দুর্বলতা থেকেই যায়। বারবার ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কেউ একটি শব্দ ভুল অর্থেই বারবার ব্যবহার করে চলেছেন। কেউ বাইবেল শব্দের চেয়ে ওল্ড বা নিউ টেস্টামেণ্ট-এর আভিজাত্য বেশি বলে মনে করে বসছেন। কেউ-বা psychological moment-টাকে ভালো ইংরিজি ভেবে নিজের লেখা বইয়ে যেমন রাখছেন তেমনি অন্যের নামে লেখা আসলে নিজেরই লেখা বইয়েও রেখে বসছেন। কেউ কিছু লিখতে গেলেই দু-চারটে ফরাসী, জার্মান বা ল্যাটিন শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে এবং তার মানেটা না জানিয়ে পাণ্ডিত্য ফলানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। লোকে পড়ে বুঝুক কতই-না পণ্ডিত ওই ভদ্রলোক। এই রকম সব ব্যাপার। আর ব্যাপার স্যাপার দেখে বুঝে নিতেও কষ্ট হয়না পাণ্ডিত্য ফলানোর ওই শিল্পীটি কে?

ভারতের সদ্বিতীয় আঁতেল (দ্বিতীয় নাম সম্পর্কে গোলমাল থাকলেও প্রথম নামটি একান্তভাবেই এই ভদ্রলোকের) হিসাবেই এঁর পরিচিতি। ইনি হচ্ছেন স্বনামধন্য নীরদসি চৌধুরী। রাজনীতিক সুভাষচন্দ্রের (এবং একই সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুরও) সেক্রেটারি হিসাবেই এঁর নেপথ্য কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল। তিনি বসুভাইদের অধীনে চাকরী করতেন না। করতেন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে। আর ওই সরকারের নির্দেশেই তাঁকে কাজ করতে হত। না করে উপায় ছিলনা। কেউ তাঁকে চেনেননি সেটা তাঁর দোষ নয়।

আসলে রাজনীতি-নামক বিপদ্‌জনক নাটকের যে চরিত্রে

সুভাষচন্দ্র অভিনয় করেছিলেন সেই ভূমিকায় আর কাউকেই পাওয়া যায়নি। প্রচণ্ড বোকা না হলে কেউ ওই চরিত্রে নামেনা। নামার কথা নয়। আর সেই বোকামির খেসারতই দিতে হয়েছিল ওই সুভাষকে। আত্মসম্মানবোধ থাকলে কেউ বছরের পর বছর ওই ধরনের অবমাননাকর ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে পারেনা। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। ব্রিটিশ সরকারের ইন্টেলিজেন্স দপ্তর যে প্রথম থেকেই তাঁকে নিয়ে একটা খেলা শুরু করেছিলেন তা অন্যের বুঝতে অসুবিধা হলেও তাঁর নিজের না বোঝার কথা ছিলনা। খেলাটা কি ? তিনি থাকবেন সামনে কিন্তু নিজের কথা কিছুই বলতে পারবেন না। অন্যের বানানো বক্তব্য তাঁকে বলতে হবে। তাঁর নামে চিঠিপত্র লেখা হবে কিন্তু তার বয়ান লিখে দেবেন 'অন্য একজন'। তার ওপর কলম চালানো যাবেনা। কতদূর এগুনো যাবে—কোথায় পিছিয়ে আসতে হবে—সবকিছু ঠিক করে দেবেন 'অন্য একজন'। ভুল ভাল বাঙলা বা ইংরিজি—উল্টোপাল্টা ভুল তথ্য তাঁর নামে লিখলেও তার প্রতিবাদ করা যাবেনা—সবকিছুই নিজের লেখা বলে মেনে নিতে হবে—এইরকম দমবন্ধকরা অবস্থায় একজন মানুষ কতদিন থাকতে পারে ? একদিনও নয়। তবু তিনি ছিলেন কেন ? কেন তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি ? তবে কি তাঁকে মন্ত্রগুপ্তির জালে জড়িয়ে রাখা হয়েছিল ? নাকি দপ্তরটি থেকে তাঁকে নেতা বানিয়ে দেওয়ার ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছিল এবং তিনি তা অম্লানবদনে খেয়ে যাচ্ছিলেন ? তথ্যদৃষ্টে বুঝতে কষ্ট হয়না দুটো অনুমানই সঠিক। তিনি বহুবার জেলে ঢুকেছেন বেরিয়েছেন। বেরিয়ে এসে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে আবার জেলে ঢুকেছেন। বেরিয়ে এসেও কোনওদিনই কাউকে তিনি জানাননি জেল থেকে লেখা তাঁর চিঠিগুলো অন্য কেউ লিখে দিয়েছেন—তিনি নিজে লেখেননি। The Indian Struggle 1920-1934 নামের ভূতুড়ে বইটা যে তাঁর লেখা নয়—অন্য কারুর—তাও তিনি জানাননি কেন ? ভাঁওতা যে তিনি সত্যিই খেয়েছিলেন এইটাই তার প্রমাণ। অন্য সব নেতার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল

বানানোর স্বার্থে বইপত্র লেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামে যেসব ছাই ভস্ম লেখা হচ্ছিল তার সবটাই যে তাকে হাস্যাস্পদ বানানোর তাগিদে লেখানো হচ্ছিল—এই সোজা কথাটা তিনি বোঝেননি কেন? আসলে নেপথ্য নাট্যকারের রসিকতায় অন্য চরিত্রগুলোকে রাজনীতির পাকা খেলোয়াড় আর তাঁকে অপোগণ্ড বিদূষক একটি চরিত্র হিসাবেই রাখা হয়েছিল। তিনি ওই ভূমিকা পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেস সভাপতি সেজে অভিনয় সেরে আবার তিনি জেলে ঢুকেছেন। কংগ্রেসের ক্যাপটিভ প্রেসিডেণ্ট-এর ভূমিকায় উৎরে গিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে যে একটা রসিকতা করা হচ্ছিল এইটাই তিনি বোঝেননি। 'মহাত্মা'ও খারাপ অভিনয় করেননি। ওই সুভাষের ওপর গোঁসা করার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় কৃতিত্ব রেখে গেছেন ওই ভদ্রলোকও। পুতুল নাচের ইতিকথাটা যে কি করে ইতিহাস সেজে বসল সেইটাই আশ্চর্যের। বুঝতে কষ্ট হয়না আধুনিক রাজনীতির ইতিহাসের অনেকটাই ওই ইণ্টেলিজেন্স দপ্তরের বানানো গল্প দিয়েই ভরানো হয়।

## তিন সুভাষের বিচিত্র কাহিনী

বুদ্ধ যে মাত্র নজন ছিলেন একথা ইতিহাসে আছে। পালি ভাষায় নজন বুদ্ধের জীবনীও লেখা হয়েছে। এক ডজন থাকলেই বা কে বলতে যাচ্ছে? সে কালে যে ওই ধরণের কারবারই আখছার ঘটত। আধুনিক কালেও যে ওই কাণ্ড হয়নি তা নয়। সুভাষচন্দ্র বসুর কথাই ধরা যাক। ইনি মাত্র তিনজন ছিলেন।

প্রথমে আসছে এক নম্বর সুভাষের কথা। তাঁর শৈশব, বাল্যকাল ও ছাত্রাবস্থার কিছুটা কেটেছে কটকে—বাকি অংশ কলকাতায়। ১৯১৩ সাল থেকে কলকাতার এলগিন রোডের বাসিন্দা। লেখাপড়ায় খারাপ নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন অনার্সে দ্বিতীয়—পরে আই, সি, এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান

পেয়েছিলেন। শেষ পরীক্ষায় ইংরিজিতে দ্বিতীয় স্থানটা তিনিই দখল করেছিলেন। ইংরিজিতে মোটামুটি ভালো দখল না থাকলে ওই পরীক্ষায় ভালো ফলের আশা করাটা যে দুরাশা হয়ে পড়ত একথা বলে রাখা ভালো। বাঙলা-টাও খুব একটা খারাপ জানতেন এমন কথাও শোনা যায়নি। তবে কৃতিত্ব বলতে এইটুকুই তিনি দেখিয়েছিলেন। আর কিছুই নয়। আর ওই কৃতিত্বের সুবাদে যে ইতিহাসে ঠাঁই পাওয়ার যোগ্যতা আসেনা—তাও বলতেই হয়। তা যদি আসতই তবে সিভিল লিস্টটা ইতিহাসের পঞ্চম পত্র হয়ে উঠত। ওঠেনি এইটাই রক্ষার।

'দ্বিতীয় সুভাষ' হচ্ছেন অভিনেতা সুভাষ। আই, সি, এস করেও চাকরী না নিয়ে ইনি রাজনীতির মঞ্চে ঢুকেছেন। মাঝে মাঝে জেলে ঢুকছেন। জেল থেকে এঁকে ওঁকে চিঠিপত্র পাঠাচ্ছেন। সেসব চিঠির মধ্যে এক নম্বরী সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যায়না। পাওয়া যায় দু-নম্বরী সুভাষচন্দ্রকে। ইংরিজিটা ভুলে গিয়েছিলেন—বাঙলা-টাও শিখে উঠতে পারেননি 'এই সুভাষচন্দ্র'। আর ওই বিদ্যা নিয়ে ইনি লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। এন্তার লিখছেন। মাঝে মাঝে ইংরিজি রচনা লিখে হাত মক্স করছেন আর সেইসব রচনা ইংরিজি অমৃত বাজার পত্রিকায় সাড়ম্বরে ছাপানো হচ্ছে। কিছু রচনা ইংরিজি 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাতেও ঠাঁই পাচ্ছে। পত্রিকাটিকেও বলিহারি। উঁচু দরের প্রবন্ধই ওই পত্রিকায় থাকত। 'এই সুভাষ'-এর লেখা ছাইপাঁশগুলো যে কেন প্রথম শ্রেণীর ওই পত্রিকায় রাখার আয়োজন হত সেইটাই রহস্য। কখনও নিজের নামে—কখনও-বা আর এক ভদ্রলোকের অননুকরণীয় নামের কায়দায় নিজের নাম লিখছেন সুভাষসি বোস। চিকিৎসা করতে অস্ট্রিয়া যাচ্ছেন যাওয়ার পথে 'কাগজের রিপোর্টার'-এর ভূমিকায় অত্যন্ত কাঁচা অভিনয় করে যাচ্ছেন। ভুল ভাল ইংরিজিতে ছাইভস্ম লিখে পাঠাচ্ছেন। একই লেখা অমৃতবাজার পত্রিকায় এক কায়দায় ছাপা হচ্ছে আবার মডার্ন রিভিউ-য়ে সেই লেখাই একটু

ঘসে মেজে ছাপানো হচ্ছে। এই রকম সব ব্যাপার। 'এই সুভাষ' ১৯৩৫ সালের ১৩ই জানুয়ারী অস্ট্রিয়া যাওয়ার পথে এডেনে নেমেছিলেন। ওখান থেকে এডেন সম্পর্কে লেখা একটি রচনা অমৃত-বাজার পত্রিকায় পাঠালেন। অংশতঃ রাখছি।

I have an 'interesting time' at Aden, Some Indian residents came on board and invited me to come to the shore and accept their hospitality. The business is mostly in the hands of Indians, the majority of whom hail from Kathiawar.…

Textile goods and other emblems of so called civilization are imported from Europe.

ওই একই লেখা একই লেখক Modern Reviw-তে লিখলেন অন্য কায়দায় –

(The ship) called on Aden on her way to Europe from Bombay,some Indian residents of Aden arrived on board and invited me to accept their hospitality for a few hours—On enquiry, I learnt The Indian settlers were businessmen and majority of whom hailed from Kathiawar.

Aden is a flowishing port and trade centre.

শুধু ভুলভাল ইংরিজিতে কাঁচা রিপোর্ট লিখেই ওই 'দ্বিতীয় সুভাষ' ক্ষান্ত হননি। তাঁকে দিয়ে আধ-ভূতুড়ে অনেক কাণ্ডও করানো হয়েছিল।

ভিয়েনার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ওই 'দ্বিতীয় সুভাষ' সুইজারল্যাণ্ডে রলাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সে সাক্ষাৎকারের বিবরণ তিনি Modern Review-এ প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওই পত্রিকাটিতে তা ছাপা হয়েছিল। সাক্ষাৎকার হল সুভাষ ও রলাঁর। ফটো দেওয়া হল

রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁর। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রবন্ধটিতে একটি কথাও বলা হয়নি। তথ্যদৃষ্টে বুঝতে কষ্ট হয়না ওই সাক্ষাৎকারটি আদৌ ঘটেইনি। ওটা একটা বানানো গল্প।

মজার কথা হল ওই সাক্ষাৎকারটা যে হয়েছিল তা ওই রলাঁর লেখা দুটি চিরকুট-মার্কা চিঠিতে জানানোও হয়েছে। রলাঁ মিথ্যা কথা বলেছিলেন। আসলে ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট হিসাবে তা না বলে তাঁর উপায় ছিল না। আর তা ছিলনা বলেই ব্রিটিশ সরকারের আর এক এজেন্টের হয়ে কাঁচা ওকালতি তিনি করতে গিয়েছিলেন ওই কল্পিত সাক্ষাৎকারে তাঁর নিজের জবানবন্দিতে। মজার কথা আরও আছে। নীরদসীয় ইংরিজিতে লেখা সেই প্রবন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু লেখা হয়েছিল যাতে রলাঁর বক্তব্য সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। রলাঁ সেগুলো শুধরে দিয়ে পত্রিকাটিতে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেটিও ছাপা হয়েছিল ওই পত্রিকায়। সাক্ষাৎকারটাকে প্রামাণ্য বলে চালানোর ওটা একটা কায়দা।

'তৃতীয় সুভাষচন্দ্র' হচ্ছেন ভূতুড়ে নেতাজি। এঁর ব্যক্তিসত্তা ছিলনা। একটা মতলবের তা থাকার কথাই ওঠেনা। ধ্যানমগ্ন সুভাষের 'অন্তর্ধান'-এর গল্পটা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পরে জার্মানীর গোয়েবেল্‌স্‌-দের মাথায় একটি গল্পের প্লট তৈরি হয়। ওই সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ভারত সরকারের ইণ্টেলিজেন্স দপ্তর যে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই একটা খেলা খেলছিলেন তা ওই গোয়েবেল্‌স সাহেব সবই জানতেন।

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে ওই সুভাষ ( অর্থাৎ দ্বিতীয় সুভাষচন্দ্র ) যে ইউরোপের নানান রাষ্ট্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তা যে ওইসব রাষ্ট্রের ইণ্টেলিজেন্স দপ্তরের প্রত্যক্ষ যোগসাজস ছাড়া হতেই পারত না। আসলে ওইসব রাষ্ট্রের ওই দপ্তরের সঙ্গে ভারত সরকারের ওই দপ্তরের নিশ্চয়ই কোন গোপন সমঝোতা হয়েছিল আর তা হয়েছিল বলেই ওই সুভাষের কল্পিত ইউরোপ-পরিক্রমার

গল্পগুলোকে সত্য ঘটনা বলে চালাতে সুবিধা হয়েছিল। সোজা ভাষায় ব্যাপারটা বোঝানো যাক।

ওইসব রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স দপ্তর যদি সত্যটা ফাঁস করে দিত তাহলে ওই সুভাষের চড়কিবাজির মতো ঘুরে বেড়ানোর গল্পটা যে ডাহা মিথ্যে তা প্রকাশ হয়ে পড়ত। কিন্তু তা হয়নি। মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে নানান রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স-স্তরে গোপন সমঝোতা হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো সে মিথ্যা কখনই ফাঁস করতে পারে না। এমনকি সাময়িকভাবে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়লেও তা ফাঁস করার চেষ্টা কোনও রাষ্ট্রই করেনা। করতে পারেনা। এই সুযোগটাই জার্মানীর ইন্টেলিজেন্স দপ্তর লুফে নিয়েছিল। '৪১ সালে জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের হঠাৎ আবির্ভাবের গল্পটা তাঁরা প্রকাশ করলেও ভারত সরকারের ইন্টেলিজেন্স দপ্তর সব কিছু জানা থাকা সত্ত্বেও তা ফাঁস করেনি। করতে পারেনি। কারণ জার্মান সরকারের ওই দপ্তরের সঙ্গে যে গোপন সমঝোতা তাদের হয়েছিল তার সর্ত অনুযায়ী তা করা সম্ভব ছিলনা।

পরবর্তীকালে নেতাজির মতলবটাকে জাপান সরকারও কাজে লাগিয়েছিল এবং ভারত সরকারও সব কিছু জেনেও নেতাজির জাপানে চলে যাওয়ার গল্পটাকেও ফাঁস করতে পারেনি। কেন পারেনি তারও কারণ আছে। রাসবিহারী বসুর জাপানে পালানোর গল্প-টাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে জাপান সরকারের ইন্টেলিজেন্স দপ্তরের সঙ্গে ভারত সরকারের ওই দপ্তরের গোপন সমঝোতা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়না। নেতাজির জাপান-যাত্রার গল্পটা ভারত সরকার যে কেন ফাঁস করেনি তার কারণ বুঝতেও কষ্ট হয়না।

# আসলে যা ঘটেছিল

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান-এর খবরটা লুফে নিয়েছিলেন গোয়েবেল্‌স্ সাহেব। জার্মানীর নাৎসী সরকারের প্রচার বিভাগের অধিকর্তা। সুযোগ হাতছাড়া করার লোক তিনি ছিলেন না। একটা মতলব তৈরি করে নিতে দেরি হয়নি। বেশ সুন্দর একটি গল্পের শুরু হল জার্মান ইন্টেলিজেন্স দপ্তরের বানানো সেই মতলবের মধ্য দিয়ে। গল্পের শেষ অংশটুকু অবশ্য তাঁরা বানাননি। তা বানিয়েছিল জাপান সরকারের ইন্টেলিজেন্স দপ্তর। ওই সুভাষচন্দ্র ভারত থেকে পালিয়ে সশরীরে জার্মানীতে চলে এসেছেন। জার্মান সরকারের সাহায্য নিয়ে ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন আর তার জন্য নিয়মিতভাবে মিলিটারি ট্রেনিং নিতে শুরু করেছেন। গল্পটা ছিল এইরকমই। আর ওই গল্পটাকে খবর হিসাবে প্রচার করলে তা যে নাৎসী-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর অনুকুলে ভারতে জনমত গড়ে তুলতে এবং মিত্রশক্তি শিবিরে বিভ্রান্তি আনতে সাহায্য করবে—এইটাই ওঁরা ভেবে নিয়েছিলেন। আর সেইজন্যই ইউরোপের কয়েকটি দেশের ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে তথাকথিত 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি' (ভুল তর্জমায় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ') বানানোর মতলবের জন্ম হল ওই জার্মানীতে। সেই 'ফৌজ'-এর প্রধান হিসাবে রাখা হল মতলব-মার্কা ওই 'সুভাষচন্দ্র'-কে।

সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে যাননি। মতলবটার নাম কি রাখা যায়? জার্মান 'ফুয়েরার' শব্দের হিন্দী / উর্দু তর্জমা করে বানানো হল 'নেতাজি'কে। জার্মান ভাষায় 'ফুয়েরার' শব্দের অর্থ নেতা আর তারসঙ্গে হিন্দী 'জি'-যোগে ওই 'নেতাজি'। জার্মানীতে তখন 'ফুয়েরার' বলতে হিটলারকেই বোঝাত। জার্মান ইন্টেলিজেন্স-এর রসিকতায় তৈরি হল দু-নম্বরী ফুয়েরার-এর মতলব। ব্যক্তিবিশেষকে

নেতাজি সাজানোর দরকার পড়েনি। 'জেনারেল'-পদমর্যাদার কল্পিত ওই 'নেতাজি'কে প্রোটোকলের বেড়াজালে ঘিরে রাখা হল। 'তাঁর' 'সান্নিধ্যে' কম লোককেই আসতে দেওয়া হত। প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রমুখ যাঁরা 'তাঁর কাছে' এসেছিলেন তাঁরা সংগঠিত মিথ্যার শরিক হয়ে থাকলেন। গল্প এগিয়ে চলল। গল্পের নায়ক হলেন 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র' এই ভুল নামের 'ব্যক্তি'টি। ভুল কারণ ব্যক্তি-নাম কিংবা পদবী নামের শেষে 'জি' যোগ করার পরে নাম বা পদবীবাচক কোনও শব্দই রাখা যায়না। পণ্ডিতজি জওহরলাল হয়না—হয়না বাবুজি গান্ধী-ও। যাঁর কর্মকাণ্ডের সবটাই ভূতুড়ে তাঁর নামটা যে ভূতুড়ে হবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

'নেতাজি'র যুদ্ধবিদ্যায় তালিম নেওয়ার গল্পটা বানানোরও দরকার ছিল। তা না নিলে 'তাঁকে' যে জেনারেল বলে চালানোই যাবেনা। শুরু হল গোয়েবেল্‌সীয় প্রচার অভিযান। বার্লিন বেতার কেন্দ্র থেকে 'সুভাষচন্দ্রে'-র বক্তৃতা প্রচার করা হল। বাদ্যের গুঁতোয় মন্ত্রের অশুদ্ধি ঢাকা পড়ে। প্রচারের ঠেলায় বেতার কেন্দ্রটির বক্তাকে লোকে সুভাষচন্দ্র ভেবে বসল। ওই গোয়েবেল্‌স্ সাহেব যে প্রচারের নামে প্রায়শঃই মিথ্যা কথা বলে বসতেন তা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় ওই জাতের প্রচারচমক দেওয়াটা অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপারও ছিলনা। সে যাই হোক, ওই নেতাজি সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলেছিলেন বা লিখেছিলেন তা কিন্তু সকলেই পরম বিশ্বাসে মেনে নিয়েছিলেন। আর তা মানতে গিয়ে সকলেই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। অন্যদের কথা থাক। স্বয়ং চার্চিল সাহেবও তাঁর প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

---

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপরে লেখা তাঁর বইয়ের প্রথম দিককার সংস্করণে তিনি আই. এন. এ-কে উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যেই রেখেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে ওই চিহ্নের মধ্যে তিনি রাখেননি। অর্থাৎ আই. এন. এ-র অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেও সুভাষচন্দ্র যে জার্মানীতে তখন ছিলেন—এ-সম্পর্কে কোনও সন্দেহই তিনি প্রকাশ

করেননি। পরে অবশ্য তিনি তাঁর ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন। ভুলটা স্বীকার না করে উল্টো কায়দায় তিনি তা শুধরে নিয়েছিলেন। বইটির পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ওই সুভাষচন্দ্রের নামগন্ধ তিনি রাখেননি। ভুল স্বীকার করে নিলে পুরো গল্পটাই যে ফাঁস হয়ে যেত।

মাউন্ট-ব্যাটেন সাহেব সন্দেহজনকভাবে আততায়ীর গুলিতে মারা গেলেন বেশ কয়েক বছর আগে। খবরে প্রকাশ মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে। তবে কি তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এমন কিছু লিখে বসে-ছিলেন যা ব্রিটিশ সরকারের ইন্টেলিজেন্স দপ্তরের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছিল? তবে কি মন্ত্রগুপ্তির বেড়াজাল টপকে তিনি কিছু ফাঁস করার চেষ্টা করেছিলেন আর সেইজন্যই কি তাঁকে প্রাণ দিতে হল? দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছুই নেই।

সে যাই হোক, গল্পটাই জানানো যাক। জার্মানীতে নকল সুভাষ উৎরে গেল ঠিকই তবে তাকে দিয়ে কাজ বিশেষ এগুলো না। দিল্লী দূর অস্ত। ভারত জয়ের যেটুকু ক্ষীণ আশা ওই জার্মানীর ছিল "১৯৪২ সালে স্তালিনগ্রাদ ও এল. এলামিনের ঘটনার পর সে আশায় ছাই পড়ল" (হিউ টয়-এর লেখা The Springing Tiger-এর বঙ্গানুবাদ)। আর একটা কথা। জার্মানীর অনুকুলে জনমত সৃষ্টির চেষ্টাও ভারতে ব্যর্থ হল। দূরত্বজনিত সমস্যা জার্মানীর যতটা ছিল জাপানের ততটা ছিলনা। সাম্রাজ্য বিস্তার করতে করতে জাপান তখন ভারতের অনেক কাছে এসে গেছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো এবং তাঁর ইন্টেলিজেন্স দপ্তর নেতাজি-মার্কা নকল সুভাষকে পূর্বখণ্ডে (Estern Sector) কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করলেন। নকল সুভাষের মতলবটাই শুধু আনার দরকার ছিল। জার্মানীর অশরীরী নেতাজিকে বয়ে আনার প্রশ্নটাই ছিল অবান্তর। জাপানে অভিনেতার এমন কিছু অভাব ছিলনা। প্রয়োজনবোধে কাউকে নেতাজি সাজালেই চলবে। ব্যবস্থাটা এই

রকমই হয়েছিল। তবে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রকে জার্মানী থেকে না আনলে যে পশ্চিম ও পূর্বখণ্ডের গল্প দুটির যোগ-সূত্র থাকেনা। তাই জার্মান ও জাপানী সাবমেরিনের গল্প বানিয়ে নিতে হয়েছিল। এর পরের গল্পটা নতুন কায়দায় এগুতে থাকল। 'রাসবিহারী বসু' নামক আর এক কল্পিত 'ব্যক্তি'-র সঙ্গে 'নেতাজি'র নামটাকে জুড়ে দিয়ে শুরু হল প্রাচ্য নেতাজির বহুরূপী কর্মকাণ্ড। 'তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার' ছবিতে দেখা গেল এক বেঁটে নেতাজির মূর্তি। সাংহাইয়ে তাঁর আর এক রূপ। আন্দামানের পোর্ট-ব্লেয়ারে যখন তিনি বক্তৃতা করছেন তখন তাঁর সম্পূর্ণ অন্য জাতের মুখ। গল্পের শেষ হল বিমান দুর্ঘটনায় ওই নেতাজির মৃত্যুর গল্পের মধ্য দিয়ে। এছাড়া উপায় ছিল না। যুদ্ধ হল শেষ। অস্তিত্বহীন সুভাষচন্দ্রকে মিত্রপক্ষের কাছে সঁপে দেওয়ার প্রশ্ন উঠবেই। তখন জাপান সরকার কি করবে? ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় থেকেই যাবে। আর সেইজন্যই হাতে আঁকা একটি ছবিকে বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংস-স্তূপ বলে চালিয়ে দিয়ে গল্পটাকে প্রমাণসিদ্ধ বানানোর চেষ্টা হল জাপান সরকারের তরফ থেকে। অন্ততঃ প্রচারটা সেইরকমই রাখা হল। এই হল গল্প। পরবর্তীকালে গল্পের ওই 'মৃত্যু'-টাকে সন্দেহ করে ওই নেতাজির সাইবেরিয়া পালানোর আর এক গল্প বানানো হয়েছিল। ফিনিক্স পাখী পাঁচ শ' বছর বেঁচে থেকে নিজেকে দাহ করে আবার জন্মেছিল। শিখগুরু রামদাস এখনও বেঁচে আছেন। সুভাষচন্দ্র দু-চারশ' বছর বেঁচে থাকবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? মিথকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। অনেক সময় মিথোক্ত ব্যক্তিটিকেও।

## নেতাজির ফটো

নেতাজি সুভাষচন্দ্র নামক বহু-আলোচিত ব্যক্তিটির কর্মকাণ্ডের প্রমাণ হিসাবে খাড়া করা বেশিরভাগ ফটোই এত কাঁচা কেন? কেন ওগুলো নিষ্প্রাণ-নিষ্প্রভ? কেন ওগুলোকে আদ্যিকালে তোলা বলে মনে হয়? বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সালে তোলা ফটো প্রকাশ করা হল ছেচল্লিশ সালে। দু-তিন বছরে কোনও ফটোর ভূতুড়ে হাল হওয়ার কথা নয়। হল কেন? ফটোগুলোর বেশির ভাগই জার্মানী ও জাপান থেকে পাঠানো হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে।

প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে। এক, ফটোগ্রাফি-চর্চার দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা দেশ দুটি থেকে এত কাঁচা ফটোই-বা পাঠানো হল কেন? দুই, তবে কি ওসব ফটো দেশ দুটি থেকে পাঠানোই হয়নি? তিন, তবে কি ওসব ভারতেই বানানো হয়েছিল? কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাচ্ছি না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি প্রশ্ন এসে যাচ্ছে তা হচ্ছে এই: কোনও ফটোগ্রাফারের নাম পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কোনও ফটোর নেগেটিভ কেন পাওয়া যায়নি? তবে কি ওইসব ফটো-গ্রাফারদের সবাইকে তাঁদের নাম জানাতে কেউ বারণ করেছিলেন? তবে কি তাঁদের মন্ত্রগুপ্তির জালে জড়ানো হয়েছিল? আর সেই জন্যই কি তাঁরা নিজেদের নামগুলো গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন?

ওই জালে জড়ানোর ক্ষমতা ব্যক্তি বিশেষের হাতে থাকে না —থাকে শুধু রাষ্ট্রের হাতে। তবে কি ওইসব ফটো বানিয়ে রাখার ব্যাপারে কোনও বিশেষ একটি বা একাধিক রাষ্ট্রের কোনও অভি-সন্ধি কাজ করেছিল? তাই যদি হবে তবে ভারত সরকার তা জানাননি কেন? তবে কি ওই সরকার নিজেই ওই ফটোঘটিত মিথ্যাসৃষ্টির কর্মকাণ্ডের উদ্যোক্তা ছিলেন? প্রশ্নটা এসেই যাচ্ছে তার কারণ শত্রুপক্ষের পাঠানো বলে প্রচার করা ওই ফটোগুলো ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়নি কেন? ফটোগুলোর মধ্যে

কিছু কারসাজি করা হয়েছিল কিনা তা জানার জন্য ওই ডিপার্টমেণ্টের ছাড়পত্র পাওয়াটা যে খুবই জরুরি ছিল। তাহলে সে ছাড়পত্র না পাওয়া সত্ত্বেও ওগুলোকে প্রামাণ্য ফটো বলে প্রচার করার দায়িত্ব ওই ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত সরকার নিয়েছিলেন কেন? তবে কি ওই সরকার সবই জানতেন? আর তা জানতেন বলেই কি নিজেদের তৈরি ওই ফটোগুলোকে ওই ডিপার্টমেণ্টে পাঠাননি? তাইত আসছে। আসলে ভারত সরকারেরই কোনও সংস্থা ফটোঘটিত কারসাজি করতে গিয়েই গোলমাল করে বসেছিলেন। বেশ কয়েকটি ফটোর পশ্চাৎপট হিসাবে তাঁরা ছবি আঁকা পর্দা ব্যবহার করেছিলেন—হাতে আঁকা বেশ কিছু ছবিকে তাঁরা ফটো বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাইতেই তাঁরা ধরা পড়ে গিয়েছেন। মিথ্যা চাপা থাকে না।

আসলে ওই নেতাজির ফটো বলে যা কিছু চালানো হয়েছে তার সবটাই অত্যন্ত কাঁচা কারসাজি। বেশিরভাগই হাতে আঁকা ছবির কিংবা ছবি আঁকা পর্দার ফটো। আগে ছবিগুলো আঁকার ব্যবস্থা কিংবা পশ্চাৎপট হিসাবে পর্দা টাঙানোর আয়োজন হয়েছে। পরে ওই ছবির বা পর্দার সামনে ওই নেতাজির 'ডামি'-কে কিংবা সেই 'ডামি'র হাতে আঁকা ছবি রেখে ফটো তোলা হয়েছে। ফটো তোলার সময় ত্রিমাত্রিকতার ভাব ( effect ) আনার একটা কায়দা হিসাবে ছবির বা পর্দার সামনে এটা সেটা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। যাতে লোকে মনে করে বসে ওগুলো বুঝিবা সত্যিকারের ফটো। শরৎচন্দ্র বসু ওগুলোকে সুভাষচন্দ্রের ফটো বলে সনাক্ত করে নিলেও কিছু এসে যায় না। হয় তিনি সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলেছিলেন আর নয়ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—এইটাই ধরে নিতে হয়।

এছাড়া আর এক ধরনের ফটোও রাখা হয়েছে। এগুলো নিষ্প্রাণও নয়—নিষ্প্রভও নয়। এগুলোকে দেখে আদ্যিকালের ফটো বলে মনে হয়না। কারসাজি বলতে যা বোঝায় তার বিন্দু-মাত্র এগুলোতে নেই। সম্পূর্ণ অন্য জাতের মুখ-ওলা নেতাজির

ওইসব ফটোকে বেপরোয়া জালিয়াতি বলতে হয়। মুখচোখ মিলছে না ত কি হয়েছে। ফটোতে নাকি ওরকম হয়েই থাকে। ওকে নাকি পরিভাষায় photographic distortion বা আলোক-চিত্রীয় বিকৃতি বলে। দুরাত্মার ছলের অভাব হয়না।

জার্মানী থেকে পাঠানো বলে প্রচার করা একটি ফটোতে দেখা গেল এক নেতাজির মাথার চারদিকে টাক—মধ্যিখানে ব্যাকব্রাশ করা কিছু চুল। অ্যালোপেসিয়া রোগের এক বিচিত্র প্রকাশ হিসাবে ওই ধরনের টাকের সৃষ্টি হয়। সুভাষচন্দ্রের ওই জাতের টাক ছিলনা। তবু সেই ফটোটাকে সুভাষচন্দ্রের বলে চালানো হয়েছিল।

'ব্যুরো'-র প্রদর্শনীতে ব্যাঙের ছাতা-মার্কা দুটি ইংরিজি খবরের কাগজ সংরক্ষিত আছে। Nippon Times (২২/১০/৪৩) এবং Syonan Sinbun (অক্টোবর ২৪—সাল দেওয়া হয়নি)। প্রথমোক্ত পত্রিকায় হাতে আঁকা একটা ছবিকে সুভাষচন্দ্র বসু বলে জানানো হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের মুখচোখ সম্পর্কে ক্ষীণতম ধারণাও যে শিল্পীর ছিলনা তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। কারুর ক্যারিকেচার আঁকতে গেলেও সে ধারণা থাকার দরকার হয়ে পড়ে। প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম ঃ

সুভাষচন্দ্রের একটা ফটোও কি জাপানীরা তখনও পর্যন্ত জোগাড় করে উঠতে পারেননি? আর তা পারেননি বলেই কি ওই ছবিটাকে সুভাষচন্দ্রের বলে তাঁরা চালাবার চেষ্টা করেছেন। তাইত আসছে। এই সিদ্ধান্ত থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে। তবে কি সুভাষচন্দ্রের মুখের মোটামুটি আদল আনার চেষ্টা হিসাবে যেসব ছবি এবং 'ফটো' প্রচার করা হয়েছে সেসবই পরবর্তী-কালে মিথ্যার চক্রীরাই বানিয়ে রেখেছিলেন? তাইত মনে হচ্ছে।

বিবাহসূত্রে নেতাজিপ্রেমিক কৃষ্ণা বসুর লেখার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার ইচ্ছা নেই। তাঁর লেখা 'সৈনিকের স্মৃতি'-তে (শারদীয়া দেশ ১৯৭৯) তিনি কয়েকটি ফটো হাজির করেছিলেন। একটি ফটোর

পরিচয় 'ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের প্রথম দলের সঙ্গে নেতাজী'। ফটো-টাতে 'নেতাজি' যে জোড়াতালি দেওয়া কাণ্ড তা বুঝতে কষ্ট হয়না। সারিবদ্ধ সৈনিকের সামনে অফিসারের মুখোমুখি দাঁড়ানোরই রেওয়াজ আছে। একই দিকে মুখ করে দাঁড়ানোটা সন্দেহজনক। তথাকথিত নেতাজির ঝুলন্ত কোটের মধ্য দিয়ে পেছনে দাঁড়ানো সৈনিকের পোষাক উঁকি মারছে কেন? আর একটি ফটোর পরিচিতি ছিল 'আই এন-এর সাঁজোয়া বাহিনী পরিদর্শন করছেন নেতাজি'। নেতাজি যেদিকে যাচ্ছেন—সামনে তিনজন সৈন্য সেইদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? সাঁজোয়া বাহিনীতে মোটর গাড়ীর মতো দেখতে ও-বস্তুটা কি? আসলে ওটা হাতে আঁকা ছবি। শিল্পী সাঁজোয়া গাড়ী দেখেননি। আঁকবেন কি করে? কারসাজি আরও আছে। ত্রিমাত্রিকতার ধারণা এনে দেওয়ার জন্য সামনের দিকে প্লাটফর্ম ও দু-একটা গাছ রাখা হয়েছিল। ওগুলো হাতে আঁকা নয়।

Netaji, A Pictorial Biography-র ১৯৯ পৃষ্ঠায় মিলিটারি ইউনিফর্ম-পরা নেতাজির একটি ফটো ছাপা হয়েছে। ফটোর মুখটির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মুখের কোনও মিল নেই। সুভাষচন্দ্রের পুরু ভুরু ক্ষীণরেখ ভুরুর স্মৃতি হয়ে বসল কবে? তাঁর নাকটা একটু মোটাই ছিল—ফটোটার মুণ্ডুর নাকটা ছিল সরু। মুণ্ডুর চোখ ছিল ট্যারা। কোলে একটা—চোখে আর একটা চশমা। একজনের ধড়ের ওপর আরেক জনের মুণ্ডু আরোপ করতে গিয়েই কি ওই ভুলটা হয়েছিল? মুণ্ডু জোড়ার সময় খেয়াল ছিলনা? গামবুটটা কি ত্রিমাত্রিকতার ধারণা আনার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছিল? তাইত মনে হচ্ছে। গামবুট পরা ওই নেতাজির বেশ কয়েকটি 'ফটো' রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

হিউ টয়ের লেখা 'ব্যাঘ্রকেতন'-এ 'সুভাষচন্দ্রের সিঙ্গাপুরে আগমন—জুন ১৯৪৫' পরিচয় দেওয়া একটি ফটো আছে। এরো-প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে নেতাজি নেমে আসছেন—এই সিকোয়েন্সটাকেই

ফটোতে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে এইটাই মনে হয়। তবে খুঁটিয়ে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না ওটা কোনও প্লেনের ফটোই নয়। ওটা ছু-নম্বরী ফটো। প্লেনটির 'বডি'-তে পাঁচটা ভাঁজ ( fold) দেখা যাচ্ছে। প্লেনের ওই হাল হলে তা বাতিল করতে হয়। আর একটা কথা। প্লেনটির ওপরের দিকের আউট-লাইনটা অস্পষ্ট কেন ? ব্যাকগ্রাউণ্ডে আকাশ দেখা যাচ্ছে না কেন ? ব্যাপারটা কি ? আসলে প্লেনের ছবি আঁকা একটি পর্দার ফটো তুলতে গিয়েই নেপথ্য শিল্পীরা গোলমাল করে বসেছিলেন। সামনে-পেছনে হাওয়া লেগেই পর্দাটিতে ঢেউ খেলে গিয়েছিল। অবাধ্য হাওয়া যে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা নিয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয়না। খেলে যাওয়া 'ঢেউ' গুলোকেই প্লেনটির ভ'াজ বলে মনে হচ্ছে। সিঁড়িটা সত্যিকারের। মিস্টার 'ডামি'-র পায়ে গামবুট কেন ? ও-বস্তু পরে কেউ প্লেনে ওঠেনা। মূর্তিমান কারসাজির আর এক নামই যে নেতাজি। [ নেতাজি, এ পিকটোরিয়াল বায়োগ্রাফি ( NAPB ) 261 পৃষ্ঠায় এই মূল্যবান (?) ফটো (!)-টি দেখানো হয়েছে।

ফটোর নামে এত সব কারসাজি করার দরকারটা পড়ল কেন —এ প্রশ্ন কেউ তোলেননি। আর তা কেউ তোলেননি বলেই মিথ্যাটা বেঁচে আছে। বেঁচে আছে নেতাজি। মরার লক্ষণ নেই !

নেতাজি-পর্বের প্রত্যেকটি ফটোই জাল। এনিয়ে বাড়তি কিছু লিখে পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনা। বাকি ফটো সম্পর্কে চিন্তার দায়িত্ব পাঠকবর্গের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটা বুঝে নিতে কারুরই কষ্ট হবেনা।

## 'নেতাজি ইন অ্যাকশন'

'নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো'-তে 'নেতাজি ইন অ্যাক্শন'-নামের একটি জীবন্ত চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যবস্থা আছে। সুভাষচন্দ্রের ফটো দেখে লোকে যে সন্দেহ করে বসতে পারে এ আশঙ্কা ছিল। আর

তা ছিল বলেই তা কাটিয়ে ওঠার জন্য যে ওই মুভিচিত্রটি বানিয়ে রাখার মতলবটার জন্ম হয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয়না। আসলে স্টুডিও-য় তোলা কিছু মুভিচিত্রের জোড়াতালি দেওয়া একটা গোঁজামিলের নাম ওই 'নেতাজি ইন অ্যাকৃশন'।

ফটোগ্রাফির কারসাজির মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের ভাসা ভাসা আভাস এনে 'বই'-টা যে দর্শকদের বিভ্রান্ত করতে পেরেছে—এটা মেনে নিতেই হয়। মজার কথা হচ্ছে এই : 'বই'-টাতে ছ-রকমের 'নেতাজি'-কে দেখা যায়। প্রথমে দেখা যায় আদি ও অকৃত্রিম সত্যিকারের সুভাষচন্দ্রকে। তাঁর হাঁটাচলার কায়দা—বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গী। থপথপ করে ধীরে সুস্থে হাঁটা—দুলে দুলে বক্তৃতা দেওয়া। থলথলে চেহারা। নরম দৃষ্টি। মোটা নাক। পুরু ভুরু। তারপরে আসতে থাকেন অভিনেতারা।

প্রথমে জার্মানীর এক নম্বরী নেতাজি। গোলগাল চোখ। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। তুলনামূলকভাবে বিকটদর্শন। রঙ কালো। ভুরু পুরু। নেতাজি সেজে ক্যামেরার দিকে সলজ্জ একটা চাউনি দিয়েই ভদ্রলোক উধাও হয়ে যান। পরে আর এঁকে দেখা যায়না। ( NAPB ) 129, 133 ও 137 পৃষ্ঠায় এঁর স্থিরচিত্র দেওয়া হয়েছে।

দু-নম্বরী নেতাজি প্লেন থেকে নেমে আসেন। টিকল নাক, উগ্র দৃষ্টি, পাতলা ভুরু, মাথার পেছনে প্রচুর চুল। ইনি চলন্ত 'প্রোফাইল'। ক্যামেরার দিকে সোজা তাকাতে সম্ভবতঃ বারণ করা হয়েছিল। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। মাজাভাঙা কুঁজো ভঙ্গীতে একটু দ্রুতবেগেই মাতব্বরের মতো চলে যান মিটিং-এ। পৌঁছেই বক্তৃতা শুরু করে দেন। ( NAPB )-র 193 পৃষ্ঠায় bottom left-এ এঁর ফটো রাখা হয়েছে।

এর পরে দেখা যায় তিন নম্বরী 'নেতাজি'-কে। ( NAPB )-র 170 পৃষ্ঠায় এঁর স্থিরচিত্র রাখা হয়েছে। এঁর মঙ্গোলয়েড টাইপের মুখ। আপাতদৃষ্টিতে চিনেম্যান বলেই মনে হয়। কথাবার্তা কিছুই শোনা যায়না। খুবই অল্প সময়ের জন্য এ-ভদ্র-

লোককে দেখানো হয়েছে। জ্বালাময়ী বক্তিমে দেওয়ার মুখভঙ্গীর ( মুখবিকৃতি বললেই ঠিক হয় ) অতি-অভিনয় সন্দেহজনক দ্রুততার সঙ্গে সেরে নেন। পরে আর এঁকে দেখা যায়না। এই ভদ্রলোকও ছিলেন বিকটদর্শন। বলে রাখা ভালো সৌম্য দর্শন বা বিকটদর্শন হওয়াটা দোষেরও নয়—গুণেরও নয়। ওটা কোনও বিচার্য বিষয়ই নয়। আসলে ব্যাপারটা বোঝানোর তাগিদেই অপ্রীতিকর ওইসব বিশেষণগুলো ব্যবহার করতে হচ্ছে।

এর পরে চার নম্বরী নেতাজির 'আবির্ভাব' ঘটে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ ভদ্রলোক বয়সে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে অনেক ছোট নাকটা একটু বেশি মোটা। সুভাষচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেঁটে। হঠাৎ দেখলে এই বামনাবতারটিকে সুভাষচন্দ্র বলেই মনে হয়। তবে খুঁটিয়ে দেখলে গরমিলটাই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। স্থিরচিত্র হিসাবে এঁর পার্শ্বচিত্রই সবচেয়ে বেশি প্রচার করা হয়েছে। 'ডামি'র ভূমিকায় ইনিই ছিলেন নির্ভরযোগ্য। আর সেইজন্যই মুভি-চিত্রটিতে এই 'ডামি'র অভিনয় সবচেয়ে বেশি সময় ধরে দেখানো হয়েছে। অন্য 'ডামি'রা এই সুযোগ পেয়েছেন কয়েক সেকেণ্ড। ( **NAPB**-র 201, 207 ) প্লেন থেকে 'নেতাজি'র নামার দৃশ্যটাও বেশ মজার। প্লেনটাকে উঠতে বা নামতে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি প্লেনটার পাশের আকাশ বা দূরের গাছপালা। সেটের প্লেনে ওসব থাকে না। প্লেনের ছবি আঁকা একটা স্ক্রিন থেকে ওই নেতাজি লাফ দিয়ে নামেন। ধুপ করে একটা আওয়াজ হয়। প্লেন থেকে ওঠানামার সিঁড়িটা তৈরি করতে কিছু গাফি-লতি হয়েছিল কিনা কিংবা সিঁড়িটা আদৌ রাখা হয়েছিল কিনা তাও বোঝা যায় না। তবে আওয়াজটা শুনে মনে হয় ও-বস্তু রাখাই হয়নি। আনাড়ি পরিচালক হলে এই হয়!

পাঁচ নম্বরী নেতাজিকে কায়দা করেই দেখানো হল। এঁর মুখ ক্যামেরামুখোই হয়নি। হিটলারের সঙ্গে কথা বলছেন এই সিকোয়েন্সে তোলা মুভিচিত্রের অংশটিতে এই নেতাজির মুখটাই

দেখা যায়নি। এঁর মাথার পেছনে এমন এক জাতের টাক দেখা যার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের হেয়ার-লাইনের কোনও মিলই নেই। নির্বাক হিটলারের বোকা চাউনি দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়না তিনিও আর এক কাঁচা অভিনেতা। হিটলারের মতো গোঁফ রাখলেই কেউ হিটলার হয়ে যায় না।

এতসব বিশ্লেষণের কারণটা জানানো যাক! বইটাকে জীবন্ত বলে চালিয়েছেন ওই মিথ্যার কারবারী তথাকথিত নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো। জীবন্ত মানে সুভাষচন্দ্র নিজেই ওই ডকুমেন্টারিতে ছিলেন। পার্শ্ব চরিত্রেরাও যে যার নিজের ভূমিকাতেই ছিলেন। সোজা ভাষায় ঘটনা যেমন যেমন ঘটেছিল তারই প্রতিফলন ওই বইটিতে হয়েছিল। অন্তত প্রচারটা সেই রকমই করা হয়েছে। অভিনেতা বলতে যা বোঝায় এঁদের কেউই তা ছিলেন না। প্রশ্ন হল তাই যদি হয় তবে ওই সুভাষচন্দ্রের আধ ডজন রকমের মুখ বইটাতে দেখা যাচ্ছে কেন? আসলে ওটা জীবন্ত চলচ্চিত্রই নয়। ওটা অতি চালাকির চলচ্চিত্র। চোরের মায়ের বড় গলা। 'ব্যুরো' ওটাকে জীবন্ত বলে চালিয়ে মিথ্যার বেসাতি করে যাচ্ছেন।

## সোভিয়েট রাশিয়ার ভূমিকা

ইতিহাসে বলা হয়েছে সুভাষচন্দ্র আফগানিস্তানের পথ দিয়ে মস্কো হয়ে জার্মানী গিয়েছিলেন। ৪১ সালের ২৮শে মার্চ মস্কো থেকে রওনা হয়ে ২রা এপ্রিল তিনি বার্লিন পৌঁছেছিলেন। মজার ব্যাপার হল এই: মস্কো হয়ে সুভাষচন্দ্রের জার্মানী যাওয়ার কথা রাশিয়া সরকার স্বীকারও করেনি—অস্বীকারও করেনি। কেন? লণ্ডন থেকে সুভাষচন্দ্রকে কুইসলিং বলা হল। হ্যারি পলিটের লেখা একটি চিঠি ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারি ম্যাক্স-ওয়েলের হাত ঘুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি পি.

সি· ঘোশীর হাতে এসে পৌঁছল। কার বন্দুক কে বইল। সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধ রাতারাতি 'জনযুদ্ধ' বনে গেল।

তথাকথিত কুইসলিং যে আদৌ রাশিয়ায় যাননি—এ-সত্য জেনে বুঝেও রাশিয়া সরকার তা চেপে গিয়েছিল এ-কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ব্যাপারটা ওই সরকার তখনও পর্যন্ত জানতই না। জানার প্রশ্নই ওঠেনি।

পরবর্তীকালে যুদ্ধশেষে মিথ্যেটা রাষ্ট্র হতে দেখেও তার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি কেন—এই প্রশ্নটার গুরুত্ব কম নয়। তাহলে কি ভারত কিংবা ইউ. কে. খবরটা গোপন রাখতে ওই রাশিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিল? জলজ্যান্ত একটি মিথ্যেকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে ইন্টেলিজেন্স স্তরে কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে গোপন সমঝোতা হলে কোনও তরফই সত্যি কথাটা ফাঁস করতে পারেনা। মিথ্যেটাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হয়। এই রকম কোনও ব্যাপার কি ঘটেছিল? এ-সব প্রশ্ন আসছেই। আসছে আরও এই কারণে যে, মহাযুদ্ধের পরে ওই নেতাজির রাশিয়ায় পাড়ি দেওয়া সম্পর্কে 'নতুন অন্তর্ধান' নামে যে গল্পটা পরবর্তীকালে ৫৯ সালের পরে প্রচার করা শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কেও ওই রাশিয়ার সরকার স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করেনি কেন? 'গ্রেট সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়া'য় সুভাষচন্দ্রের ওপর লেখা একটি নিবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু রাখছি:

Believing that any opponent of England was an ally in the Indian national struggle, Bose sought aid in Germany and Japan. In 1941 he fled to Germany and in 1942 in Japanese occupied Burmah he became the leader of the so called free India Government; ·· Bose perished in an airplane crash.

রাশিয়ার প্রকাশন ব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই ধরে

নেওয়া যায় ওই নেতাজি সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের বক্তব্যটাই এনসাইক্লোপডিয়ায় রাখা হয়েছে। প্রশ্ন এসেই যায়।

এক, জলজ্যান্ত ওই মিথ্যাকে সত্যি বলে চালনোর চেষ্টা ওঁরা করতে গেলেন কেন? দুই, 'He fled to Germany' তথ্যটিতে 'through Moscow'—এই দরকারী কথাটা লেখা হয়নি কেন? তিন, ৪২ সালে নেতাজি বার্মায় গিয়েছিলেন—এই ভুল খবরটা কেন দেওয়া হল? গল্পের নেতাজির ত ৪৩ সালে সে-দেশে যাওয়ার কথা। চার, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর খবরটাই বা তাঁরা মেনে নিলেন কেন? দুর্ঘটনার হাতে আঁকা ছবির ফটো দেখে? তাহলে? তবেকি মিথ্যেটাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে রাশিয়া সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল? সন্দেহ করার কারণ আছে। কারণ জার্মানীর গোয়েন্দা দপ্তরের (Information section of German Foreign Office) আলেকজাণ্ডার ভের্থ সুভাষচন্দ্রের মস্কো হয়ে বার্লিন যাওয়া সম্পর্কে যা লিখেছেন তা দেখে ওই সন্দেহই আসে। ভের্থ লিখেছেন:

"...About his (Netaji's) journey from Kabul to Berlin, there had already been an understanding between the Soviet government on the one hand and the German and Italian government on the other. About his identity, only a very small circle of people were informed.

Source: Becon Across Asia, published in Jan. 1973

মজার কথা এই সুভাষচন্দ্র বসু নামের কেউ মস্কো হয়ে জার্মানী যাননি। Understanding-টা হল কি করে। যে ভদ্রলোক আদৌ ওই মস্কোতে যাননি তার পরিচয় গোপন করার কথা ওঠেই বা কি করে? ভের্থ-এর বক্তব্য সত্যি হলে রাশিয়ার যোগসাজস

প্রমাণিত হয়। মিথ্যে হলেও তাই। কারণ মিথ্যে ওই বক্তব্যের প্রতিবাদ রাশিয়া সরকার করেনি কেন? আসলে ব্যাপারটা কি? আসলে 'সুভাষচন্দ্র' কোন পথ দিয়ে জার্মানীতে পৌঁছেছিলেন সে-সম্পর্কে গোয়েবেল্‌স্‌ সাহেব কিছুই জানাননি। যুদ্ধের সময় শত্রু-পক্ষের সঙ্গে understanding হওয়ার গল্পটাও আজগুবি। ভারত থেকে পালানো এবং বার্লিনে পৌঁছনোর মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছিল বলে জানানো হয়েছে তার সবটাই বানানো হয়েছে যুদ্ধের শেষে। Missing link-এর গল্পটা ভারত সরকারের ইন্টেলিজেন্স দপ্তরের তৈরি। উত্তমচাঁদের গল্পটা লেখার ব্যবস্থা হয় যুদ্ধের পরে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির ইন্টেলিজেন্স দপ্তরগুলোকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়ার সব ব্যবস্থাই হয় যুদ্ধের পরে। আর একটা কথা। যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া সরকার যদি জেনে যেতেন মস্কো হয়ে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে গেছেন তাহলে নিশ্চয়ই সে সরকার খবরটা প্রকাশ করতেন। গোয়েবেল্‌স্‌ সাহেব অতটা বোকা ছিলেন না যে কল্পিত নেতাজির মস্কো হয়ে আসার গল্পটা তিনি জানিয়ে দেবেন। তা জানালে যে পুরো গল্পটাই ফেঁসে যেত—এটা তিনি জানতেন। আর আর তা জানতেন বলেই হঠাৎ 'আবির্ভাব'-এর গল্পটাই তিনি ফেঁদেছিলেন।

## 'নেতাজি'র বার্লিন বক্তৃতা

নিজেকে সুভাষ বলে পরিচয় দিয়ে এক ভদ্রলোক ১৯৪২ সালে বার্লিন বেতারকেন্দ্র থেকে বাঙলা সাধুভাষায় একটি বক্তৃতা দিয়ে-ছিলেন। সাধুভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার রেওয়াজ কোনদিনই ছিলনা। সুভাষচন্দ্র নিজেও ওই ভাষায় কখনও তা দেননি। বক্তৃতাটা শুরু হয়েছিল 'আমি সুভাষ বলছি' এই কথা দিয়ে। চলতি ভাষায় ওইটুকুই—পরে আসল বক্তৃতাটা আড়ষ্ট মার্কা সাধুভাষায় বলা হয়েছিল। চলতি ভাষার বক্তৃতায় উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গীতে ধরা পড়ে

যাওয়ার ভয় ছিল বলেই ভদ্রলোক যে সাধুভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হয়না। 'আমি সুভাষ বলছি'-মার্কা ভূমিকা বেতারকেন্দ্রে অচল। নিজেকে কেউ ওভাবে খেলো করেনা। ও ভূমিকা টেলিফোনে চলে। তাও কেবল পরিচিত সমবয়সী বা বয়োজ্যেষ্ঠ লোকজনের সঙ্গে কথা বলার সময়। বক্তৃতাটির কিছু অংশ কয়েকটি বইয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। তা দেখে বলতেই হয় ওসব আনাড়ি কোনও লেখকের লেখা। সুভাষচন্দ্র সশরীরে উপস্থিত থাকলে এসব কাণ্ড যে হতনা তা বলতেই হয়। ভাষণটি যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরা ওই সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শোনার জন্য যতটা উৎকর্ণ ছিলেন—সন্দেহ করার জন্য ততটা উদ্‌গ্রীব ছিলেন না।

বক্তৃতাটি শুরু করতে গিয়ে যে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল তা পরবর্তীকালে প্রকাশ করা একটি বইয়ে শোধরানো হয়েছে। বইটিতে বলা হয়েছে বক্তৃতাটা ওইভাবে শুরু হয়নি। হয়েছিল "আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে আমি সুভাষ চন্দ্র বসু বলিতেছি"—এই কথা দিয়ে। তা কি করে হয়? দেশশুদ্ধ লোক যা শুনল তা কি মিথ্যা? তাছাড়া ওইভাবেও ত কেউ বক্তৃতা শুরু করেননা। তাহলে? যে বইটিতে নতুন কথাটা শোনানো হল তার নাম The Indian Struggle 1920-1942. বইটা নাকি সুভাষচন্দ্র বসুরই লেখা। সত্যি কি তাই? তাই যদি হবে তবে অত কাঁচা ভাষায় বইটি তিনি লিখতেই বা গেলেন কেন? তিনি আর যাই হোন মুখ্যু ছিলেন না। আসলে ওটা সুভাষচন্দ্রের লেখা নয়। ওই জাতের ইংরিজি কোনও শিক্ষিত মানুষের হতেই পারে না। ওটা জাল বই। ওটা সাবমেরিনে চেপে জাপানে যাওয়ার সময় সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন বলে জানানো হয়েছে। সাবমেরিনে চেপে কোন সুভাষই জাপান যাননি। বই লেখার প্রশ্নটাও আজগুবি।

## নেতাজির ইংরিজি বক্তৃতা

জার্মানীতে থাকার সময় নেতাজি অনেক বক্তৃতাই দিয়েছিলেন। সে-সবের নমুনা দেখে অবাক হতে হয়। ভদ্রলোকের নাকি প্রচণ্ড

আত্মবিশ্বাস ছিল। অন্ততঃ প্রচারটা সেই রকমই রাখা হয়েছে। না হলে এই রকম ইংরিজি বের হয়!

'The day I can say over the wireless "Friends of India, I have come to Enrope, I have studied the situation and I am convinced that the Axis power will win," there will be 'more belief in my words than in those of anybody else.'

সত্যি ত তাঁর বলা 'বচন'-গুলোর ওপরে 'অধিকতর বিশ্বাস' না হয়ে উপায় আছে? জার্মানীতে কি ইংরিজি জানা লেখকের দুর্ভিক্ষ চলছিল? তবে কি 'দ্বিতীয় সুভাষ'-এর লেখা ইয়ার্কি-মার্কা ইংরিজির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই 'তৃতীয় সুভাষ'-এর সংলাপ বানানোর দায়িত্ব একই লোক নিয়েছিলেন? তবে কি দুজনের অভিন্নতা জাহির করার জন্যই ওই কায়দাটা নেওয়া হয়েছিল? তাইত আসছে।

## 'নেতাজি'-র 'টোকিও বক্তৃতা'

টোকিও বেতারকেন্দ্র থেকেও সুভাষচন্দ্র বাঙলা সাধু ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন বলে জানানো হয়েছে। সে বক্তৃতা রেকর্ড আকারে বিক্রি করার ব্যবস্থাও হয়েছে। আর সেসব বিক্রি করে ওই ব্যুরোর কিছু অর্থাগমের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। ভাষাগত উদ্ভট বেশ কিছু ভুল বক্তৃতায় থেকে গিয়েছিল যা কোনও শিক্ষিত বাঙালীর মুখ থেকে বেরোনোর কথাই নয়। বক্তৃতায় ব্যবহার করা কিছু বাক্যাংশের নমুনা দেওয়া যাক: 'তাহার মারফৎ দিয়া' 'তাহাদিগকে গিয়া বলুন', 'প্রবাসী ভারতবাসী', 'শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশে ছাড়া যত ভারতবাসী আজ ভারতের বাহিরে প্রবাসে আছেন', 'গর্বে গরবিত', 'সঙ্গে সঙ্গে আমার এই প্রতিশ্রুতি কেন রক্ষা করিতেছি না', 'অন্তরীনের অথবা কারাবাসের', 'এবং অতঃপর'। অতঃপর কি কিছু বলার দরকার পড়ে? তবু

বলি ওই কুৎসিৎ বাঙলা সুভাষচন্দ্রের হতেই পারে না। তিনি সশরীরে টোকিও পৌঁছলে অন্ততঃ ওই ভাষায় যে বক্তৃতা দিতেন না তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়।

## নেতাজির আর একটি বেতার বক্তৃতা

কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ওই নেতাজি মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। এ সুযোগ কি ছাড়া যায়? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তিনি গান্ধীজির উদ্দেশে এক বক্তৃতা দিয়ে বসলেন:

It has, oowever pleased providence to restore you to eomparative health so that three hunderd and eighty-eight millions of your countryman may still have the benefit of your guidance and advice.

গান্ধীজিকে 'তুলনামূলক স্বাস্থ্য' ফিরিয়ে দিলেও মিস্টার প্রভিডেন্স কেন যে ওই বক্তাকে 'তুলনামূলক ইংরিজি' লেখার ক্ষমতা দেননি সেইটাই আশ্চর্যের। সুভাষচন্দ্রের ওই ইঞ্জিরি!

## নেতাজির লেখা বাঙলা চিঠিপত্র

'কন্যা' অনিতার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানিয়ে নেতাজি তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসুর নামে একটা চিঠি লিখে রেখেছিলেন। 'পরবর্তীকালে উদ্ধার করা হয়েছিল' বলে প্রচার করা সেই চিঠিটার একটু নমুনা দেওয়া যাক:

"......আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি এবার কিন্তু (অস্পষ্ট) হয়ত পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ 'পথের মাঝে' উপস্থিত হয় তাহা হইলে 'ইহজীবনে' আর কোনও সংবাদ দিতে পারিব না। তাই আজ আমি আমার 'সংবাদ এখানে রাখিয়া যাইতেছি।' যথাসময়ে তোমার কাছে 'পৌঁছিবে'।......"

স্বাক্ষর: সুভাষচন্দ্র বসু
৮/২/১৯৯৩

'পথের মাঝে' পশ্চিম বাংলার কেউ বলেন না। 'পুনরায় বিপদের পথে রওনা' হতে গিয়েও ভদ্রলোক মুশকিলে পড়েছেন। 'তেমন বিপদ' 'উপস্থিত হয়েই গিয়েছে। শিক্ষাদীক্ষার অভাবটাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 'ইহজীবনে' কি রসিকতা? 'এবার কিন্তু' দিয়ে পশ্চিম বাঙলার ভাষার ঢং আনার চেষ্টা করলেও বুঝতে কষ্ট হয়না ও-চিঠি অশিক্ষিত পূর্ববঙ্গীয় কোনও রসিকপুঙ্গব লিখে দিয়েছেন। 'পৌঁছিবে'-টাই-বা কি বস্তু? বাঙলা ক্রিয়াপদের ওই ছিরি ত কোথাও দেখিনি। 'সংবাদ রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা'ও সুভাষচন্দ্রের থাকার কথা নয়। 'যথাসময়ে' কি আর একখানা রসিকতা? সুভাষচন্দ্রের ওই বাঙলা। কি সর্বনাশ! সুভাষ কি পূর্ববঙ্গীয় হয়ে গিয়েছিলেন? 'নেতাজি—এ পিকটোরিয়াল বায়োগ্রাফি'তে চিঠিটার ফটোস্টাট কপি ছাপা হয়েছে। চিঠিটা জাল। জাল চিঠির জালিয়াতি করে চলেছেন আনন্দ পাব্লিসার্স।

## সুভাষচন্দ্রের লেখা ইংরিজি চিঠিপত্র

সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ১৯৪০ সালে কয়েকটি চিঠি যে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেন—একথা জানানো হয়েছে। সেন্সর করা হয়েছিল বলে প্রচার করা চিঠি বইপত্রে ছাপানোও হয়েছে।

ছুটো চিঠির ছুটো অংশ রাখছি:

প্রথম চিঠিটির তারিখ ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪০।

অংশতঃ এই রকম,—

' My first request is that this letter be carefully preserved in the archives of the government, so that it may be available to those of my countrymen who will succeed you in office 'in future'. It contains a message for my countrymen and is therefore my political testament.

দ্বিতীয় চিঠির তারিখ ২ / ৫. ১২. ৪০।

অংশতঃ এই রকম :—

'...I have already in my letter of the 26tn November, that I have but two requests to make of you - firstly, that my letter of the 26th November, which is my 'political testament', be carefully preserved in the archives of the Government and secondly, that I be allowed to approach my end peacefully. Is that asking too mnch 'of you' ?

এই ধরনের ইংরিজির জ্ঞান থাকলে মন্ত্রী হওয়া যায়—আই, সি, এস হওয়া যায়না। ওসব সুভাচন্দ্রের লেখা এটা ভাবতেও কষ্ট হয়। চিঠি দুটির ভাষাটা এত চেনা মনে হচ্ছে কেন? তথাকথিত নেতাজির ব্যবহার করা 'নৈতাজিক' ইংরিজির মানও যে অবিকল ওই রকমেরই ছিল। তবে কি একই লোক ওই দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুভাষের লেখা চিঠিগুলো লিখে দিতেন। তাইত আসছে।

## ইন্টেলিজেন্স স্তরে গোপন সমঝোতার ফলেই মিথ্যাটা বেঁচে আছে

জার্মানী ও জাপান সরকারের তরফ থেকে নেতাজির কিছু ফটো, চিঠিপত্র এবং বেতার বক্তৃতার বয়ান যে ভারতে পাঠানো হয়েছিল এই কথাই ইতিহাসে জানানো হয়েছে।

কয়েকটা প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে। এক, জার্মানী ও জাপানে ইংরিজি-জানা লোকের কি এতই অভাব ছিল যে উদ্ভট সংলাপ বা চিঠিপত্র ওই নেতাজিকে দিয়ে বলানো বা লেখানো হল? ইংরিজিতে বলিয়ে-কইয়ে কাউকে তাঁরা কাজে লাগালেন না কেন? দুই, জাললোক ( impersonator )-কে দিয়ে বেশি কথা বলানো বা লেখানো যে বিপদ্‌জনক—এই সোজা কথাটা কি জার্মানী বা জাপান সরকার জানতেন না? জানলে সে ঝুঁকি তাঁরা নিতে গেলেন কেন?

তিন, নেতাজিকে দিয়ে গান্ধীস্তুতির আদিখ্যেতা জার্মানী বা জাপান সরকার দেখাতে গেল কেন? নাৎসীবাদ বা ফ্যাসিবাদের সমর্থনে তাঁর তরফ থেকে বক্তব্য রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্র দুটির স্বার্থ বা আগ্রহ থাকতে পারে। গান্ধীভক্তির বাড়াবাড়ি দেখানোর ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ থাকতে যাবে কেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া যাক। এক, ইংরিজি জানা লোকের অভাব রাষ্ট্র দুটিতে ছিল না। দুই, জার্মানী বা জাপান থেকে পাঠানো বলে প্রচার করা নেতাজির যেকটি ফটো পাওয়া গেছে তা সবই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে প্রকাশ করা হয়েছে। বুঝতে কষ্ট হয়না মতলব-মার্কা সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের প্রমাণ রাখার প্রশ্নটাই ছিল অবান্তর। জার্মানী বা জাপান সরকার সে প্রমাণ রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলেন একথা বলা যাচ্ছেনা। প্রমাণ রাখতে অনিচ্ছাই এর কারণ। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ওসব বক্তৃতা তখন কেউ দেননি— ওসব চিঠিপত্র তখন কেউ লেখেননি। কারণ প্রমাণ রাখতে অনিচ্ছা এবং ইচ্ছা একই সঙ্গে কারুর থাকতে পারে না। প্রথম সিদ্ধান্তের প্রথম অংশটাই বেশ মজার। তবে কি ওইসব বেতার-বক্তৃতার আয়োজন ভারতেরই কেউ করেছিলেন। তবে কি ভারত সরকারই গোপনে ওই কর্ম করেছিলেন? তাইত আসছে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যা আসছে তা এই: প্রমাণ রাখার তাগিদ ওই দুই রাষ্ট্রের ছিলনা। ছিল অন্য কারুর। ব্যাপারটা একটু ঘুরিয়ে বলা যাক। নেতাজির কর্মকাণ্ডের প্রমাণ রাখার ব্যাপারে অক্ষশক্তির অনিচ্ছার দরুন প্রমাণ তৈরির দায়িত্ব পরবর্তীকালে অন্য কাউকে নিতে হয়েছিল। নিতে হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। আগে নয়।

আগে কেন তা সম্ভব ছিলনা তার কারণটা বলে নেওয়া যাক। প্রমাণ রাখতে অনিচ্ছুক অক্ষশক্তির রাষ্ট্রগুলোকে দিয়ে তৈরি করে নেওয়া প্রমাণগুলোকে মানিয়ে বুনিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার আগে থেকে করিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল। তা না করে রাখলে ওইসব

রাষ্ট্র যে প্রমাণগুলোকে পরবর্তীকালে মিথ্যে বলে জানিয়ে দিতে পারত। তা যে পারেনি তার কারণ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত সরকার মিথ্যেগুলো ফাঁস হয়ে যাক এটা চাননি। মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ভারত থেকে ইন্টেলিজেন্স দপ্তরের বেশ কয়েকজন ব্যক্তি নানান রাষ্ট্রে যে গিয়েছিলেন তা খবরের কাগজেই বার হয়েছিল। বুঝতে কষ্ট হয়না ইন্টেলিজেন্সস্তরে রাষ্ট্রগুলোকে দিয়ে মিথ্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখার অঙ্গীকার করিয়ে নেওয়ার তাগিদেই তাঁরা ওসব দেশে গিয়েছিলেন। যাতে পরবর্তীকালে তৈরি করে নেওয়া প্রমাণগুলোকে কোনও রাষ্ট্র কোনও দিনই মিথ্যে বলে না জানায়। একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো। নাৎসী বা ফ্যাসিস্ট সরকারের মতলববাজির গল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায় ওইসব রাষ্ট্রের থাকতেই পারেনা। তবু যে ওরা গল্পটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার কারণ ব্রিটিশ অধীন ও পরবর্তীকালের স্বাধীন ভারত সরকার গল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। শুধু সুভাষ চন্দ্র বসুর মহিমাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে নয়। ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বলে প্রচার করা নেতাদের যৌথ অভিনয়ে সমৃদ্ধ নাটকটিকে লোকে যাতে নাটক না ভেবে সত্যি ভেবে বসে—তা বোঝানোর তাগিদও ছিল।

দু-নম্বর প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় ঝুঁকি যে আছে তা তাঁরা জানতেন। ঝুঁকি তাঁরা নেননি।

তিন নম্বর প্রশ্নটাই বেশ মজার। সত্যিই ত জাপান-জার্মানী দেশ দখলের লড়াইয়ে যেতে উঠে গান্ধীর পূজো শুরু করতে যাবে কেন? দরকারই-বা কি? তবে কি নেতাজির গল্প যাঁরা বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে ওই গান্ধীজীর মধুর সম্পর্ক ছিল? আর তা ছিল বলেই কি তাঁদের বানিয়ে নেওয়া গল্পে গান্ধীজীকে তুলে ধরার জন্য গল্পের ভূতুড়ে ওই নেতাজিকে দিয়ে উল্টোপাল্টা নানান কায়দার কথা বলিয়ে ও লিখিয়ে খেলাটাকে বেশ জমিয়ে তোলার আয়োজন হয়েছিল? তাইত আসছে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, নেতাজি ইংরিজিতে লিখলেন :

The service which Mahatma Gandhi has rendered to India and to the cause of India's freedom is 'so unique and unparallaled' that his name will be written in letters of gold in our 'national history' for all time."

"for all time" যোগ করে রসিকতা করার ইচ্ছা নেপথ্যশিল্পী সামলাতে পারেননি। তাঁর নিজেরই কিছু সন্দেহ ছিল। 'আপাততঃ' বা 'এখানকার মত' কেউ ভেবে না বসে তার জন্যই ওই for all time-এর সতর্কতা।

তবে 'নেতাজি' সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন গান্ধীজীকে 'জাতির পিতা' বানাতে গিয়েই। ওই নেতাজিকে দিয়ে রেঙ্গুন বেতারকেন্দ্র থেকে গান্ধীজীকে একটি বাণী পাঠানোর গল্প বানিয়ে আর এক খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল।

বাণীটি এই রকম :

'Father of our Nation !
"In this holy war for
'Indian liberation' we ask for your
blessings and good wishes···"

খেলার ঠেলায় গান্ধী 'জাতির পিতা' সেজে বসলেন। লোকে মেনে নিল এবং ইতিহাসেও জানানো হল সুভাষচন্দ্রই নাকি গান্ধীজীকে সর্বপ্রথম জাতির পিতৃত্বের ন্যায়সঙ্গত দাবীদার হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। রসিকতা একেই বলে! ভূতুড়ে সুভাষের ভূতুড়ে ইঞ্জিরিটা কেউ লক্ষ্যই করেননি। কৃতজ্ঞতাবোধ গান্ধীজীরও ছিল। তিনি 'নেতাজি'-কেও Patriot of patriots (দেশপ্রেমিকোত্তম) বলে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'ইতিগজ'-মার্কা একটা বিশেষণও জুড়ে দিলেন। বললেন misguided (বিপথে চালিত)। ভূতের মুখে রামনাম আর রামের মুখে ভূতের নাম উচ্চারিত হতে দেখেও কেউ অবাক হননি—এইটাই আশ্চর্যের।

তাইহোকুতে বিমান-দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে যে তথ্য জাপান সরকার জানিয়েছিলেন সে সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। শাহ নওয়াজ কমিশনের রিপোর্ট বার হওয়ার পরেও সে সন্দেহ থেকে গিয়েছিল। তাই ওই ব্যাপারে দ্বিতীয় কমিশন বসানো হয় যার চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রী খোসলা। এঁর প্রতিবেদনে পঁচিশটি ধারা রয়েছে। কয়েকটি ধারা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে।

১৯-তম ধারায় কমিশন বলেছেন :

"There is no reason for believing that the relations between Nehru and Bose were anything but friendly on personal basis. Political differences between them did not lessen Bose's general respect for Nehru and Nehru's affection for younger politician whose patriotism no one questioned."

প্রশ্ন এসেই যায়। কমিশনের বিষয়সূচী (terms of reference) তে নেহেরুর সঙ্গে বসুর সম্পর্কের প্রশ্নটা কি আলোচ্য ছিল? অনাহূত এই বক্তব্যটা আসছে কেন? নেহেরুর সঙ্গে বসুর সম্পর্ক ভালো ছিল—এ বিশ্বাস পোষণ করার প্রয়োজন কমিশনের এলই বা কেন? সে সম্পর্ক থাক বা না থাক কমিশনের প্রধান বিচার্য বিষয়টা কি ওই বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল ছিল? কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাচ্ছি না।

কমিশনের রিপোর্টের ২০-তম ধারার একটি অংশ রাখছি :

"His concession to a public demand for enquiry was an instance of his compliance with democratic procedures and not an admission of his disbelief in the truth of the crash story."

বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নেহেরুর অবিশ্বাস ছিল না—এই তথ্যটি জানানোর প্রয়োজন কমিশন বোধ করলেন কেন? নেহেরুর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর কি কমিশনের রায়টা নির্ভরশীল ছিল? নির্ভরশীল থাকলে কমিশনের নিরপেক্ষতা কি সন্দেহজনক হয়ে ওঠে না?

কমিশনের রিপোর্টের ২১নং ধারায় বলা হয়েছে:

"...The Chairman was Shah Nawaj Khan who was a close associate and confidant of Bose who had taken a very prominent part in I. N. A's campaign against the British. Shah Nawaj Khan could. therefore, be depended upon to conduct the enquiry honestly and conscientiously."

খোসলা কমিশন একই ব্যাপারে গঠিত পূর্বতন কমিশনের চেয়ারম্যানের মনোনয়ন যে যুক্তিযুক্ত হয়েছিল—এটা বলার দরকার বোধ করলেন কেন? এটাও কি আলোচ্য সূচীতে ছিল? প্রথম কমিশনের চেয়ারম্যানের মনোনয়ন যদি ত্রুটিহীন হয়েই থাকে তবে দ্বিতীয় কমিশন বসানোর প্রয়োজন হল কেন? সে মনোনয়ন যুক্তিযুক্ত হয়েছিল বলেই কি খোসলা কমিশন শাহ নওয়াজ কমিশনের সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল? শাহ নওয়াজ খান যে বসুর সহকর্মী ছিলেন—এ তথ্য সম্পর্কে কমিশন স্থিরনিশ্চয় হলেন কি করে? একটি সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করতে সেই সংস্থারই অন্য একজনকে দায়িত্ব দেওয়াটা কি নিরপেক্ষতার পরিচায়ক? সংস্থাটি যদি জাল সংস্থা হয় তবে ত' কথাই নেই। সাকরেদ কি কল্পিত গুরু সম্পর্কে সত্যানুসন্ধান করতে পারে? আর একটা কথা। লাখ লাখ টাকা খরচ করে কমিশন সরেজমিনে তদন্ত করে এলেন, হাতে আঁকা একটা ছবির তুলে রাখা একটা 'ফটো'কে বিমান দুর্ঘটনার প্রমাণ হিসেবে কমিশন বিশ্বাস করে বসলেন কি করে? কমিশনের সব সদস্য কি চোখ

বন্ধ করে ছিলেন? কমিশন কি 'মনোনীত অন্ধের সম্মেলন' ছিল?

শ্রী খোসলার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেও কিছু প্রশ্ন রাখা যাক। ভদ্রলোক গান্ধীহত্যা মামলার প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। হত্যার ঘটনাটা ঘটেছিল দিল্লীতে। বিচারক আমদানী করা হয়েছিল পাঞ্জাব থেকে। কেন? দিল্লীতে কি বিচারকের অভাব ছিল? আইন-শৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব যেমন রাজ্যের এক্তিয়ারে থাকে তেমনি বিচারের দায়দায়িত্বও বর্তায় রাজ্যিক বিচার প্রতিষ্ঠানের ওপর। সব রেওয়াজ বদলে দিয়ে অন্য রাজ্য থেকে বিচারক আনার দরকার কেন পড়েছিল? দিল্লীতে কি কোর্ট-কাছারী ছিলনা যে লালকেল্লায় বিচার করার দরকার পড়ল? লালকেল্লা কি বিচারশালা? কোনও প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছিনা। তবে কি ওই খোসলা নেহেরুর বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন? আর সেই সম্পর্কের জোরেই কি ভদ্রলোক গান্ধীহত্যা মামলার প্রধান বিচারক এবং পরে তথাকথিত নেতাজি কমিশনের চেয়ারম্যান হতে পেরেছিলেন? নেহেরুর কি কিছু লুকোনোর ব্যাপার ছিল যার জন্য তাঁর বিশেষ বিশ্বাসভাজন ওই ভদ্রলোককে কাজে লাগানো হয়েছিল?

## ভারতের গোয়েন্দাদপ্তরের তৎপরতা

অস্তিত্বহীন নেতাজির অস্তিত্বের সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখার ব্যাপারে যে মিথ্যার কারবারীদের তৎপরতার অভাব ছিল—এ অপবাদ দেওয়া যায়না। নেতাজির সইকরা একটা চিরকূট পাচ্ছি। তারিখের বালাই নেই। চিরকুটটা নাকি ভারতের গোয়েন্দাদপ্তরের হস্তগত হয়েছিল। চিরকুটি বাঙলাটা এই রকম:

"পত্রবাহক বিশেষ জরুরি কাজে দেশে যাচ্ছেন। আমাব 'বন্দু', সহকর্মী ও সমর্থকেরা তার সাহায্য করলে, আমি বিশেষ 'বাধিত্ত ও সুখী' হইব।

বিনীত—

শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু"

নেপথ্য লেখকের একটু যত্ন নেওয়া উচিত ছিল। গুরুচণ্ডালী দোষ, বানানবিভ্রাট, যতিচিহ্নের গোলমাল, বক্তব্যের অস্পষ্টতা সর্বগুণে গুণী একটি বাক্য হাতের লেখা এবং সই কিছুই ত' মিলছে না। তাহলে? অসংখ্য জাল চিঠির মতোই ওটা জাল চিরকুট। প্রশ্ন হল জাল চিরকুটটা সংগ্রহ করে রাখতে গোয়েন্দাদপ্তরেরই-বা এত উৎসাহ এল কেন? তবে কি মিথ্যার কারবারীদের সঙ্গে ওই গোয়েন্দাদপ্তরের যোগাযোগ ছিল? নাকি যার নাম মিথ্যার কারবারী তারই আর এক নাম গোয়েন্দাদপ্তর? তাইত' আসছে।

## সুভাষ-সম্পর্কিত অধিকাংশ বই-ই সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সুভাষ-সম্পর্কিত প্রায় সব বই-ই 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত'। সে-সব বই থেকে উদ্ধৃতি কিংবা ফটো প্রকাশ করতে হলে প্রকাশকদের অনুমতির অপেক্ষা করতে হয়। সে অনুমতি চাইনি। কমিক পর্যায়ের ওই সব বইয়ের মূল্যের বহর আর 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষণে'র বাহার দেখবার মত। আইনের জটিলতায় পড়বার আশংকা আছে কিনা তাও জানিনা। তবে রামের লেখাকে শ্যামের বলে চালানোর চেষ্টাটাই যখন বেআইনী তখন জাল বই থেকে বিনানুমতিতে উদ্ধৃতি কিংবা ফটো প্রকাশ করার মধ্যে বেআইনী কিছু থাকতে যাবে কেন? বেআইনী কাজটা ওই প্রকাশকেরাই ত' আগে করে রেখেছেন।

## সাবমেরিন-এর গল্প

জার্মানীর কীল (Kiel) বন্দর থেকে সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে চেপে সুমাত্রার সাবাং-এ গিয়েছিলেন বলে প্রচার করা হয়েছে। জার্মানীর ইউ-বোটে ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের কাছাকাছি একটি জায়গায়—ওখান থেকে জাপানের একটি সাবমেরিনে চেপে উনি সাবাং-এ যান।

এত পথ ঘুরে পঁচাত্তর দিনে সাবমেরিনটি ম্যাডাগাস্কার অঞ্চলে

পৌঁছলই বা কি করে—এসব প্রশ্ন কেউ তোলেননি। পথে জার্মানীর মাদার শিপের আনাগোনা ছিলনা বললেই হয়। মিত্রশক্তির অতন্দ্র প্রহরাকে তুচ্ছ করে তা করার ঝুঁকি ছিল খুবই বেশি। তাছাড়া পথে জার্মানীর মিত্ররাষ্ট্র একটাও ছিলনা—এটা মনে রাখা দরকার। শ্নরকেল (Schnorkel) আবিষ্কার হয় ১৯৪৪-এ (উন্নীতমানে পৌঁছেছিল ১৯৪৭-এ)। ওই আবিষ্কারের আগে ডিজেল ইঞ্জিন এবং ডিজেল জেনারেটর সাবমেরিনের ভাসমান অবস্থাতেই চালানো সম্ভব হত। ডুবন্ত অবস্থায় ব্যাটারিতে চলত সাবমেরিন। ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্য ভেসে উঠতে হত সাবমেরিনকে। ওঠার ঝুঁকি থাকত। রাত্রে ভেসে উঠলেও বিপদ থেকেই যেত। এই অবস্থায় ওই দীর্ঘ পথ জার্মানীর সাবমেরিনের পক্ষে পাড়ি দেওয়া অসম্ভব ছিল। কারণ ওই সাবমেরিনের প্রচারিত যাত্রার সময় ১৯৪৩-এ—যখন ওই শ্নরকেল আবিষ্কারই হয়নি।

অথচ সাবমেরিনটি নাকি যাত্রা করেছিল। কাহিনী সেই কথাই বলেছে। ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি। আর তা ঘটেনি বলেই প্রমাণের বহর রাখা হয়েছে।

এক, সাবমেরিন যোগে জাপানে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়ে জার্মান সরকারের কাছে ওই নেতাজি ভুলভাল ইংরিজিতে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সাক্ষরিত চিঠিটিও প্রমাণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। দুই, সাবমেরিনটির একটি ফটো আছে। আরোহী হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে দেখানো হয়েছে। তিন, ফটোর 'বডি'-তে সুভাষচন্দ্রের ইংরিজি সই দেখা যাচ্ছে। চার, সাবমেরিনে স্বচ্ছন্দে আসতে পেরেছেন একথা জানিয়ে জাপান 'সাম্রাজ্যিক সরকার'-কে কৃতজ্ঞতা জানাতেও ওই 'নেতাজি ভোলেননি। স্বাক্ষরিত একখানা চিঠিও পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য ভুলে ভরা ইংরিজিতে। পাঁচ, 'এডিকং' আবিদ হাসানের সঙ্গে ওই নেতাজির একটি ফটোও পাওয়া যাচ্ছে। ছয়, বিষুবরেখা অতিক্রম করার আনন্দে জলকেলি (জল ছোঁড়াছুঁড়ি)-র একটি

দৃশ্যেও ওই দু'জনকে রাখা হয়েছে। সাত, জাপানের সাবমেরিনটার নামও জানানো হয়েছে—তার নাম ছিল 'জাপান' ( হায়াসিদা )।

'প্রমাণ'-গুলো দেখলেই যা ধরা পড়ে তা হল : এক, সাবমেরিনের 'ফটোটা' বেশ মজার। 'ফটো'-র পশ্চাৎপট হিসাবে কয়েকটি মাস্তুল-ওলা একটি নৌকোর হাতে আঁকা অস্পষ্ট ছবি রাখা হয়েছিল।

দুই, নৌকোটির সামনের দিকে সুভাষচন্দ্রের মুখের আদল আনার চেষ্টা হিসাবে তৈরি করা অতি স্পষ্ট একটা ছবি রাখা হয়েছে। ভূতুড়ে ফটোটা তৈরি করার পেছনে যে শিল্পী ছিলেন তিনি একটি মারাত্মক ভুল করে বসেছিলেন। প্রথমত সাবমেরিনে যে দু-চারটে মাস্তুল-মার্কা কাণ্ডকারখানা থাকেনা—এইটাই তিনি জানতেন না। দ্বিতীয়তঃ যত দূর থেকে 'ফটো'-টা তোলা হয়েছিল বলে মনে হয় ততটা দূরে কোনও লোকের মুখ অতটা স্পষ্টভাবে দেখা যায়না। দেখা যাওয়ার কথা নয়।

তিন, ফটোটিতে সুভাষচন্দ্রের একটি সই রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ ফটোর নেগেটিভে লাল কালিতে সই করে রেখেছিলেন ভদ্রলোক। ফটোর জালিয়াতি থেকে দৃষ্টিটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই ওই সই-এর মতলব। সই থাকাতে ফটো-টা যে প্রামাণ্য এইটাই লোকে ভেবে বসবে আর তা ভাববে বলেই যে ওই সই রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয়না।

জার্মান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপকে লেখা ওই নেতাজির একটি চিঠি ( 5. 12. 42 ) পাওয়া গেছে বলে প্রচার করা হয়েছে।

চিঠিটা জাল। সাবমেরিনের গল্পটাকে প্রমাণসিদ্ধ বানানোর জন্যই যে ওই চিঠির উদ্ভাবনা হয়েছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয়না।

সাবমেরিন যুদ্ধ উপকরণ। তার code name 'জাপান' হওয়ার কথা নয়। প্রমান রাখতে উদ্যোগী থাকলে জার্মানী বা জাপান সরকার সত্যিকারের সাবমেরিনের ফটোই পাঠাত।

## একটি সংযোজন

বিদেশী স্থাননাম বা ব্যক্তিনাম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে চিনা লিপিতে যে অনুবদে করা কিংবা উচ্চারণানুগ নাম রাখার রেওয়াজ নেই—কোনওকালে ছিলও না—এবং মনগড়া কিছু শব্দের মাধ্যমেই যে তা প্রকাশ করা হয়—একথা ১৫৮ পৃষ্ঠায় জানানো হয়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থেকেই গেছে। বিদেশী স্থাননামের চিনা প্রতিরূপ-এর কিছু উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝানো যাক :

ইংল্যাণ্ড=য়ুংগুও ; ইউ. এস. এ=মেই গুও ; আফ্রিকা—ফেই ঝোউ ; অস্ট্রেলিয়া=আও ঝোউ ; উত্তর আমেরিকা—বেই মেই ; ইউরোপ=ওউ ঝোউ ; রাশিয়া=এ লো শে ; কুয়ালালামপুর=চি লুং পো ; বুদ্ধ=ফু ; গরিলা=ফু ; প্রশান্ত মহাসাগর=তাও পিং য়াং ; জাভা=চাও ওয়া ; শেষ দুটি নামের প্রথমটির ক্ষেত্রে অনুবাদ মূলক এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উচ্চারণানুগ নাম রাখা হয়েছে ঠিকই তবে ব্যাপকভাবে ওই কায়দায় চিনা প্রতিরূপ করা হয়না।

উদাহরণগুলো দেখে বুঝতে কষ্ট হয়না উচ্চারণ নকল করে কিংবা অনুবাদ করে নাম রাখার কোনও ব্যবস্থাই ওগুলোতে করা হয়নি। ফা হিয়েন, হিউ এন সাং, ইৎসিং প্রমুখ চিনা পর্যটকদের লেখা বলে প্রচার করা কেতাবে বিদেশী নামের উচ্চারণ নকল করে চিনা লিপ্যন্তরীকরণের প্রচণ্ড উদ্যোগ আয়োজন দেখে বুঝতে কষ্ট হয়না ওসবই জাল কেতাব। প্রাচীন বলে চালানো আধুনিক প্রতারণা। ইতিহাসের পণ্ডিতেরা ওইসব কেতাবকে প্রামাণ্য বলে প্রচার করার যত চেষ্টাই করুন না কেন—যে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে তা হচ্ছে এই : ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ হওয়ার যোগ্যতা ওগুলোর কোনওটারই নেই।

# শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | লাইন | আছে | হবে |
|---|---|---|---|
| ১৯ | ১ | সামাবদ্ধ | সীমাবদ্ধ |
| ২২ | ৭ | ছত্রিশগড়ী | ছত্তিশগড়ী |
| ২২ | ৯ | ঘটো | ঘটৌ |
| ৪৩ | ২০ | earth→বাচক | earth-বাচক |
| ৫৮ | ২৫/২৬ | কি কি | কি |
| ৬৩ | ৫ | নয় ব্রাহ্মী | নয়। ব্রাহ্মী |
| ৯১ | ১ | ইশ্বরকে | ঈশ্বরকে |
| ৯১ | ৯ | fruth | truth |
| ১০৫ | ৮ | পড়িয়ে | পড়িয়ে নেওয়া |
| ১৭৫ | ১১ | *উসনেং→রস্নন্ (বৈ) | *উসনেং→রস্নম্ (বৈ) |
| ২০৪ | ২৩ | Subhash Chandra | Subhash Chandra Bose |
| ২০৪ | ২৪ | 1920-1934 | 1897-1920 |
| ২০৪ | ২৫ | চৌদ্দ বছরের | তেইশ বছরের |
| ২০৮ | ১৪ | একশ আট | একশ তেইশ |